ঠেলায় ঠেলায়
রূপদর্শী

রূপদর্শী

বেঙ্গল পাবলিশার্স
কলিকাতা—১২

আমার 'সেজদা'
সন্তোষকুমার ঘোষকে

এই লেখকের অন্যান্য বই

এই কলকাতায়

রূপদর্শীর নক্‌শা

রূপদর্শীর সার্কাস

মেঘনামতী

॥ এক ॥

কোথাও প্রেম সম্পর্কে আলোচনা হলেই, কেন জানিনে, চট করে বিভূতিদাদের কথা আমার মনে পড়ে। কর্তাগিন্নীর যুগল পরিতৃপ্ত জীবনের হাসিভরা মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

বিভূতিদার বাসায় আমি অনেক দিন ছিলাম। প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যেও ওদের ভালবাসার গভীর প্রকাশ দেখেছি। অথচ বাইরে থেকে তার বিন্দুমাত্র আভাস পাওয়া যেত না। বৌদি থাকতেন ঘরকন্নার কাজে ডুবে। দাদা বেড়াতেন তাঁর ক্লাব আড্ডা নিয়ে ভেসে। যতদিন ছিলাম, দাদাকে শেষ বাসের আগে ফিরতে দেখিনি।

বৌদি বলতেন, "ঠাকুরপো, ভাগ্যিস তুমি ছিলে, তাই ঘুমিয়ে বাঁচছি। নইলে দরজা খোলবার জন্যে রোজ আমাকে চোখে সর্ষের তেল দিয়ে জেগে থাকতে হত।"

কিন্তু আমি জানি, রোজই দেখেছি, বৌদি চুপ ক'রে শুয়ে থাকতেন, ঘুমুতেন না। দাদা যতই নিঃশব্দে আসুন, বৌদি টের পেয়ে আলগোছে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকতেন।

দাদা বলতেন, "ভাগ্যিস তুই আছিস, নইলে দরজা খুলতে পাড়ার লোক জেগে উঠত, আর কাঁচা ঘুম ভেঙে তোর বৌদি"—

কিন্তু আমি জানি, দাদা ঠিক জানেন, বৌদি জেগে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে। রোজ রাত্রে একছড়া গোড়ের মালা দাদা আনতেন। বৌদির গলায় দরজার বাইরে থেকেই সেটা গলিয়ে দিতেন। তারপর আর কিছু দেখতে পেতামনা। শুনতাম, বৌদির কপটবিরক্তিভরা চাপা আওয়াজ।

"আঃ ছাড়। খেয়ে দেয়ে নিয়ে একটু রেহাই দাও দিকি। আঃ, কি হচ্ছে!"

আরেকটি দিনের কথা বলি। বৌদি পিতৃগৃহে। সমাগত প্রসব দিনের প্রতীক্ষায় আতঙ্কিত।

আমায় দেখে বললেন, "দেবর যে। রামচন্দ্রটি কই। নতুন বইয়ের রিহার্সালে ব্যস্ত বুঝি!"

সাফাই গাইতে যাব, বৌদি বাধা দিলেন, "থাক ভাই, কিছু আর বলতে হবে না। একদিন দুদিন তো নয়, ন' বচ্ছর ঘর করছি। তা আজ কি আর আসবেন?"

মাথা নেড়ে জানালাম, "সম্ভব হবে না।"

বৌদি একটু ম্লান হেসে বললেন, "কি করে আর হবে বল। দরকার তো আর নেই। নতুন রাঁধুনি মাগীটার উপর হিংসে হচ্ছে। রাঁধছে ভালই, নইলে এক আধটু মনে পড়তই।"

বললাম, "এক আধবার কেন বৌদি, সমস্ত ক্ষণই আপনার আসন দাদার মনে পাতা। দলিল দস্তাবেজ আমার সঙ্গেই আছে।"

গোড়ের মালাগাছ বের করে দিলাম। বৌদির মুখে খুশীর আবির ছড়িয়ে পড়ল। হেসে ফেললেন খিলখিল করে।

"তোমার দাদা কায়দাটি জবর বের করেছেন। হাটুরে লোকের হাতে প্রেমপত্তর পাঠাচ্ছেন। বৌএর মন আর আড্ডার জন একসঙ্গেই রাখা চলছে। কি ব'ল?"

সেদিন বাসায় ফিরতে আমারও বেশ দেরী হল। তখনো বিভূতিদা ফেরেন নি। বিভূতিদার বাবা জেগে আছেন দেখে বিস্মিত হলাম। উপরে উঠছিলাম, আমায় ডাকলেন।

"এই যে, ফিরেছ। এত রাত পর্যন্ত বাইরে কর কি? সে হতভাগাটার তো এখনো দেখা নেই।"

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। বিভূতিদার বাবা গম্ভীর আর শান্ত মানুষ। ওঁর দিকে আমরা কেউই ঘেঁষিনে। তাই আজকে ওঁকে কিঞ্চিৎ চঞ্চল দেখে অবাক হলাম।

"বৌমার ভাই এসেছিল। ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। একটা ছেলে হয়েছে।"

আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। সে কী! আজই তো বিকালে— কী আশ্চর্য!

খবরটা দিলাম দাদা খেতে বসলে।

"অ্যাঁ বলিস কি! কোথায় আছে? কেমন আছে তোর বৌদি? খুব কি কাহিল হয়ে পড়েছে? ক্লাবে গিয়ে খবরটা দিতে পারিস নি? আমারই অন্যায় হয়ে গেছে। ভয়ানক অপরাধ। ছি ছি। আমার বৌএর এই অবস্থা, আর আমি ক্লাবে বসে ফুর্তি করছি।"

আশঙ্কায় দাদার গোরামুখে নিষ্প্রদীপের কালো ঠুসি পড়ল যেন। কী তীব্র অনুশোচনা। খাওয়া ছেড়ে প্রায় উঠে পড়ে, এমন।

যত বলি, দাদা, আশঙ্কার কোনো কারণ নেই। তা কে শোনে। আমি শুয়ে পড়লাম। দাদা ঘরে পদচারণা করেই রাত কাবার করে দিলেন।

এই একটি দিন ছাড়া দাদাকে বৌদি সম্পর্কে কখনো প্রকাশ্যে মনোভাব প্রকাশ করতে দেখি নি।

তারপর বিভূতিদাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল। মাসিমা মফঃস্বল থেকে ছেলেমেয়েকে শিক্ষিত করতে কলকাতায় বাসা করলেন। আমি তাদের গার্জেন বনে সেই বাসায় উঠে এলাম। দক্ষিণ থেকে একেবারে উত্তরে। কয়েক মাস পরই গার্জেনত্ব গেল। মাসিমার বাসা উঠে গেল, ভাইবোনেরা এখানে ওখানে ছিটিয়ে পড়ল। আমিও আরেক জায়গায় আস্তানা গাড়লাম।

হঠাৎ একদিন বিভূতিদার সঙ্গে দেখা। হন্তদন্ত হয়ে কোথায় চলেছেন। দুজনেই খুশী হলাম।

"তুই এদিকেই থাকিস্?"

আঙ্গুল দিয়ে দূর থেকে চারতলা বাড়িটা দেখিয়ে বললাম, "ওরই নীচু তলায়। চল না।"

"যাবো আরেক দিন, আজ সময় নেই, তা তোর সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল। আমার সঙ্গে একবার চল তো।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায়?"

বললেন, "একটা বাড়ি ঠিক করেছি, এই কাছেই। চল, টাকাটা জমা দিয়ে আসি।"

দাদা বাড়িটা ভালই পেয়েছেন বলতে হবে। তিনখানা ঘর, স্টোর, রান্নাঘর, বাথরুম—একেবারে আলাদা ফ্ল্যাট—দোতলায়। ভাড়া একশ।

"তোর বৌদি দোতলা দোতলা করত। ভালই হল, কি বলিস। দু তারিখেই এসে যাব। যাস একদিন।"

আমাকে আর যেতে হল না। দাদাই এলেন। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, ওদের আসবার কথা। রাত গোটা নয়েক হবে। শুয়ে শুয়ে পড়ছি। জানালায় কে টোকা দিল। চেয়ে দেখি দাদা। আরে!

বললাম, "ভেতরে এস।"

ওদের তো আজই আসবার কথা। নিজের ভুলের জন্যে বড় অনুতপ্ত হলাম। দাদা ঢুকলেন। এক হাতে যথারীতি কলাপাতার প্যাকেটে মোড়া একছড়া মালা। অন্য হাতে খবরের কাগজে মোড়া বড়সড় চৌকোমতন কি। সারাদিনের বাড়ি বদলের পরিশ্রম দাদার সমস্ত শরীরে সই করে রেখে গেছে। মুখখানা অবসাদগ্রস্ত। শুধু চোখ দুটোতে যেন কিসের

উত্তেজনা। ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়লেন। চার দিক তাকিয়ে নিলেন।

তারপর খুশী হয়ে বললেন, "বেশ ঘর। একটু জল খাওয়া।"

জল দিলাম। দাদা বেশী ধানাইপানাই না করে বললেন, "দ্যাখ, তোর কাছে একটা বিশেষ কাজে এসেছি।"

দাদা খুব সিরিয়স হয়ে উঠলেন।

"হঠাৎ তোর কথাই মনে হল। তাই সোজা চলে এলাম।"

দাদার কথাবার্তার ধরণ একটু অপরিচিত ঠেকতে লাগল। আমার আগ্রহ মুকিয়ে রইল দাদার কথা শুনতে। দাদা কাগজের প্যাকেটটা খুলতেই বের হল একটা ফটোগ্রাফ, কেবিনেট সাইজের। দাদার হাত-দুখানা উত্তেজনায় থর থর কাঁপছে।

জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন রে ছবিখানা?"

ফটোখানা এক উদ্ভিন্ন যৌবনা যুবতীর। অপূর্ব সুন্দর মুখশ্রী। ছবিটিও চমৎকার উঠেছে। ছবিটি যদিও আবক্ষ, তবু মেয়েটির সুগঠিত দেহের পরিচয় আন্দাজ করতে একটু দেরী লাগে না। ঠোঁটে অভিমানী মেয়ের হঠাৎ খুশীর হাসিটুকু লেগে রয়েছে। তবে চোখ দুটোয় কেমন যেন উন্মাদত্বের আভাস।

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "ছবিটা কার?"

একটু অপ্রস্তুত হেসে জবাব দিলেন, "এক রাক্ষসীর। আমার সেকেন্ড ওয়াইফের।"

দাদার তিন বিয়ে তা জানতাম। প্রথম দু সংসার অনেক আগেই গত হয়েছেন।

দাদা বললেন, "বড় মজার ব্যাপার একটা ঘটেছে, বুঝলি। এই বাড়িতে আমরা একাদিক্রমে সতের বছর কাটিয়েছি। জিনিসপত্র টুকটাক যা জমেছিল, একেবারে পাহাড়। আজ চার পাঁচ দিন ধরে শুধু বাজে জিনিসই বাছা হল। মাকে জানিস তো, বেহিসেবে কিছু করবার জো নেই। চারদিন ধরে মা শুধু জিনিসই বেচেছে, শিশি, বোতল, কাঁচ, কাগজ, কৌটো, টিন—যা ছিল সব বেচেছে। আজ সকালে দেখি এককোণায় একগাদা ছবি। রাধাকেষ্ট, দক্ষিণাকালী, যমুনাপুলিনে, নবনারীকুঞ্জর, পতিছাড়া সতীরাণী নাহি জানে আর, সতীর পুণ্যেতে স্বর্গ হয় এ সংসার —সেই দাদামশাই দিদিমার আমল থেকে জড় করা বড় বড় ফ্রেমে আঁটা যত সব রাবিশ। গোটা কয় এর আগে আমি কাজে লাগিয়েছি। মাকে বললাম, এগুলো ফটো বাঁধাইএর দোকানে পাঠিয়ে দাও। কাঁচ আর ফ্রেমগুলোর

কিছু দাম পাবে। কথাটা মার মনে ধরল। মা আর বৌ ওগুলো গোছাতে লাগল। একটু পরেই মা আমাকে ডাক দিল। গিয়ে দেখি মার হাতে এই ছবিটা। ময়লা ঝুলে একাকার হয়ে আছে। মা বলল, এটাকে কি করবি? চট করে তোর বৌদির দিকে চাইলাম। সে কোনো কথা বলল না। আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, কি আর করব। ওটাও দোকানে দিয়ে দাও।

"আমিই সব ছবিগুলো দোকানে দিয়ে এলাম। তখন কিন্তু ফটোখানার দিকে একবার চেয়ে দেখবারও ইচ্ছে হল না। তারপর বার তিনেক দক্ষিণ থেকে উত্তর করতে করতে আর কিছু মনেই রইল না। মনে পড়ল বিকালে। নতুন বাসায় আমার ঘরে বসে যখন চা খাচ্ছি। তোর বৌদি দেওয়ালে আমার একখানা ছবি পুঁতছে, ঠিক সেই সময় মনে পড়ে গেল ছবিখানার কথা।"

দাদার গলা ভারী হয়ে এল। একটু থেমে ফটোখানাকে দুহাতে তুলে একবার দেখে নিলেন, তারপর আবার একটু হাসলেন। হাসি তো নয়, কৈফিয়ৎ জানানো।

দাদা বললেন, "মানুষের মন বড় বিচিত্র। আমার মনে পড়ে গেল, এই ফটো টাঙাবার ঘটনাটা। তোর এই বৌদি দেখতে এত সুন্দর হলে হবে কি, একেবারে উন্মাদ ছিল। দেড় বছর আমার ঘর করেছে, কিন্তু একটি দিনও কাউকে স্বস্তিতে থাকতে দেয় নি। মাত্র একদিন, কি যে ভাগ্য কে জানে, একটা দিন খুব ভাল ছিল।। আর সেইদিন এই ছবিটা আমি তুলি। ফটো তোলা আমার বাতিক, তাতো জানিস। আর ছবিটা বড় সুন্দর উঠেছে, না। এমনিই ও দেখতে ছিল খুবই সুন্দর, তার উপর এই অ্যাঙ্গেল থেকে দেখাতো একেবারে সুপার্ব। অনেক দিন থেকেই ওর একখানা ছবি তোলবার ইচ্ছে আমার ছিল। আর সে ইচ্ছের কথা ও জানত। তাই কিছুতেই তুলতে দিত না। অকারণ যন্ত্রণা দেবার এমন স্পৃহা আমি আর কারো আছে বলে শুনিনি। পাছে আমরা একটু শান্তি পাই, তাই রাতদিন সতর্ক হয়ে থাকত। একবেলার জন্যও বাপের বাড়ি যায় নি। দেড় বছর ছিল, একেবারে হাড় জ্বালিয়ে ছেড়েছে।

"ফটোটা তুলে প্রথমে ওকে দেখাই নি। একেবারে সুন্দর একটা ফ্রেমে বাঁধিয়ে নিয়ে এলাম। তারপর ওর খুশমেজাজ দেখে কাগজের মোড়কটা খুলে ফটোখানা ওকে দেখালাম। ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে আছি। একটা কাণ্ড কখন বাধে এই আশঙ্কা। কিন্তু আশ্চর্য হলাম, ওকে খুশী হ'তে দেখে। খুশী মানে একেবারে ছেলেমানুষের মতো। ফটোখানা ঘুরিয়ে

ফিরিয়ে নানারকম ভাবে দেখে আর খুশীতে ফেটে পড়ে। সারাদিন খাওয়া-দাওয়া ভুলে গেল। ছবিটা বুকে করে ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়। ফিল্ম ছিল না, নইলে আরেকখানা ছবি তুলতাম সেদিন। সেটা আরো অনেক ভালো হত।

"বিকাল বেলা ছবিখানা টাঙাব, বেছে বেছে জায়গা ঠিক করলাম। খাটে শুয়েও দেখা যায়, এমন একটা জায়গা। সুন্দর করে ছবিখানা টাঙালাম। তারপর খুশী মনে বেরিয়ে গেলাম। তোর প্রথম বৌদি মারা যাবার পর আর এত খুশী হবার সুযোগ ঘটে নি।

"রাত করে ফিরলাম। খেয়ে দেয়ে ঘরে গেলাম। তোর বৌদি খাটের উপর শুয়ে ছিল। ঘর অন্ধকার। বাতি জেবলে দেওয়ালের দিকে চাইতেই দেখি, ফটোখানা নেই। আলো জ্বালতেই তোর বৌদি উঠে বসল। বললাম, একী, ছবিখানা কি হল? বলল, সরিয়ে রেখেছি। বিপদের আভাস পেলাম। চুপ করে গেলাম দেখে জিজ্ঞাসা করল, কিছু বলছ না যে। বললাম, বলবার কি আছে। শুনে একেবারে ক্ষেপে উঠল। চীৎকার করে বলে উঠল, তা থাকবে কেন? সে সোহাগখাগীর জন্যে দরদ যে মনে একেবারে থকথক করছে, তা কি আর জানিনে। হারামজাদী মরে গিয়েও সোহাগের বাটীতে চুমুক দিতে ছাড়ছে না। ওর ছবিখানা ওখানে টাঙানো থাকতো কিনা, আমার ফটো ওখানে ভাল লাগবে কেন?

"কিসের থেকে কোন কথায় টেনে নিয়ে এল দ্যাখ। তারপর সারারাত আমাকে, আমার মা বাবাকে, তোর আগের বৌদি আর তার চৌদ্দপুরুষকে চীৎকার করে গালাগাল দিয়ে, ঘরের জিনিসপত্র ভেঙেচুরে তচনচ করে ভোরের দিকে ঘুমাল। ওর বদ্ধমূল ধারণাই ছিল, আমি তোর প্রথম বৌদিকে ভুলতে পারি নি।"

দাদা থামলেন। বুঝলাম দাদাকে আজ কথায় পেয়েছে।

বললাম, "একটু বস, চা দিতে বলি।"

চা খেতে খেতে দাদা সুরু করলেন, "তোর মেজবৌদির বদ্ধমূল ধারণা ছিল, প্রথম বৌকে আমি ভুলতে পারি নি। আর সে ধারণা মিথ্যে, তাই বা বলি কি করে? অথচ সে বিয়ের কথা মনে পড়লে আজো হাসি পায়, বুঝলি।

"কতই বা বয়েস তখন আমার, গোটা আঠারো হবে। ম্যাট্রিক দিয়েছি, রেজাল্ট তখনো বের হয়নি। নৈহাটী গিয়েছিলাম পিসেমশায়ের বাড়ি। পিসেমশাই ছিলেন এক চটকলের বড়বাবু। ভাল ফুটবল খেলতে পারতাম, চেহারা দেখছিস তো?"

দাদা নিজের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন।

"তখন আরো সুন্দর ছিল। সেবার গোটা মরশুমটাই ওদের হয়ে খেললাম। চটকলের বড় সাহেব খুব খুশী। পিসেমশাইকে বললেন, ওকে রেখে দাও একটা চাকরি দিয়ে। আমাদের টিমের ক্যাপ্টেন হবে। খাসা খেলে। পিসেমশাই আমাকে বললেন, বাবাকে লোভ দেখিয়ে চিঠি লিখলেন। বাবার মত পেয়ে কাজে ঢুকে গেলাম। জেটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। মাইনে একশ' টাকা। বোঝ তখনকার দিনের একশ' টাকা, তাও ঢুকতে না ঢুকতেই। কাজ বলতে কিচ্ছু না। দিনরাত খেলে বেড়ানো, টিম তৈরী করা। আর বড় সাহেবের বাংলোয় গিয়ে টেনিস খেলা আর আড্ডা মারা। সাহেব এমনিতে ছিল রাশভারী, কিন্তু যাকে চোখে ধরত, তাকে গুরুর আদরে রাখত। চেহারার জৌলুসে বড় সাহেবের খানা-টেবিল অবধি পেঁছে গেলাম। সাহেবের ছিল এক বিধবা ভাইঝি। বয়সে আমার চেয়ে একটু বড়ই হবে। মন-মরা হয়ে থাকত। আমাকে পেয়ে যেন বর্তে গেল। সব সময় হাসি, তামাসা, খেলাধুলো, বেড়ানোয় আমরা মেতে থাকতাম। তা আবার আমাদের বয়লার সাহেবের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়াল। প্রথম প্রথম বুঝতে পারি নি। যখন বুলঝাম, তখন আর ব্যাটাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনলাম না।

"বড় দিন এসে গেল। ম্যাগি, সাহেবের ভাইঝির নাম, আমাকে নিয়ে বড় সাহেবের গাড়ি করে কলকাতায় গেল। গাড়িটা নিজেই চালাল। নববর্ষের কিছু উপহার কেনাকাটা হল। আমি ম্যাগিকে নিউ মার্কেট থেকে একঝাড় গোলাপ কিনে দিলাম। সে তো উচ্ছ্বসিত। আমাকেও কি একটা কিনে দিয়েছিল, আজ আর তা মনে নেই। হোটেলে ডিনার খেলাম। ম্যাগি কয়েক পেগ হুইস্কি খেল। রাত এগারটা নাগাত নৈহাটীমুখো রওনা দিলাম। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড নির্জন। খুব শীত। গাড়ি চলেছে হু-হু করে। কিন্তু আমার তত শীত লাগছিল না। পাশে বসা ম্যাগির দেহ-সৌগন্ধে আমার রক্তে সেদিন চাঞ্চল্যের জোয়ার। ব্যারাকপুর পার হয়ে গেলাম। ব্যারাকপুর ছাড়িয়েই এক গুমটি। গাড়ি থামাতে হল। গুমটি বন্ধ। খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। দূর থেকে ভেসে আসতে লাগল একটা মালগাড়ির ধিকিয়ে ধিকিয়ে আসার শব্দ। ম্যাগি শিষ দিচ্ছিল, গুণগুণ করে গান ধরল। তারপর মালগাড়ির ইঞ্জিনটা যেই আমাদের পেরিয়ে গেল, অমনি ডার্লিং বলে আমার গলায় ওর বাহু দুটো পেঁচিয়ে মুখটা নামিয়ে নিয়ে দীর্ঘ চুম্বন এঁকে দিল। প্রথমটা চমকে গিয়েছিলাম। প্রায় তক্ষুণি পিছনের সীটে নজর দিলাম, যেন কেউ বসে আছে। তারপর সব সঙ্কোচ সর্বভয়হর উত্তেজনার জোয়ারে ভেসে গেলাম। আর কিছু মনে নেই।

"পরদিন সকালেও ঠোঁটের উপরকার মৃদু উষ্ণতাটুকু মুছে গেল না। নাকে লেগে রইল এ্যালকোহল আর এসেন্সের মিশ্র মিষ্টি একটুকরো ঘ্রাণ। সব চাইতে মুশকিলে পড়লাম বুক আর কান নিয়ে। অকারণেই হৃদপিন্ড লাফিয়ে ওঠে আর কানের গোড়ায় যে উত্তাপ জন্ম নেয়, তা যেন সমস্ত শরীর গলিয়ে দেবে।

"বিকেলের দিকে সাজপোষাক করে বড় সাহেবের বাংলোর দিকে যাচ্ছি, কারখানার পিছনে বয়লার সাহেব মিঃ নর্টনের সঙ্গে দেখা। ব্যাটা বেহেড মাতাল হয়ে পাঁচিলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাশ কাটিয়ে চলে যাব, লাফিয়ে পড়ল আমার উপর। আমি তো মাটিতে পড়ে গেলাম। জামা-কাপড়ের বারটা বেজে গেল। ব্যাটা ওদিকে আমাকে খুবসে ঘুঁসিয়ে চলেছে। আর কি গালাগাল। ড্যাম, সোয়াইন, বেজম্মা, নেটিব, যা নয় তাই। হকচকানি কাটতে বেশী দেরী হল না। পোষাকের দুর্দশা দেখে আর গালাগাল শুনে চড়াক করে রক্ত মাথায় উঠে গেল। মারের চোটে ব্যাটার আর্মাপিত্তি বের করে দিলাম। পড়ে পড়ে ব্যাটারছেলে গোঙাতে লাগল, আমিও বাসায় দিলাম পিটটান। বড্ড ভয় হল মনে।

"বাসায় গিয়ে দেখি সেখানেও তখন হৈ-চৈ ব্যাপার। পিসেমশায়ের সঙ্গে দেখা হতেই বললেন, খোকা আর আধ ঘণ্টা পরে ট্রেন, তুই বাড়ি চলে যা, তোর মার অসুখ, টেলিগ্রাম এসেছে। মার অসুখ শুনে আমার দুশ্চিন্তা হল না। সত্যি বলতে কি, এখান থেকে পালাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলাম, টেলিগ্রামটা পেয়ে বেঁচে গেলাম।

"ট্রেনে উঠে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। ম্যাগির চেহারা নানাভাবে চোখের উপর ভেসে উঠতে লাগল।

"বাড়িতে ঢুকতেই মার সঙ্গে দেখা। দিব্যি সুস্থ চেহারা। আমাকে দেখেই শঙ্খ বেজে উঠল, উলু পড়ল। কি ব্যাপার? বাবা এসে বললেন, খোকা, শ্বশুরমশায় তোমার বিয়ে ঠিক করেছেন। কাল যাত্রা করতে হবে, পরশু বিয়ে। এ ক'দিন সাবধানে থেকো। রক্তপাতটাত যেন না হয়। আমার সব গোলমাল হয়ে গেল। বিয়ে? কার বিয়ে? আমার? কেন? মার দেখা পাচ্ছিনে। একান্নবর্তী সংসার, একেই বড়, তারপর আত্মীয়কুটুম্ব আসছেই। রাগে অভিমানে পুড়ে পুড়ে মরছি। শেষটায় নিজের ঘরে দরজা দিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলাম। মা আসতেই বললাম, আমি বিয়ে করব না। মা বললেন, এ বিয়েতে দোষটা কি হল? বাবা তাদের পাকা কথা দিয়ে এসেছেন। ভাল ঘর, ভাল মেয়ে। চীৎকার করে উঠলাম, ছাই মেয়ে। আমার শেষ কথা, আমি বিয়ে করব না। মা গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, বেশ, তোমার বাবাকে

পাঠিয়ে দিচ্ছি, কথাটা তাকেই বল। আর বলাবলি কি, দাদু যখন ঠিক করেছেন, তখন জানি এ বিয়ে হবেই। দাদুর কথা উল্টে দেবে, এমন কেউ এ বাড়িতে নেই।

"টোপর পরলাম। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললাম, মা তোমার দাসী আনতে যাচ্ছি। মনে মনে বললাম, ভগবান বিয়ে হতে না হতেই যেন পোড়ারমুখী মেয়েটা বিধবা হয়। বিয়েতে বাবা গেলেন না। দাদুই বর-কর্তা। শ্বশুররা বিরাট জমিদার। প্রোসেশন যা হল, তা দেখেই তখনকার মতো আমার কান্না থমকে গেল। হাতী, ঘোড়া, চৌদলা, বাজনা, বাদ্য, বাজী দেখে হাঁ হয়ে গেলাম। সাতপাক হল। শুভদৃষ্টিতে ইচ্ছে করেই চাইলাম না। বাসর ঘরে মুখ গোমড়া করে রইলাম। চারদিকে সব ইয়ার্কী ঠাট্টা, হাসি-তামাসা হচ্ছে আর আমার বুক ঠেলে কান্না পাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত পারলাম না, এক সময় বালিশে মুখ গুঁজে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললাম। মুহূর্তের মধ্যে সব স্তব্ধ। জামাই কাঁদছে। বাইরে খবর গেল। বাসর ফাঁকা হয়ে গেল। খবর পেয়ে দাদু এলেন। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে দাদু, আমায় খুলে বল। বলব কি, আমি কি নিজেই জানি। সমস্ত বিরক্তি, ক্ষোভ সব এক সময় কান্না হয়ে ঝরে পড়ল। কাঁদবার পর আমিও কি কম লজ্জিত হলাম। লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করল। ঘণ্টা খানেক পরে দাদু চলে গেলেন। বাসর ঘরে শুধু আমি আর তোর বৌদি। তোর বৌদির দিকে আমি আর চাইতে পারছিলাম না। বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে পড়েছিলাম। অনেকক্ষণ পরে তোর বৌদি আমার কাছে উঠে এল। আমার চুলের মধ্যে আঙ্গুল চালিয়ে দিতে দিতে স্পষ্ট জড়তাহীন স্বরে বলল, দিদিদের কাছে শুনেছি, ছেলেরাই আগে কথা বলে, তা আমার বেলায় সবই উল্টো, তাই আমিই একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমাকে আপনার পছন্দ হয়নি, না?

"তোর বউদির কথায় কি ছিল, জানিনে। আমার সব বীতরাগ, সব বিরক্তি সেই দণ্ডেই জল হয়ে গেল। আমি তড়াক করে উঠে বসলাম। তোর বৌদি দেখতে খুব সুন্দরী ছিল না। কিন্তু সেই রাত্রে, সেই তখন, আমার মনে হল এমন মেয়ে আমি আর দেখিনি। সারা কপালে চন্দন, চেলি পরনে, মুখে সঙ্কোচহীন নম্র সপ্রতিভ হাসি। আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, কে বলল, আপনাকে আমার পছন্দ হয় নি। তোর বৌদি তেমনি হেসে বলল, বলতে হবে কেন? আমি কি বুঝিনে। আমার এমন কী আছে, আপনার পছন্দ হবে। তবে আপনাকে আমার, বলে তোর বৌদি থেমে গেল। আমার বুক ঢিপ ঢিপ

করতে লাগল। বললাম, কি পছন্দ হয়নি তো? তোর বৌদি লজ্জা পেয়ে গেল। বলল, ধ্যেৎ। আপনি পুরুষ মানুষ, আমাকে পছন্দ না হলেও আপনার চলে যাবে, কিন্তু—বলেই তোর বৌদি থেমে গেল। ওর গলা ভারী হয়ে উঠল। বলল, কিন্তু আমার যে আপনি ছাড়া আর কেউ নেই। আমি বলে উঠলাম, বিশ্বাস করুন, আপনাকে আমার খুব ভাল লেগেছে। এই আপনার গা ছুঁয়ে বলছি। তোর বৌদির গায়ে হাত ঠেকিয়েই তা আবার তৎক্ষণাৎ টেনে নিলাম। অনভ্যাসের সঙ্কোচ। তোর বৌদি কিন্তু বুঝল। সারা মুখে হাসি স্থলপদ্মের মতো ফুটে উঠল। দুখানা নরম হাত দিয়ে আমার দুখানা হাত টেনে নিল।

"দুটি বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল। তোর বৌদির ভরা দশমাস। শরীর খারাপ খারাপ। এদিকে আমার শীল্ডের খেলা। বহরমপুর যেতে হবে দল নিয়ে। তোর বৌদির শরীর ভাল নয় দেখে আমি বললাম, যাব না। তোর বৌদি বলল, তাও কি হয়। ফাইন্যাল খেলা, এবারে জিততে পারলে পর পর তিনবার জিতবে, না গেলে চলে? তুমি আবার ক্যাপ্টেন। এবারো জিতবে আমি বলে দিলাম। কাপটা কিন্তু আমার। তোর বৌদি প্রত্যেকবারই গোছগাছ করে দিত, এবারও দিল। মন একটু খুঁৎ খুঁৎ করলেও খেলার নেশায় মেতে গেলাম। সেবার আর জিততে পারলাম না, মনটা খারাপ হয়ে গেল। লজ্জা হল, বৌএর সামনে দাঁড়াব কোন্ মুখ নিয়ে। শেয়ালদায় নামলাম। যে যার বাড়ি চলে গেল। বেরিয়ে আসব, দেখি খুড়তুতো ভাই নরেশ। বলল, সেজদা শিগগির চল। বলে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলল, একটা ট্যাক্সিতে। জিগ্যেস করলাম, কি রে ট্যাক্সি কেন, কোথায় যাব? নরেশ বলল, ড্রাইভার, নিমতলা। আমায় বলল, তোমার জন্যে সবাই অপেক্ষা করছে, তোমাকে মুখাগ্নি করতে হবে। বৌদি কাল শেষ রাতে—

নরেশের কথাগুলো স্পষ্ট করেই শুনলাম। কিন্তু তাৎপর্য বুঝলাম না। মুখে আগুন দিতে হয়, দেব, এ আর শক্ত কি? কার মুখে আগুন দেব, তা আর ভাববার সময় কই আমার। শীল্ড পাইনি কেন, তারই একটা জুৎসই কৈফিয়ৎ বৌকে দেবার জন্য তৈরী হচ্ছিলাম। শুধু মাথাটা কেমন যেন ভারী ভারী লাগছিল। শ্মশানে গেলাম। যন্ত্রের মতো একটার পর একটা কাজ অতি ধীরভাবে করে গেলাম। সবাই আমার স্থৈর্য দেখে অবাক হল। শুধু বাবা বুঝলেন, কোথাও একটু গোলমাল হয়েছে। বাবার সামনে কোনদিন সিগারেট খাইনি। কিন্তু সেদিন একটার পর একটা খেয়ে গেলাম। দাহ শেষ হল। বাড়ি এলাম। বাড়িতে সবাই কাঁদছে। মা আমাকে দেখে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। আমি ধীরে ধীরে

উপরে উঠে আমার ঘরে গেলাম। খাটে বসে আরাম করে সিগারেট খেতে লাগলাম। আর মনে মনে শীল্ড না পাবার কৈফিয়ৎটা আউড়ে নিয়ে তৈরী হয়ে রইলাম। মনে হল তোর বৌদি এক্ষুণি আসবে। ড্রেসিং টেবিলে বড় আয়না ছিল একটা, দরজার দিকে মুখ করা। আয়নার দিকে চেয়ে বসে রইলাম। যা ভেবেছিলাম তাই। তোর বৌদির ছায়া পড়ল আয়নায়। সেই বাসর ঘরের সাজ। কপালে তিলক চন্দন, পরনে চেলি, মুখে সেই সপ্রতিভ হাসি। আমি হঠাৎ ঘুরে, ওরে দুষ্টু বলে ওকে ধরতে দুহাত বাড়িয়ে দিলাম এক লাফ। দরজার চৌকাঠে কপাল গেল ঠুকে। উঠে দাঁড়াতে গেলাম. পারলাম না, ঘুরে পড়ে গেলাম। মা বলেন, দুঘণ্টা নাকি আমার কোনো জ্ঞান ছিল না।"

দাদা চুপ করলেন।

বললাম, "দাদা, বুঝি সেই থেকে ফুটবল খেলা ছাড়লে?"

দাদা জবাব দিলেন না।

একটু থেমে দাদা আবার সুরু করলেন, তারপর বছর দুই কাটল। তখন তেড়ে চাকরী করছি। জুট রেগুলেশন হাকিম। মাইনে যেটুকু কম, প্রতাপ সেই আন্দাজে তত বেশী। জমিতে দাগ দিতে হবে। লোক ভর্তি করছি। মহকুমা শহরের ডাক-বাংলোয় থাকি। তিত বিরক্ত হয়ে উঠলাম। খেতে, শুতে, বসতে, চাকরী দাও, সাহেব একটা চাকরী দাও। কাঁহাতক আর চাকরী দিতে পারা যায় বল। শেষকালে খারাপ ব্যবহার শুরু করলাম। একটা ভোজপুরী দারোয়ান বহাল করলাম। হুকুম দিলাম, বিনা এত্তেলায় কাউকে ঢুকতে দেবে না।

"একদিন প্রায় দেড়শ লোককে তাড়ালাম। পরিশ্রান্ত হয়ে খেয়ে দেয়ে শুতে যাব, দারোয়ান এসে বলল, এক বুড্ঢাবাবু অনেকক্ষণ থেকে বসে আছেন, কিছুতেই যাবেন না, আপনার সঙ্গে মোলাকাৎ করা খুব জরুরী আছে। বেজায় বিরক্ত হলাম। ভাবলাম হাঁকিয়ে দিই। কিন্তু বৃদ্ধ ভেবে আর পারলাম না। বললাম, নিয়ে এস।

"ভদ্রলোক ঢুকলেন, হাঁটুর উপর কাপড় তোলা। মোটা সোটা ফর্সা, সাত্ত্বিক সাত্ত্বিক চেহারা। ছাতার উপরে গামছা জড়ানো, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো। আমাকে বেশ করে দেখে বললেন, তুমিই বিভূতি? হরিবাবু একখানা চিঠি দিয়েছেন। চিঠিখানা এগিয়ে দিলেন। পড়েই তো আমার আক্কেল গুড়ুম। দাদুর চিঠি। লিখেছেন, খোকা, ইনি তোমার ভাবী শ্বশুর। অতি সজ্জন ব্যক্তি। তোমাকে দেখিতে যাইতেছেন। যথাযোগ্য সমাদরের ত্রুটি না

হয়। আমি আগামী পরশ্ব ইঁহার কন্যাকে দেখিতে যাইবার পথে তোমার ওখানে হইয়া যাইব। চিঠি পড়ে আমার অবস্থাটা বোঝ, কি হল। তাড়াতাড়ি বেকুবের মতো প্রণাম করতে গেলাম। বাধা দিয়ে বললেন, থাক, বাবাজী থাক। তক্ষুণি চলে যাবেন। খেয়ে দেয়ে যেতে অনুরোধ করলাম। রাজী হলেন না, চলে গেলেন।

দুদিন পরে দাদু এলেন। মেয়ে দেখতে গেলেন। দেখে এসে রাতটা আমার ওখানে কাটালেন। পরদিন সকাল বেলা খেয়ে দেয়ে ট্রেনে উঠলেন। এর মধ্যে আর একটা কথাও বললেন না। ট্রেন ছাড়বে ছাড়বে, এমন সময় দাদু বললেন, মেয়ে সুন্দরী। এই নাও হাতের লেখা। পাকা কায়েতের মতোই। আর হাঁ, ছুটির দরখাস্ত করে দাও। আজ পাঁচুই, সামনের ঊনত্রিশে বিয়ে। সাতাশ তারিখে তোমাকে নিতে আসবে, তৈরী হয়ে থেকো। ট্রেন ছেড়ে দিল। কাগজের টুকরো খুলে দেখি, গোটা গোটা অক্ষরে লেখা, শ্রীমতী কাঞ্চন দত্ত।

"বিয়ে হয়ে গেল। শুভদৃষ্টির সময় চোখ ধেঁধে গেল। খুবই রূপসী ছিল। ফটোখানা দ্যাখ।"

দাদা ফটোখানা ঘুরিয়ে ধরলেন, অস্বীকার করবার উপায় নেই।

দাদা বললেন, "জোড়ে বাড়ি এলাম। বৌ দেখে সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল। মা বরণ করে ঘরে তুললেন। সবাই মিলে ঘরে ঢুকলাম। ঘরে ঢুকেই তোর বৌদি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখি একদৃষ্টে তোর আগের বৌদির দেয়ালে টাঙানো ফটোখানার দিকে চেয়ে আছে। বিয়ে করতে যাওয়ার আগে ফটোখানায় একটা মালা ঝুলিয়ে দিয়ে গিয়েছিলাম। তোর বৌদি ফটোখানার দিকে চেয়ে রইল। ওর সুন্দর মুখখানা কঠিন হয়ে গেল। চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরুবে। আমায় ধমকে বলল, এক্ষুণি যাও, ওটা বাইরে রেখে এস। ওসব যার তার ছবি এখানে টাঙানো চলবে না।

"নতুন বৌএর মুখে শ্বশুরবাড়িতে পা দিতে না দিতে এ ধরনের কথা কেউ শুনেছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু আমি একটা কথাও বাড়িয়ে বলছিনে। আমরা সবাই অপ্রস্তুত। আমার সব কিছু বিস্বাদ হয়ে গেল। তবুও মুখের হাসি বজায় রেখে বললাম, বেশ তো, এক সময় সরিয়ে ফেললেই হবে। বললে বিশ্বাস করবিনে, ওকথা শুনেই একেবারে ক্ষেপে উঠল। চীৎকার করে বলে উঠল, কেন এখন সরাতে কি কলজে পুড়ে যাবে? সোহাগের মানুষের গলায় মালা ঝোলানো হয়েছে। সরাও, এক্ষুণি সরাও বলছি। মায়ের দিকে চেয়ে দেখি চোখে জল। যাবার সময় কান্না চেপে বলে গেলেন, সরা খোকা, ছবিখানা আমার ঘরে রেখে আয়। সবাই সেই মুহূর্তে চলে গেল।

আমি বিমূঢ় হয়ে পড়লাম। ইচ্ছে হল মেয়েটাকে খুন করে ফেলি। কিন্তু কিছুই করলাম না। নিঃশব্দে ফটোটা নামিয়ে নিয়ে চলে গেলাম।

"রাত্তিরে বিরাট এক খাটের দুই পাশে দুজনে শুয়ে রয়েছি। রাত অনেক হয়েছে। নানারকম কথা ভাবছি। তোর বৌদির উপর বিতৃষ্ণা এত বেড়েছে যে, ওর দিকে চাইছিও না। হঠাৎ মনে হল যেন কান্না শুনলাম। কান খাড়া করে শুনি সত্যি। তোর বৌদিই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ওর চাপা কান্নার শব্দে ওর প্রতি সহানুভূতির ভাবটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সরে গিয়ে ওর গায়ে হাত রাখলাম। ও কাঠ হয়ে শুয়ে রইল আর ফোঁপাতে লাগল। আমি আর থাকতে পারলাম না। উঠে বসে কোলের উপর ওর মাথাটা তুলে আদর করে ডাক দিলাম, কাঞ্চন। এতক্ষণ পরে তোর বৌদি আমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললে। বললাম, চুপ কর, চুপ কর, কি হয়েছে, আমাকে বল তো লক্ষ্মীটি। অনেকক্ষণ সান্ত্বনা দেবার পর ও চুপ করল। নিজের হাতে ওর চোখ মুখ মুছিয়ে দিয়ে ওকে কাছে টেনে শুয়ে রইলাম। খানিক্ষণ পরে তোর বৌদি বলল, আমাকে ক্ষমা কর। সকালবেলা আমার মাথার ঠিক ছিল না। সতীনের ছবি আমি আর সইতে পারি নি।

"আর কোনোদিন পারলোও না। দেড়টা বছর ছিল, কিন্তু কি বলব ভাই, জ্বালাতন করে খেয়েছে। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আগের বউএর কথা জিজ্ঞাসা করত। দেখতে কেমন ছিল, আমায় কেমন ভালবাসত, আমি তাকে কেমন ভালবাসতাম। প্রথম প্রথম জবাব দিয়ে বিপদ বাধাতাম। তোর বৌদি চীৎকার করে আগের বৌকে গালাগাল দিত। জিনিসপত্র ভাঙত। তোর আগের বৌদির প্রায় পঁচিশখানা ফটো ছিল। সব ভেঙে তচনচ করে দিয়েছে। বাড়ী-শুদ্ধ সবাই আমরা জ্বালাতন হয়ে গেলাম। আমাদের সহ্যের সীমা অতীত হয়ে গেল। শেষকালে একদিন আর পারলাম না। মাকে গিয়ে বললাম, মা ওকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। নইলে কোনদিন ওকে খুন করে আমি আত্মহত্যা করব। মা বললেন, সেই ভাল। কিন্তু সেইদিন বিকালে এসে বললেন, এই ভাদ্র মাসে তো বউকে পাঠানো যাবে না, বাবা, বউ যে ভরপোয়াতি। চমকে উঠলাম, অ্যাঁ!

"খবরটা বোধ হয় ও-ও শুনেছিল। তাই আশ্চর্য খুশী দেখলাম ওকে। এত সুন্দর দেখাচ্ছিল যে, অনেক দিন পরে ফটো তোলবার ইচ্ছেটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এর আগে যতবার চেয়েছি, ও না করেছে। সেদিন সত্যিই ওর মেজাজ ভাল ছিল। তাই বলতেই পট করে রাজী হয়ে গেল। ফটো তুললাম। ছেলেমানুষের মতো বায়না ধরল, ছবি দেখাও। যত বলি, কাল

তৈরী হবে। ততই জিদ ধরে, না এখনই দেখাতে হবে। পরদিন প্রিণ্ট করে আনলাম আর এনলার্জ করতে দিয়ে এলাম। ছবিখানা ভালই উঠেছিল, কি বলিস?"

দাদা ছবিখানার দিকে আরেকবার চাইলেন। সত্যি ফটোটা ভালই তোলা হয়েছিল।

দাদা বললেন, "এনলার্জখানা নিয়ে এলাম। তখনো কী খুশী! সারাদিন ফটো বুকে করে কাটালো। সন্ধ্যের দিকে চান খাওয়া করতে গেছে, আর আমি ছবিটা টাঙিয়ে ফেললাম সেই অবসরে। ভেবেছিলাম তোর বৌদি খুশীই হবে। কিন্তু হল উল্টো। ওখানে তোর আগের বৌদির ফটোটা টাঙান থাকত। তাই দেখেই ক্ষেপে গেল। আবার সেই চীৎকার আর গালাগাল, অশান্তির একশেষ। ফটোখানা খুলে নিয়ে ওর তোরঙ্গে বন্ধ করে রেখে দিল।

"দুদিন বাদে অসুখে পড়ল। প্রথমদিকে ডাক্তারে ধরতে পারেনি। যখন ধরল টাইফয়েড তখন আর চারা নেই। একুশদিন ভুগে তোর বৌদি মারা গেল। এ একুশ দিন তোর বৌদির বিছানা ছেড়ে উঠতে পারিনি। ও উঠতে দেয়নি। আমার হাতে ছাড়া আর কারো হাতে খায়নি। বালিসে মাথা দিয়ে শোয়নি। মাথা দিয়েছে আমার কোলে। শেষ তিন দিন জ্ঞান ছিল না। একদিন অনেক রাত্রে ওর মাথাটা কোলে রেখে দেয়ালে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। তোর বৌদির ডাকে ঘুম ভাঙল। বলল, শোন একটা কথা বলে নিই। আর হয়ত সময় পাব না। তোমাকে খুব যন্ত্রণা দিয়ে গেলাম। তার জন্য ক্ষমা চাইব না। দিদির মতো ভালোবাসা আমি পাইনি। কিন্তু তবুও ওর ওপর টেক্কা দিয়ে গেলাম। স্মৃতি হয়ে দিদি যতদিন বাঁচবে, স্মৃতির কাঁটা হয়ে আমি তার চেয়েও বেশী দিন তোমার কাছে বাঁচব। আমাকে তুমি কিছুতেই ভুলতে পারবে না।

"আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু তোর নতুন বৌদি আসতে না আসতেই তো সব ভুলিয়ে দিল। কই এই আট নয় বছরে একদিনও তো মনে পড়েনি।

"আজ বাসা বদলাতে গিয়ে ফটোটা নজরে পড়ল, তাইতো! এই ফটোটার কথাও তো প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। অন্যান্য বাজে জিনিসের সঙ্গে এটাকেও পাঠিয়েছিলাম ফটোবাঁধাই-এর দোকানে। কিন্তু আমি ভুললে কি হবে, ফটোটা আমাকে ভোলেনি। তাই প্রায় ঘাড় ধরেই নিয়ে গেল দোকানে। দোকানে ঢুকেই বুকটা ধড়াস করে উঠল। দেখি আমাদের বাড়ীর ছবিগুলোই ছিঁড়ে ছিঁড়ে দোকানী ফ্রেম পরিষ্কার করছে। জিজ্ঞাসা করলাম, সব ছবিগুলোই

ছিড়ে ফেলেছ? দোকানী বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু। আর অমনি আমার হৃদ-পিণ্ডে কে যেন চাবুক মারল। কেন ছবিটা দোকানে দিয়ে গেলাম। কেন আরো আগে এলাম না। অনুশোচনায় অন্তর পুড়তে লাগল। দোকানী বলল, বাবু আপনার একখানা ফটোক ভুলে চলে এসেছে, ওটা নিয়ে যান। বলে ছবিখানা দিয়ে দিল। হঠাৎ খুব খুশী হয়ে উঠলাম। ছবিখানা ভাল ভাবে প্যাক করে নিয়ে তো বের হলাম। তারপর খেয়াল হল, তাইতো ছবিটা এখন রাখি কোথায়। ভাবতে ভাবতে তোর কথা মনে পড়ল। ছবিটা তোর কাছেই থাক।"

দাদা থামলেন। সাড়ে এগারটা বাজল।

দাদা ঘড়ি দেখে বললেন, "উঠি আজ, রাত হল।"

দাদা আবার ফিরে এলেন। একটু অপ্রস্তুত হেসে বললেন, "যত্ন করে রাখিস, বুঝলি?"

বললাম, "এতই যখন ভয়, তখন সঙ্গেই রেখে দাও না।"

দাদা বললেন, "বাড়ীতেই নিতাম। কিন্তু তোর বৌদি তখনই কোনো কথা বলল না। এখন আবার এ ছবি নিয়ে গেলে—বুঝলিনে, হাজার হোক মেয়েমানুষ তো।"

॥ দুই ॥

আমরা, যারা লিখে খাই, কিছুদিন যেতে না যেতেই এমন একটা অভ্যাসের কুচক্রে পড়ে যাই, যার হাত থেকে সহজে নিস্তার মেলে না। দৃষ্টিশক্তি সাধারণ লোকের চেয়ে লেখকদের তীক্ষ্ণ কিনা, বেশী সরেস কিনা বলতে পারিনে, তবে ভুক্তভোগী হিসেবে জানি, বলতে পারি, আমাদের লেখকদের, সাংবাদিক, সাহিত্যিক অর্থাৎ যারা লিখে খাই তাঁদের, দৃষ্টি-ভঙ্গীটা সাধারণ লোকেদের চাইতে ভিন্ন।

পেশাদার হবার দোষটা এই, মানুষকে আর নিছক মানুষ হিসেবে আমরা দেখিনে, দেখতে পারিনে, তাদের দেখি এক একটা চরিত্র হিসেবে। দর্জিরা যেমন ছাঁট কাপড় যত্ন করে তুলে রাখেন, দরকার মতো একটা ছাঁটের টুক্‌রো দিয়ে ফ্রকের ঘের আর অন্য ছাঁটটুকু দিয়ে পুট আর হাতা আর কলার আর সম্পূর্ণ নতুন একটা টুক্‌রো জুড়ে কোমরের পট্টি লাগান, আমরাও তাই করি।

শ্রীমতী সুষমা দত্তের চেহারা, শ্রীমতী অলকা হালদারের কথা বলবার ধরন, শ্রীমতী লাবণ্য গুপ্তের মেজাজ আর শ্রীমতী বরুণা চক্রবর্তীর সদ্‌গুণ বদ্‌গুণটুকু নিয়ে আমরা এক শ্রীমতী ঈষিতা ভট্টাচার্য খাড়া করি।

অবশ্যি, ওটা সাধারণ নিয়ম। ব্যতিক্রমও থাকে। যেমন, আমার বর্তমান গল্পটি।

শ্রীমতী বসুর কথা বলছি। ভবানীপুর অঞ্চলে বছরখানেক কাটিয়েছিলুম একবার। আমি আর আমার এক বন্ধু, আর্টিস্ট, থাকতুম একসঙ্গে। সেই সময় আমরা ছিলুম শ্রীমতী বসুর প্রতিবেশী।

প্রতিবেশী, ওই নামেই। শ্রীমতী বসুর বয়েস হয়েছে, চল্লিশ পার। ওঁর মেয়ে লিলি, বয়েস প্রায় কুড়ি, কলেজে পড়ে। লিলির মা বলেই শ্রীমতী বসুর পাড়ার রক্‌ফেলোদের কাছে বেশ নামডাক ছিল। যে কবার আমি ওঁকে দেখেছি, সব কবারই মোটরে। গলির মোড়ে ঠেলাগাড়ির ভিড়। ওঁর গাড়িকে সেই ভিড় না সরা পর্যন্ত থামতে হ'ত। আর সেই ফাঁকে আমার জানালা দিয়ে ওঁকে দেখে নিতুম, গাড়ির গদিতে ঠেস্ দিয়ে নিবিষ্ট-মনে উল বুনছেন।

দেখতে দেখতে ও'র এই চেহারাটাই চোখে অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। মোটরে চড়া আর উল বোনা ছাড়া যে ও'র আর কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে, সে ধারণা আমার ছিল না।

তাই ও'কে একদিন হঠাৎ আমাদের বাসায় উপস্থিত হ'তে দেখে অবাক হয়ে গেলুম। শ্রীমতী বসু একা নন, সঙ্গে ছিলেন আরো দু'জন। শ্রীমতী বসুই পরিচয় করিয়ে দিলেন, শ্রীমতী গুপ্ত, জাস্টিস্ গুপ্তর ভাইবউ, আর শ্রীমতী ওয়াদেকর। বিরাট এক বিলাতী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মারাঠী ডিরেক্টরের স্ত্রী। অকস্মাৎ বিশিষ্টা মহোদয়াগণের আগমনে বিলক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলুম। বসবার স্থান মাত্র তক্তপোষটি। সেইখানে ওঁদের বসিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

শ্রীমতী বসু একটু সরে বসে, পাশের জায়গাটুকু দেখিয়ে বললেন, "বোসো না বাবা, তুমি তো ছেলের বয়সী, অত লজ্জা কি? আর মাথার উপর এই বিপদ, এখন তো অত শত বাছ বিচার চলে না।"

বিপদ অর্থে, উনি দাঙ্গার কথা ইঙ্গিত করলেন। তখন কলকাতায় দাঙ্গা সবে শুরু হয়েছে। গরম গুজবে এদিকের বাতাস তোলপাড়। একদল নিরাশ্রয়কে পার্ক সার্কাস অঞ্চল থেকে উদ্ধার করে আশুতোষ কলেজে এনে রাখা হয়েছে।

শ্রীমতী বসু বললেন, "আজ গিয়েছিলুম আশুতোষ কলেজে। দেখে এলুম। ওঃ কি সাংঘাতিক! দেখা যায় না, এমন দুর্দশা!"

শ্রীমতী গুপ্ত বললেন, "জাস্টিস্ গুপ্ত ও'র ভাইকে বলছিলেন, যে সর্বনাশ এই অল্প সময়ে পার্ক সার্কাসে ঘটল, তার সিকিও নাকি এই যুদ্ধে ইওরোপে হয়নি।"

"তবে", শ্রীমতী বসু বললেন, "ইওরোপের রমণীদের চাইতে আমাদের দায়িত্বও চারগুণ বেশী কিনা?"

সমর্থনের আশায় শ্রীমতী ওয়াদেকরের দিকে চাইতেই তিনি মাথা নেড়ে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, "নিশ্চয়ই"।

"তাইতো, আমরা মেয়েরা আজ বিলাস ব্যসন ত্যাগ করে এগিয়ে এসেছি। আর্ত আতুর, নিরাশ্রয়দের (তখনো "উদ্বাস্তু" কথাটার চল হয়নি) পুনর্বাসনের কাজটা হাতে তুলে নিয়েছি।"

শ্রীমতী বসু বলে চললেন, "মেয়েদের কাজ প্রতিষ্ঠা করা, তা আমরা করব, করছিও। আর পুরুষরা করবে আমাদের রক্ষা। তা হ্যাঁ বাবা", বলে তিনজনেই আমার দিকে চাইলেন।

শ্রীমতী বসু বললেন, "শুনলুম, তোমরা নাকি রক্ষীদলে যোগ

দাও নি। কি নাম যেন, গোপেশ্বর, হ্যাঁ গোপেশ্বর চাকীআমার মেয়ে লিলিকে সে কথা বলছিল। লিলিও ঝাঁসী ব্রিগেডের নায়িকা হয়েছে কিনা। গোপেশ্বররা রাতদিন ফ্রণ্টে পড়ে আছে তো। ওরা বলছে, জান কবুল, রাস্তায় যদি রক্তে নদী বয়ে যায়, শহীদ্‌দের মৃতস্তূপে পাহাড় হয়ে যায়, তবুও একটি শত্রুও রাস্তা পেরিয়ে এ ফুটে পা দিতে পারবে না। ল্যান্সডাউন রোডের ও ফুটপাথেই সবাইকে রুখে দেবে, এমন যোগাড়যন্ত্র ছেলেরা করে রেখেছে। অথচ দেখ ছেলেগুলোর প্রতি কি বিশ্রী ধারণা আমাদের ছিল। বখাটে, বদমাস, রকবাজ কতরকম মন্তব্যই শুনেছি।"

শ্রীমতী বসু বললেন, "আর তোমরা কিনা দেশের এই সংকটে একদম নিষ্ক্রিয় থেকে গেলে। ছিঃ।"

লজ্জা পেলাম। বললুম, "আজ্ঞে, আমাদের খবরের কাগজের কাজ...... এমন বেয়াড়া সময় শুরু হয়, শেষ হয়......যে দেশের কাজ করবার সময় আর পাওয়া যায় না......"

কথা শেষ হ'ল না। শ্রীমতী বসু বলে উঠলেন, "খবরের কাগজে কাজ কর তুমি!"

শ্রীমতী গুপ্ত বলে উঠলেন, "নিউজ পেপারে! রিয়েলি!"

"বাঃ! তা বেশ, বেশ।" শ্রীমতী বসু ফিস্ ফিস্ করে বললেন, "তা বাবা সিক্রেট খবর কিছু আছে নাকি? অ্যাক্‌চুয়ালি ওরা কতজন ঘায়েল হয়েছে বল তো বাবা। কাগজে তো সব খবর ভাল পাওয়া যায় না। ওদের হাতে গভ্‌মেণ্ট। ইচ্ছেমত সেন্সার করে, কি বল?"

বললুম, "কাগজে যা বেরোয়, আমরাও অতটুকু জানি।"

শ্রীমতী গুপ্ত বললেন, "ব্রিগেডিয়ার চাকী বলছিলেন, কাল নাকি চার ট্রাক হিন্দু নারী এবং শিশুকে ধাপায় কবর দেওয়া হয়েছে। তবে ওঁরা এসব খবর কোত্থেকে পান?"

বললুম, "ব্রিগেডিয়ার চাকীই জানেন।"

শ্রীমতী বসু বললেন, "তা বাবা ভালই হয়েছে, তোমাকে আমাদের মধ্যে পেয়ে খুশী হলাম। ঠিক আছে, তোমাকে আর ফিল্ডে যেতে হবে না। সবাইকেই যে সব কাজ করতে হবে তার কোন মানে নেই। তবে, তোমাকেও কিছুটা কাজ করতে হবে, একেবারে কোনো দায়িত্ব নেবে না সমাজের, তা কি হয়? আমাদের নারী পুনর্বাসন সমিতির খবর কিছু ছাপিয়ে দিতে হবে বাবা। আমরা আত্মপ্রচার চাইনে। তবে উনি বলেন, এসব কাজের সামাজিক মূল্য অসাধারণ। এগুলি প্রচারিত হলে আরো অনেকে উৎসাহ

পেতে পারেন। এইভাবেই সৎকর্মের দৃষ্টান্ত বেড়ে যেতে পারে। নয় কি?"
হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। বললুম, "অবশ্যই"।
ওঁরা তিনজনে উঠলেন। পরদিনই এক নেমন্তন্নের চিঠি পেলাম শ্রীমতী বসুর কাছ থেকে। নারী পুনর্বাসন সমিতির বিশেষ ডিনার মিটিং-এ আমার আমন্ত্রণ হয়েছে।
ডিনারে প্রায় গোটা পাঁচেক পদ ছিল। খাদ্যবস্তু যেমন প্রচুর তেমন সুস্বাদু। খেতে খেতে শ্রীমতী বসু আর শ্রীমতী গুপ্তই আলোচনা করলেন বেশী। আলোচনার বেশী অংশটাই দেখলুম আশুতোষ কলেজের নিরাশ্রয়দের নিয়ে। ওদের যথাযোগ্য পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিতে হবে ভবানীপুরের বাসিন্দাদের। প্রতিবেশীর এই বিপদে নীরব দর্শক হয়ে থাকলে চলবে না। এর জন্য মুক্ত হস্তে তাঁরা যেন সাহায্য করেন, সে আবেদন শ্রীমতী বসু পুনর্বাসন সমিতির সভানেত্রী হিসেবে তাঁর দেশবাসী ভবানীপুরের বাসিন্দাদের কাছে করলেন।
শ্রীমতী গুপ্ত বললেন, "এই সুযোগে হল্ ভাড়া করে একটা 'শো'-এর আয়োজন করলে কি হয়?"
"বেশ হয়, বেশ হয়।" শ্রীমতী বসু বললেন, "রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকা কি শ্যামা। লিলির তো ওসব তৈরীই আছে। হাঙ্গামা করতে হবে না।"
জাস্টিস্ গুপ্তর ছোট ছেলে তরুণ গুপ্ত কম্যুনিস্ট। কাকীর উপর তাঁর প্রভাব খুব।
তিনি বললেন, "সব কাজে রবীন্দ্রনাথকে টানা ঠিক নয়। তাছাড়া, ওঁর বুর্জোয়া স্পিরিটটা ঠিক এই অকেশনে খাপ খাবে না।"
কাঁটার সাহায্যে সিদ্ধ মটরশুঁটির দানা মুখে পুরতে পুরতে তরুণ গুপ্ত বললেন, "যদি জাঁকজমক করে একটা লোকসংগীত—ধরুন, শেখ কাল্লু আর মধু সরকারের কবির লড়াই-এর অনুষ্ঠান করা যায়, তাহ'লে এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাবে। আমাদের ভুলে যাওয়া কালচার আর এই দুর্গত, ধরতে গেলে দুই-এরই পুনর্বাসন হয়ে যাবে। অথবা হিন্দু-মুসলিম ইউনিটির উপর একটা ড্যান্স ড্রামা কম্পোজ করলে ভাল হয়।"
শ্রীমতী গুপ্ত আমাকে বললেন, "চটপট লিখে দিন না।"
সবিনয়ে বললুম, "মাপ করবেন, ওটা আমার আসে না।"
শ্রীমতী গুপ্ত বললেন, "বেশ ড্রামা না হয় না লিখলেন, কিন্তু এই মহৎ কাজের প্রচারের দায়িত্ব কিন্তু আপনাকে নিতে হবে। খবর টবর যা কিছু কাগজে দেবার দায়িত্ব কিন্তু আপনার। আফ্টার অল্ এটা দেশেরই তো কাজ।"

এটুকু বলেই শ্রীমতী গুপ্ত আমার খুব কাছে ঘেঁষে বসলেন। তার পর শ্রীমতী বসুর দিকে ইঙ্গিত করে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, "দেখতেই তো পাচ্ছেন, আত্মপ্রচার কিভাবে এখন থেকেই শুরু হয়ে গেছে। মনে মনে প্যাঁচ কষছেন স্টেজে মেয়েটাকে নাচাবার।"

সেই ডিনার পার্টিতেই একটা কমিটি তৈরী হল। শ্রীমতী বসু সভানেত্রী, শ্রীমতী গুপ্ত সম্পাদিকা আর শ্রীমতী ওয়াদেকরকে ভার দেওয়া হ'ল কোষের অর্থাৎ ক্যাশের।

শ্রীমতী ওয়াদেকর মারাঠি, নিঃসন্তান, বয়েসেও ওঁদের চেয়ে ছোট। বাংলাদেশে অনেকদিন ধরে আছেন, তাই বাংলাটা ভাল জানেন। ওঁকে আমার কেমন যেন লাগল। কথাবার্তা বিশেষ বলেন না, বলতে চান না। ধরনটা একটু বোকা বোকা। শ্রীমতী বসুর কথাতেও হ্যাঁ বলছেন, শ্রীমতী গুপ্তর কথাতেও ঘাড় নাড়ছেন। মনে হ'ল দলে ঢোকাটাই ওঁর উদ্দেশ্য, তাই দু'জনকে এমন খোসামদ।

যাহোক, এই তিনটি মহিলা কাজ কাজ করে অস্থির হয়ে উঠলেন। বাড়ি বাড়ি ঘুরে নারীদের জাগিয়ে তুলতে লাগলেন, আর নরদের পাঠালেন ফ্রণ্টে। ফ্রণ্ট লাইন থেকে ব্রিগেডিয়ার চাকী নিত্য বুলেটিন পাঠিয়ে পাড়া সরগরম করে রাখলে। ব্যাণ্ড ট্যাণ্ড বাজিয়ে পাড়াময় কুচকাওয়াজও করে গেল একদিন। নানাস্থান থেকে আশ্রয়প্রার্থী এসে আশুতোষ কলেজে জমতে লাগল। তাই শ্রীমতী বসুর কি উত্তেজনা!

ঘন ঘন চা পার্টি, ডিনার পার্টি, লাঞ্চ পার্টি দিতে লাগলেন। খাবার টেবিলে বসে অনর্গল দিতে লাগলেন তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণ। কি করুণ, কি হৃদয়গ্রাহী!

শ্রীমতী বসু বললেন, "আর তাকানো যায় না ওদের দিকে। ঘরসংসার ভেঙে তচনচ হয়ে গেছে ওদের। রিক্ত নিঃস্ব হয়ে পড়েছে।"

হঠাৎ দেখলেন শ্রীযুত বসু বয়কে মাংসের পদটা ফিরিয়ে দিচ্ছেন।

বললেন, "ওকী! ওটা স্পেশালি তৈরী। খেয়ে দেখ। বাঃ, কষ্ট করে বানান হ'ল, নষ্ট করবে? আর নষ্ট করার দিন কি আছে না কি? দেশের যে কি দুর্দিন, তা'তো নিয়তই দেখছি। আশুতোষ কলেজে গিয়ে একদিন দেখে এস। আহা, খাওয়া জুটছে না কারো। কিভাবে যে সব আছে!" ওঁর চোখ ছলছল করে এল। চোখের জল চেপে স্বামীকে বললেন, "মাংসটুকু খেয়ে ফেল। প্রিপ্যারেশনটা ভালই হয়েছে।"

সেদিনকার ডিনারে শ্রীমতী গুপ্ত আসেননি।

শ্রীমতী বসু ওয়াদেকরকে বললেন, "হ্যাঁ বসন্ত, তুমি নীলিমার কাছে গিয়েছিলে ?"

শ্রীমতী ওয়াদেকর হেসে ঘাড় নাড়লেন।

"কি রাজী হ'ল ?"

শ্রীমতী ওয়াদেকর হেসে বললেন, "না।"

শ্রীমতী বসু খুব চটে উঠলেন, "জানি, জানি, এসব হিংসে, স্রেফ্ হিংসে ছাড়া আর কিছু নয়। আমার মেয়ে নাচতে পারে, গাইতে পারে, বছর বছর কাগজে ছবি বেরোয়, প্রাইজ পায়, আর ওঁর মেয়ে তো কিছু পারে না, তাই উনি রাজী নন্ নৃত্যনাট্য করতে। ওঁর ভাইপো বলেছে 'ফোক্ ড্যান্স', উনি তাতেই নেচে উঠেছেন। আমার মেয়ে কি আর একদিনে তৈরী হয়েছে, কত পয়সা ঢালতে হয়েছে তার পিছনে। সে বেলায় বড় কিপ্পন। বলতে নেই, দেশের সামনে এই এত বড় দুর্যোগ দেখা দিয়েছে, যা করবার সব তো আমিই করছি। ডিনার ব'ল, লাঞ্চ ব'ল, সব আমার ঘাড়ে। আজ পর্যন্ত একটা টি পার্টি দিলে না ওরা। উনি বলেন, দুঃখ করো না, রেস্‌পন্‌সিবিলিটি সবার সমান থাকে না। না তোমরাই বলো, দেশের এই অবস্থা, এখন কি নিজেদের মধ্যে বিভেদ ভাল? একতা গেলে আর থাকল কি? নীলিমা এখন বলছে কি জান, নাচ ফাচের দরকার কি, টাকা তো এমনিই তোলা যায়। শোন কথা, ভারি নতুন জিনিস শোনালেন। টাকা কি আর তোলা যায় না, ও যদি ও'র দু' তিনটে বন্ধুকে বলে তো এক্ষুণি দশ হাজার টাকা উঠে আসে। জাস্টিস্ গুপ্ত তার আদ্ধেকও তুলতে পারবেন না। অথচ উনিই তো নীলিমার খুঁটি। তবে হ্যাঁ, লোকগুলো যে অতগুলো টাকা চ্যারিটি করবে, সে কি অমনি অমনি, তাঁদের একটু আনন্দ ফুর্তি দিতে হবে না? বলো?"

শ্রীমতী ওয়াদেকর হেসে বললেন, "ঠিক কথা।"

শ্রীমতী বসু গলা একটু নীচু করে বললেন, "যাই বলো বাপু, লেখাপড়া শিখলে হবে কি, ওর নজরটা বড় নীচু। জাস্টিস্ গুপ্ত ছাড়া নাম করবার মত লোক ওদের ফ্যামিলিতে আর কে আছে, মনে তো পড়ে না।"

শ্রীমতী ওয়াদেকর হাসলেন।

বিস্তারিত বলবার দরকার নেই। পাঠক-পাঠিকারা লেখকদের চাইতেও হুঁশিয়ার, এ ধরনের অভিজ্ঞতাও তাঁদের প্রচুর আছে। শ্রীমতী বসুদের কমিটির সাধারণত যে পরিণতি হয়, তাই ঘটল। শো নিয়ে মনোমালিন্যের সূত্রপাত। ফলে একটা কমিটি ভেঙে দুটো কমিটি হ'ল। শ্রীমতী বসুর

কমিটিতে প্রেসিডেণ্ট এবং সেক্রেটারী তিনি নিজেই হলেন। আর ক্যাশিয়ার হলেন শ্রীমতী ওয়াদেকর। আর দুটো কমিটির প্রচারের দায়িত্বই আমার ঘাড়ে চাপান হ'ল।

তাতে তত আশ্চর্য হইনি, যতটা হলাম দিনকয়েক পরে। দিন চারেক বাইরে ছিলাম। ফিরতেই শ্রীমতী বসুর আহ্বান পেলাম। গিয়ে দেখি, শ্রীমতী গুপ্তর সঙ্গে খুব গল্প জমেছে।

আমাকে দেখেই শ্রীমতী বসু বললেন, "এস বাবা এস, জরুরী ব্যাপারে তোমাকে খুঁজছিলাম। একটা খবর ছাপাতে হবে। আমাদের দুটো কমিটি এক হয়ে গেল কি না!"

"দুটো মিলে একটা জয়েণ্ট কমিটি হ'ল।" শ্রীমতী গুপ্ত বললেন, "দেশের এই সঙ্কটে একতাই হ'ল বল, শক্তি।"

শ্রীমতী বসু বললেন, "শো-এর বন্দোবস্তও জয়েণ্টলি করা হচ্ছে। ওর ভাশুরপো ছেলে খুব ভাল, সেই প্রযোজনা করছে।"

শ্রীমতী গুপ্ত বললেন, "আর লিলি তো চমৎকার নাচে। অনুষ্ঠানটা ভালই হবে। এ খবরটা ছেপে দিতে হবে কিন্তু।"

হঠাৎ জিগ্যেস করে বসলাম, "আচ্ছা, ওয়াদেকরকে দেখছি না যে।"

শ্রীমতী বসু বিরক্ত হয়ে বললেন, "ওর কথা ছেড়ে দাও। ও আর আসছে না।"

শ্রীমতী গুপ্ত একটু মুচকি হেসে বললেন, "আসবে কি করে, ও যে ছেলে নিয়ে বড় ব্যস্ত আজকাল। ছেলেটার খুব অসুখ কি না।"

"ছেলে! ওয়াদেকরদের ছেলে ছিল নাকি?"

শ্রীমতী বসু বললেন, "আদিখ্যেতা আর কি? সেদিন আশুতোষ কলেজে দস্তুরমত থিয়েটার করে ফেললে। না-জানা, না-শোনা, একটা কোথাকার কার বাচ্চা বাড়ি নিয়ে চলে এল। কি, না ওর কেউ নেই। আরে কেউ নেই বলেই কি তাকে ঘরে তুলতে হবে। আর ওকি বাঁচবে নাকি ভেবেছ?"

শ্রীমতী গুপ্ত বললেন, "আমি ভাল করে খবর নিয়ে জেনেছি, ছেলেটি মুসলমানের।"

"মুসলমানের!" শ্রীমতী বসু আঁৎকে উঠলেন।

শ্রীমতী গুপ্ত বললেন, "হ্যাঁ, তালেগোলে কি করে চলে এসেছিল। তাই তো একপাশে পড়ে থাকত। কেউ ছুঁতো না। সে কথা আমি ওঁকে বললামও।"

"তা শুনে কি বললে?"

"হাসল" শ্রীমতী গুপ্ত বললেন, "যেমন বোকার মত বরাবর হেসে থাকে।

তারপর যা করল, তা দেখে আমার আর থাকতে ইচ্ছে হ'ল না। আমি তাড়াতাড়ি চলে এলাম। আর ওদের বাসায় যাইনি। যেতে ইচ্ছেও করিনে।"

"কি করল, কি করল?"

শ্রীমতী গুপ্ত বললেন, "ছেলেটিকে কোলে নিয়ে চুমু খেল।"

"অ্যাঁ, কি ঘেন্না, কি ঘেন্না!" শ্রীমতী বসুর যেন ফিট হবে এমন হ'ল। একটু সামলে নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, "যাই বল না কেন, টাকা-পয়সা যতই থাক, আর লেখাপড়া যতই করুক, নজরটা বড় নীচু।"

শ্রীমতী গুপ্ত অন্তরঙ্গ হয়ে বললেন, "আমি তো সবরকম লোকের সঙ্গেই মিশেছি দিদি, দেখেছি, বাঙালী না হলে রুচিটা কারো ভাল হয় না।"

॥ তিন ॥

"লেখাটা ভাব প্রকাশের সবচেয়ে দুর্বল মাধ্যম। পুওরেস্ট মিডিয়াম।" কথাটা কালাদা বলেছিলেন।

কালাদা লিখতেন না। আঁকতেন। আমি আঁকতে পারিনে। কালাদাচরিত, তাই, বাধ্য হয়েই কথায় ফোটাতে হচ্ছে। নিত্যি নিত্যি নতুন কথার যোগান দেন যিনি, তিনিই চিন্তামণি। তা তেমন ভাগ্য আমার কি? কথার সঙ্গে আমার খেলা কানামাছির। চোখ আমার খোলা নেই, রুমাল দিয়ে বাঁধা। কানামাছি ভোঁ ভোঁ, যাকে পাবি তাকে ছোঁ। দৈবাৎ যদি হাতের কাছে কোনো কারোর পেয়ে গেলাম নাগাল তো ধরলুম খপ্ করে। তা শক্ত যারা, সমর্থ যারা, জোয়ান যারা, তারা কি আর ধরা পড়ে। সট্‌কে পড়ে। ধরা দেয় কোনটি, না যেটা পালাতে পারে না। কাজেই কথার বাজারে আমার কারবার ঝড়তি পড়তি মাল নিয়ে।

লেখাটা কারো দিব্যি আসে। কাগজে কলমে তাদের সম্পর্ক গাই-বাছুরের। কোনোক্রমে যোগসাজস করিয়ে দিতে পারলেই হল। কিন্তু আমার তো আর কলম ঠেলা নয়, খন্তা নিয়ে খেলা। কথা নয়, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে শাকআলু তোলা। একটি একটি কথা এমনিভাবে জোগাড় করে তা দিয়ে ইমারত গাঁথা আমার কাছে এভারেস্ট চড়ারই সামিল। তবে কেন লিখি? এ কথা যদি জিজ্ঞেস করেন তো বলব, যে কারণে মানুষ হিমালয়ে চড়ে।

কালাদার সঙ্গে প্রথম দেখা গড়ের মাঠে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের যে ধারটায় পি জি হাসপাতাল, সেই দিকটায় একটা ঝাঁকড়া গাছের নিচে।

তখন আমি বেকার। যুদ্ধ বেধেছে বটে, তবে খুব তোড়জোড় নয়। এক একটা কাজ ধরছি আর মাস তিনচার যেতে না যেতেই মুনিবের কাছ থেকে তালাক্ পাচ্ছি। অবস্থা খুবই সঙ্গীন। সারাদিন বিভিন্ন জায়গায় হাঁটাহাঁটি করেছি। সুবিধে করতে না পেরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের পেছন দিকটায় এক গাছ তলে গিয়ে বসলুম।

বসেছি কি না বসেছি, পেছন থেকে আওয়াজ হল, "নতুন দেখছি যেন।"

পেছন ফিরে চেয়ে দেখি কালাদা। (তখন জানতুম না, নামটা জানলুম প্রায় আধঘণ্টা পরে)। গাছতলে শুয়ে শুয়ে ছবি আঁকছেন। আঁকতে দেখে এগিয়ে গেলুম। পেন্সিল স্কেচ্। এক থুত্থুরি বুড়ি। পরণে তরুণীর পোষাক। এক হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, অন্য হাতে একটা কুকুরের চেন। একটা অ্যার্লাম দেওয়া টাইম-পিস্‌কে বেঁধে নিয়ে চলেছেন। ঘড়ির কাঁটা দুটো বারোটার ঘরে, জোরসে অ্যালার্ম বাজছে।

জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন?"

হাসব না কাঁদব?

"একেবারে হাঁ হয়ে গেলে যে, তুমিই বললুম, বয়েসে তো ছোটই হবে মনে হচ্ছে। আর না হলেই বা কি, মনের বয়েসে আমার সমান পৃথিবীতে এখন আছেন মাত্তর একজন, চার্লি চ্যাপলিন। আর সব বিলকুল পেছিয়ে আছে কয়েক শতাব্দী। আমার নাম কালাদা।"

পাশে ধপ্ করে বসে পড়লুম। ব্বাপস্, একেবারে আস্ত এক মহাপুরুষের খপ্পরে এসে পড়লুম দেখছি।

বিনীতভাবে বললুম, "আজ্ঞে ছবিটা একটু যদি বুঝিয়ে বলেন?"

কৃপা করে হাসলেন। তারপর খসখস করে ছবিটার নিচে লিখে দিলেন "বঙ্গদেশ"। তারপর আমার দিকে ফিরে মুখটি বন্ধ রেখে চোখ টিপুনী দিলেন, অর্থাৎ বুঝলে?

বুঝলুম বাংলাদেশের বারোটা বেজেছে।

বললেন, "প্রফেসি। এটা স্কেচ্। রং দিয়ে বড় করে আঁকব। বাঁ দিকে ছাই রঙ, ডান দিকে সবুজ। বাঁ দিকে ফাঁকিস্থান, ডানদিকে পাকিস্থান। শুধু দুটো রঙ, সবুজ আর ছেয়ে। বাংলাদেশের এমন রূপ কল্পনা কে করেছে। করতে পেরেছে কেউ? যত বোগাস কবিতায় মগজ ভর্তি হয়েছে ছেলেদের। মুখে মা মা, কিন্তু কবিরা যে ছবি ফুটিয়েছেন, তাতে মা হবার বয়েস যে বাংলাদেশের হয়েছে, তাতো মালুম হয় না। কল্পনা চক্ষে চেয়ে দেখ, দেখবে এক তরুণী। কিন্তু ব্যাটারা বাইরের পোষাক দেখেই ধেই ধেই করে নাচ্ছিস কেন? ভেতরে যে এক থুত্থুড়ি বুড়ি সে খেয়াল আছে? দিস্ ইস্ দি কারেক্ট কন্‌সেপ্‌সন।"

আজ এই তের বছর বাদে মনে পড়ছে, কালাদার প্রফেসি ফলেছে। বাংলা দেশের বারোটা বেজেছে সত্যিই।

সেইদিনই কালাদার সঙ্গে ভাব হয়ে গেল।

কালাদা ছবিটা দেখিয়ে বললেন, "কেমন!"

বললুম, "খাসা।"

বললেন, "রং দিলে দাম হবে হাজার টাকা কমসে কম। তবে তুমি যদি লাইক্ কর, তোমাকে প্রায় ফোকট্‌সে দিতে পারি। ক্যাস পাঁচ টাকা। দাও এক্ষুণি।"

বললুম, "টাকা পাব কোথায়?"

কালাদা খচে গেলেন।

বললেন, "তার মানে! দর দাম করে পিছিয়ে পড়ছ যে বড়।"

"সে কী! আমি আবার দর করলুম কোথায়?"

কালাদা বললেন, "না করলেও করা উচিত ছিল, ছবিটা এমন কিছু ফ্যালনা নয়। যাকগে যাক, পাঁচটা টাকা দাও তো লোন।"

বিনীত হয়ে বললুম, "আজ্ঞে, পকেট একদম গড়ের মাঠ।"

কালাদা সেকথা শুনে মুখ ফিরিয়ে বসলেন। যেন আমাকে চেনেনই না।

কালাদার সঙ্গে যতই ঘনিষ্ঠ হয়েছি ততই অবাক হয়েছি। হেন বিষয় নেই যা কালাদার অজানা। 'চারশ-বিশে'র কারবার থেকে শুরু করে আর আপেক্ষিক তত্ত্বের রহস্য সমাধানে কালাদার দক্ষতা সমান। বিস্তর পড়াশুনা করেছেন সন্দেহ নেই।

কত বলেছি, "কালাদা লিখুন।"

কালাদা হাসেন। বলেন, "লেখা হচ্ছে ভাব প্রকাশের উইকেস্ট মিডিয়াম। ইম্‌ম্যাচিয়ররা ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, করুক। আমার রাস্তা আলাদা।"

বললুম, "কালাদা, আপনি কি কখনো কিছু লেখেননি?"

কালাদা চুপ করে থাকলেন। একটু যেন উদাস হয়ে গেলেন।

বললেন, "মাত্র একবার।"

চুপ করলেন।

একটু পরে বললেন, "একবার একটা প্রেমপত্র লিখেছিলুম।"

আবার চুপ।

"একটা মেয়েকে ভালবেসেছিলুম। রোজই দেখি। কিন্তু ভাব জমাতে আর পারিনে। এক বন্ধুর কাছে পরামর্শ চাইলুম। তার আবার এসব বিষয়ে খুব 'ন্যাক'। সে বললে, চিঠি দে। চিঠি! অন্ প্রিন্সিপ্‌ল্ কিছু লিখব না, প্রতিজ্ঞা করেছি যে। কিন্তু ভাই রে, প্রেমে কি প্রিন্সিপ্‌ল্ টেকে। তাই ঘষে মেজে সাতদিনের চেষ্টায় একপৃষ্ঠা খাড়া করলুম। দূর দূর। অক্ষরের গভীরত্ব আনবার ক্ষমতাই নেই। কেমন জলোজলো। বন্ধুকে দেখালুম। বললে, বেড়ে দে,

পাঠিয়ে। দিলুম পাঠিয়ে, কিন্তু ওদিক থেকে কোনো সাড়া নেই। বন্ধু বললে, দে একখানা রিমাইণ্ডার। আবার লিখব? আগের চিঠিখানার একখানা কার্বন কপি করে রেখেছিলুম। তাই 'ট্রু কপি' বলে দিলুম ছেড়ে। তারপর যা থাকে বরাতে। মেয়েটি থাকত একটি হোমের মহিলা বিভাগে, আর আমি ছিলুম ওরই পুরুষ বিভাগের সেক্রেটারী। পরদিন মুনিব ডাকলে। ঘরে ঢুকে দেখি সেই মেয়েটি আর সেই আমার চিঠির ট্রু কপি।"

কালাদা থামলেন। তারপর চুপ মেরে গেলেন। ক্লাইম্যাক্সে পেঁছে এমন নিশ্চুপ! আমি তো দম আটকে মরি। কৌতূহল মনের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে। চুপ করে থাকি সাধ্য কি?

জিজ্ঞেস করলুম, "তারপর"।

কালাদা খিঁচিয়ে উঠলেন, একেবারে তুমি থেকে তুইতে, বললেন, "দেখে বুঝতে পারিস নে? এ আবার জিজ্ঞেস করতে হয়?"

কিছুই বুঝলুম না। শুধু দেখলুম কালাদা কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসে আঁকতে শুরু করে দিলেন। বিরাট এক উট (উটের মুখটা মেয়ে-মানুষের) ছোট্ট এক ঘরে ঢুকে পড়েছে। আর ঘরের মালিক বাইরে ছিটকে পড়েছে।

ছবিটি দেখিয়ে বললেন, "বুঝলি"?

মাথা নাড়লুম। কালাদা করুণার হাসি হাসলেন। তারপর খসখস তলায় লিখলেন "বিবাহের পর"।

লেখার এরকম ট্র্যাজেডি দেখে লেখার পরে শ্রদ্ধা থাকে কি না, আপনারাই বলুন?

॥ চার ॥

সম্প্রতি বড় মুস্কিলে পড়ে গেছি, একটা বিড়াল ছানাকে নিয়ে। সুন্দর ছানাটা। এক গা ভর্তি লোম, তুলতুল করছে। রাতদিন মিঁউ মিঁউ করে ঘুরছে। কিন্তু আমি বিড়াল দিয়ে কি করব? দৈবক্রমে ঘাড়ে এসে চেপেছে। ফেলেও দিতে পারিনে। অথচ অতটুকু বাচ্চাটার লালন পালন করা আমার অসাধ্য। এখন ভাবছি, নন্দুর সঙ্গে না গেলেই পারতুম ওর বাড়িতে। কিন্তু হঠাৎ অনেকদিন পরে দেখা, অনুরোধটা চট করে এড়াতেও পারলুম না। আর তার ফলেই—

অথচ এই বিড়ালের জন্য নন্দুর জীবনে কি বিপর্যয় ঘটেছিল তার ইতিহাস আমি তো জানতুম।

কিছুটা চাক্ষুষ দেখেছিলুম, আর কিছুটা শুনেছিলুম ওর মুখ থেকে। আমি আর নন্দু এক ভাড়াটে বাড়ির বাসিন্দা ছিলুম কিছুদিন।

নন্দুর সঙ্গে পরিচয় আমার ইস্কুল থেকে। তবে তখন মুখ চেনাচেনি ছিল মাত্র। ঘনিষ্ঠতা কিছু ছিল না। ও বোধ হয় আমার ক্লাশ দুয়েক নীচে পড়ত। তবে অজস্র ছেলের মধ্যে নন্দুকে মনে রাখবার একটা কারণ ছিল। সেই ছোট বয়েসেই ও নানারকম ম্যাজিক শিখেছিল। 'প্রাইজে'র সময় বছর বছর সেগুলো দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিত। সেইজন্যই নন্দু বিশেষ করে আমার মনে রেখাপাত করেছিল। আমি ওকে ভুলতে পারিনি।

তাই আমিই প্রথমে ওকে চিনলুম, যেদিন প্রথম ও আমি যে বাসায় থাকতুম, সেই বাসারই ভাড়াটে হয়ে এল।

আমাদের বাসাটা অদ্ভুত ধরনের। দোতলা বাড়ি, উপরে টালি-ছাওয়া। দোতলার ঘরগুলোর দেওয়াল ইঁটের নয়, টিনের। একটা লম্বা সিড়িঙ্গে কাঠের সিঁড়ি উঠোন থেকে উপরে উঠেছে। নামতে গেলে মনে হয় বুঝি হুমড়ি খেয়ে পড়লুম। আমার ছিল দুখানা ঘর—একখানা উপরতলে আর একখানা নীচের তলে। পাশের ঘর খালি হল। নতুন ভাড়াটে এল। দেখি নন্দু।

ও আমাকে চিনতে পারেনি। আমিই এগিয়ে গেলুম।

বললুম, "চিনতে পারেন?"

একবার আমার দিকে চাইলে। বুঝলুম, চিনতে না পেরে লজ্জায় পড়েছে। তখন আমিই পরিচয় দিলুম। নন্দু স্বস্তি পেয়ে হাসল।

বললে, "ভালই হল। পরিচিত লোক পেলুম।" তারপর সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা এ বাড়িতে ছেলেপুলের উৎপাত কেমন?"

জবাব দিলুম, "না তেমন বিশেষ কি? কেন?"

নন্দু প্রসঙ্গটা চেপে গেল বলে মনে হল।

তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "না এমনি।"

এ বাড়িতে লোকের ঝামেলা বিশেষ নেই। আমার তো ওসবের বালাই নেই। নন্দুরও দেখলুম, স্ত্রীই শুধু।

পাশাপাশি বাস করলেও নন্দুর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বিশেষ একটা হত না। ওরা স্বামী-স্ত্রী একটু অদ্ভুত প্রকৃতির। কারো সঙ্গে বিশেষ একটা মেলামেশাও করতে চাইত না।

একদিন বাড়ি ফিরে দেখি, বাড়িওলার সঙ্গে নন্দুর তুমুল ঝগড়া বেধে গেছে। বাড়িওলার বয়স হয়েছে। তবে ঝগড়াঝাটি তো এযাবৎ কারো সঙ্গে করতে শুনিনি। আমার তো অনেকগুলো দিন কাটল এ বাড়িতে। কিন্তু বাড়িওলার সঙ্গে অসদ্ভাব হয়নি কখনো। আর নন্দুর এক মাসও হয়নি, এর মধ্যেই বেধে গেল!

ওদের স্বামী-স্ত্রীকে বাড়ির কেউই পছন্দ করত না। কেমন যেন একটা রহস্য ওদের ঘিরে থাকত। বউটা কাজকর্ম করত নিঃশব্দে। অধিকাংশ সময়ে ঘরের মধ্যেই থাকত। আর ওদের চলাফেরায় কিসের যেন একটা সাবধানতা, কিসের শঙ্কা, একটুবা আতঙ্কও মিশে থাকত। ওরা যেন আলোকের নয়, ছায়াঘেরা জগতের বাসিন্দা। ওদের ব্যাপারটা ঠিক বুঝতুম না।

বাড়িওলা আমাকে দেখে বললেন, "এই তো মশাই, আপনিও তো ভাড়া আছেন আমার বাড়িতে, পুরানো লোক, বলুন, আপনিই বলুন, এটা কি রকম কথা। মেয়ে এসেছে শ্বশুরবাড়ি থেকে, ভাসুর-পোকে সঙ্গে এনেছে। তা আব্দারটা শুনুন, বলে কি, বাড়িতে ছেলে থাকবে কেন?"

নন্দু গজ্ গজ্ করে বললে, "আপনিই তো বলেছিলেন বাড়িতে ছেলেপুলে নেই। আর সেইজন্যই তো মশাই, এই বাড়ির ভাড়া এত বেশী দিয়েও এলুম।"

বাড়িওলা বললে, "মিথ্যে তো বলিনি। যদি এখন আত্ম-কুটুম্বর মধ্যে

কেউ এসে পড়ে, তাবলে, তাকে কি থাকতে দেব না?"

আমি আর কি বলব। নন্দুর আচরণে বিস্মিত হলুম। মনে পড়ল, এ বাড়িতে পা দিয়েই নন্দু ছেলেপুলের কথা জিজ্ঞেস করেছিল। কেন, ওরা কি ছেলেপুলে পছন্দ করে না? এ তো বড় অদ্ভুত দেখি।

বাড়ির মেয়েরা নন্দুর চাইতেও ওর স্ত্রীকে বেশী দোষ দেয়। বলে ওর বউ নাকি কাউকে পছন্দ করে না। অত্যন্ত নাকি অসভ্য। ওরা একবার দল বেঁধে আলাপ করতে গিয়েছিল। নন্দুর স্ত্রী বিশেষ আমল দেননি। তারপর থেকে ওরা এ বাড়ির সকলের বিষ-নজরে পড়ে গেছে। অনেক কথা এরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে। কিছু কিছু আমার কানেও আসে। সত্যি-মিথ্যে জানিনে, মেয়েরা বলত নন্দুর স্ত্রীতে আর নন্দুতে নাকি সদ্ভাব নেই। ওরা এক বিছানায় শোয় না পর্যন্ত। একটা মাত্র জীবকে নন্দুর স্ত্রী ভালবাসে। আর সেটা হচ্ছে একটা কাবুলী বিড়াল। মিনি বিড়াল। বিড়াল বিড়াল করে নন্দুর স্ত্রী নাকি একেবারে অস্থির। তাকে নাওয়াচ্ছে, খাওয়াচ্ছে, পোষাক-পরিচ্ছদ পরাচ্ছে। ঘর-সংসারের কাজ যেটুকু না করলে নয়, সেটুকু নমো-নমো করে সেরে নন্দুর স্ত্রী বিড়ালের তদ্বিরে লেগে যান। আর বিড়ালেরই বা কি ভাগ্যি! আলাদা গেলাস বাটি, তোষক বালিশ।

এ খবরের বেশির ভাগই ক্ষ্যান্তমাসির আনা।

হাত-মুখ ঘুরিয়ে ক্ষ্যান্তমাসি বলেন, "মা গো মা কি আদিখ্যেতা, সেদিন দরজার ফাঁক দিয়ে দেখি, বিড়ালকে কোলে তুলে ঝিনুক দিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছে। মরে যাই সোহাগ দেখে!"

তবে শোনা কথায়, বিশেষ করে মেয়েদের কথায় গুরুত্ব দিতে নেই। কাজেই ও ব্যাপারে কান দিইনি। কিন্তু দিন কতক পরে এমন একটা ঘটনা ঘটল, যাতে বুঝে নিলুম নন্দুর স্ত্রী বিড়ালবাতিকগ্রস্তা। সেদিন হয়েছে কি, সন্ধ্যের পর ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজে বসে আছি। ভাবছি। পায়ে সুড়সুড়ি লাগল। চেয়ে দেখি হৃষ্টপুষ্ট একটি বিড়াল আমার পায়ে গা ঘষছে। বেশ সুন্দর বিড়ালটি তো। কোলে তুলে নিলুম। আমার কোলে বসে ঘর্‌র্ ঘরর্ আওয়াজ তুলতে লাগল। আমিও আদর করে ওর গলায় হাত বুলাতে লাগলুম। একটু পরেই ঘরে নন্দুর স্ত্রী এসে হাজির। কখনো কারো ঘরে তো ওঁকে যেতে দেখি না। একটু সন্ত্রস্ত হলুম।

ঢুকেই বললেন, "আমার মিনিকে আটকে রেখেছেন কেন?"

আর বললেনও বেশ ধমক দিয়ে। আমি তো অবাক। অপরিচিত বয়স্ক এক লোককে কেউ নাকি এভাবে ধমক দিতে পারে।

থতমত খেয়ে বললুম, "আমি তো আটকাইনি। এইমাত্র তো এল।"

তিনি গরম হয়ে বললেন, "এইমাত্র নয়, পঁচিশ মিনিট আগে এসেছে। এতক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন মিনি বেরুচ্ছে না দেখলুম, মতলবটা তখনই ধরে ফেলেছি।"

বলেই, বিড়ালটাকে প্রায় ছিনিয়েই নিয়ে গেলেন। অপরিচিতা কোনও মহিলার কাছ থেকে এ ধরনের ব্যবহার আমার প্রত্যাশিত ছিল না। ও'র বলার ধরনটাও অপমানজনক। কি আর করি, দুঃখিত মনে বসে থাকলুম।

অনেক রাত্রে নন্দু ফিরল। হঠাৎ কিছুক্ষণ পরেই দেখি স্বামী-স্ত্রীতে চাপাস্বরে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়ে গেছে। দু'ঘরের মধ্যে ব্যবধান শুধু একটা পাতলা দেয়ালের।

নন্দুদের সব কথা বোঝা যাচ্ছিল না। হঠাৎ নন্দুর স্ত্রীর কথা শুনতে পেলুম।

"মতলবটা বুঝতে আর বাকী নেই। নিজে পারলে না, এখন এই ভদ্দরলোকটাকে দোসর করেছ। আমি বেঁচে থাকতে আমার মিনিকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। ও সকলের চক্ষুশূল। কিন্তু কেন? কি ক্ষতি ও কার করছে?"

বলতে বলতে নন্দুর স্ত্রী ফোঁপাতে লাগলেন।

নন্দু বললে, "তোমাকে কোথায় নিয়ে রাখব, ভেবে পাইনে। আর কবে যে তোমার হাত থেকে রেহাই পাব তা-ও জানিনে। যেখানে যাব, সেখানেই গোলমাল বাধাবে?"

সকাল হতে না হতেই নন্দু এল আমার ঘরে।

ম্লান কণ্ঠে বললে, "দাদা, আমার স্ত্রীর হয়ে ক্ষমা চাইতে এসেছি।"

বিব্রত হয়ে পড়লুম। ছিঃ ছিঃ, সে কি কথা। আমি তো কিছু মনে করিনি।

নন্দু সেদিন অনেকক্ষণ কাটিয়ে গেল। অনেক কথা বলে গেল ওর বিবাহিত জীবনের। ওর স্ত্রী যে বাতিকগ্রস্তা সে কথা ও'কে দেখে গতকালই আমার মনে হয়েছিল।

নন্দু যা বললে তার সার হচ্ছে, ওর স্ত্রী পাগল। নন্দুর জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। বিড়ালটা ওর বাপের বাড়ির। ওর স্ত্রী বিড়াল অন্ত প্রাণ। অথচ নন্দু বিড়াল তো দূরের কথা, বিড়ালের রোঁয়াটাও সহ্য করতে পারে না। অত্যন্ত অশুচি বলে মনে হয়। বিড়ালের উপর নন্দুর

বিদ্বেষ আরো এইজন্যে যে, বিড়ালটা ওর স্ত্রীকে দখল করে রেখেছে। আজ ছ' বছর ওদের বিয়ে হয়েছে। ফুলশয্যার রাত ছাড়া ওরা আর কখনো এক বিছানায় শোয়নি। কারণ ওর স্ত্রী বিড়ালটা ছাড়তে পারেননি, বিড়ালকোলে শোয়া তাঁর ছেলেবেলার অভ্যাস। আর নন্দুরও সেই বাল্যকাল থেকেই বিড়ালের উপর বিতৃষ্ণা। বিড়াল ছুঁলেই ওর গা পাক দিয়ে ওঠে। নন্দু ওর স্ত্রীকে বিড়াল ছাড়াবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু তার ফলে হিত অপেক্ষা অহিতই বেশী হয়েছে। নন্দুর স্ত্রী বিড়ালকে আরো আঁকড়ে ধরেছেন। পৃথিবীশুদ্ধ লোক ওঁর কাছ থেকে বিড়ালটা ছিনিয়ে মেরে ফেলার জন্য ওঁর স্বামীর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, এ বিশ্বাস ওঁর মনে বদ্ধমূল হয়েছে। ফলে জগতের প্রতি ওঁরও একটা অবিশ্বাস, বিদ্বেষ জন্মেছে। নন্দু স্ত্রীর জন্য বাপ মা ভাই বোন সবাইকে ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। কোনো বাসায় ওরা টিঁকতে পারে না। ওঁর স্ত্রীর বিড়ালকে নিয়ে এমন এক-একটা কাণ্ড বেধে ওঠে, যে ওরা সে

—বলতে বলতে নন্দু থেমে গেল।

তারপর যেন আপন মনেই বললে, "কতদিন মনে হয়েছে, ওকে ত্যাগ করি। ওর হাত থেকে রেহাই পাই। কিন্তু কি জানেন দাদা, পারিনে। ও যে বড় অসহায়। ছেলেপুলে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। কারো সঙ্গে মিশতে পারে না। কি অসহায় জীবন বলুন তো? আমিও যদি বিমুখ হই, তবে আর ওর আশ্রয় কোথায়?"

লোকটিকে বড় আশ্চর্য লাগল। ভাল লাগল।

নন্দু বললে, "ছোট ছোট ছেলেরা যে বাড়িতে আছে, সে বাসায় আর আমরা যাইনে। ছোটরা অবোধ, বোঝালে বোঝে না, ওর বিড়াল নিতে যায়। আর ওর পাগলামীও বেড়ে ওঠে। মার-ধোর করে। একবার বছর দুয়েকের এক মেয়েকে গলা টিপে প্রায় মেরেই ফেলেছিল। কেননা, সেই অবোধ শিশুটি ওর বিড়ালের পা ছেঁচে দিয়েছিল। তাই, যে বাসায় ছোট ছোট বাচ্চা আছে, সেখানে থাকিনে। এই যে বাড়িওলার মেয়ের ভাসুর-পো এসেছে। আমার মন বলছে একটা কাণ্ড ঘটবে। ভয়ে ভয়ে আছি দাদা।"

বললুম, "তুমিও পাগল হবে দেখছি। কবে একটা কি ঘটেছিল, তাই আঁচলে গিঁট বেঁধে রেখেছ। দুর্ঘটনা কি বারে বারে ঘটে?"

নন্দু উঠল। খুব সান্ত্বনা পেল বলে মনে হল না।

বাড়িওলার মেয়ের ভাসুর-পো—ছেলেটি বড় দুর্দান্ত। নাম সন্তু। বছর ছয়েক বয়স হবে। রাতদিন ছটফট করে বেড়াচ্ছে। নন্দুর ভয় ছিল ওকে নিয়ে। আর সে ভয়ই শেষ পর্যন্ত সত্য হয়ে দাঁড়াল। নন্দুর

সঙ্গে আমার যেদিন কথাবার্তা হয় তার দুদিন পরে, বিকালের দিকে বেরুচ্ছি, এমন সময় বিড়ালের মিঁউ মিঁউ, নন্দুর স্ত্রীর ধমকানি আর সন্তুর চীৎকার শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। দেখি সন্তু মিনিকে কোলে নিয়ে সিঁড়ির দিকে প্রাণপণে দৌড়ুচ্ছে আর নন্দুর স্ত্রী তাকে বেগে তাড়া করেছে। সন্তু সিঁড়িতে পা দিয়েই টলে পড়ে গেল। তারপরের দৃশ্য আর কখনো ভুলব না।

দেখলুম, সন্তু আর বিড়ালছানাটি গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে, একটার পর একটা ধাপ পড়ছে আর একটু একটু করে গা ফেটে ফেটে রক্ত বেরুতে লেগেছে। প্রথমে বিড়ালছানাটি পড়ল আর তার উপরে পড়ল সন্তু। ক্যাঁক করে শব্দ হল, রক্তে উঠোন ভেসে গেল। আরো কিছু অর্থহীন গোলমাল, কান্নাকাটিতে উঠোন ভরে উঠল।

কখন কিভাবে নীচে নেমে এসেছি, বাড়িওলা আর আমি ট্যাক্সি ডেকে সন্তুকে নিয়ে নীলরতন হাসপাতালে গেছি স্পষ্টভাবে কিছু মনে নেই, কিন্তু আশ্চর্য উজ্জ্বল হয়ে আছে নন্দুর স্ত্রীর সেদিনের মূর্তিটা। সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আছেন। সমস্ত শরীর যেন প্রস্তরীভূত। মুখ চোখ ভাবলেশহীন। শুধু জল গড়িয়ে পড়ছে গালের দুপাশ দিয়ে। সে মুখটা কখনো ভুলতে পারিনি।

হাসপাতালে নন্দু এল হাঁফাতে হাঁফাতে। সন্তুকে তখন ওয়ার্ডে নিয়ে গেছে। নন্দুর মুখ চোখের রক্ত কে যেন শুষে নিয়েছে।

আর্তনাদ করল যেন, "কেমন আছে সন্তু?"

বাড়িওলা কিছু বললেন না।

আমি বললুম, "যত খারাপ ভেবেছিলুম, তত নয়। ডান হাতটা ভেঙেছে। তবে ভয় নেই।"

বাড়িওলা বললেন, "নন্দুবাবু"—

নন্দু ম্লান হেসে বললে, "আর বলতে হবে না। দুদিন সময় দিন। একটা বাসা খুঁজে নিতে হবে তো?"

আমার দিকে চেয়ে বললে, "বিড়ালটাও মারা গেছে দাদা। একেবারে চেপ্টে গেছল কি না? কিন্তু আশ্চর্য, ও কাঁদছে কিন্তু সন্তুর জন্য। থাকলে না, নিয়ে এসেছি। ওই যে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। একবার সন্তুকে দেখতে চায়। পারবে না?"

বন্দোবস্ত করে দেখান হল। মানুষের মন কত বিচিত্র!

নন্দুর কাহিনী এখেনেই প্রায় শেষ। কিন্তু আমার কাহিনীর শুরু।

নন্দুর সঙেগ দেখা হল প্রায় নয় মাস পরে। নিউ মার্কেটে।

জিজ্ঞাসা করলুম, "কি নন্দু, এখানে কি?"

একটু লাজুক হেসে বললে, "বাচ্চা ধরবার তোয়ালে কিনতে এসেছি। মানে দু-একদিনের মধ্যে ও হাসপাতালে যাবে কি না।"

খুশী হলাম।

বললুম, "বেশ বেশ। তা এখন যাবে কোথায়?"

"বাড়িতে ফিরে গেছি। ওর বাতিকটা গেছে কি না।"

ঘুরে ঘুরে ওর জিনিস কিনে দিলুম। শুধু তোয়ালেই নয়, নন্দু টুকিটাকি আরও দু' একটা জিনিস কিনলে। দু'জনে বেরিয়ে আসছি এমন সময় একটা লোক ভারী সুন্দর দুটো বিড়াল বাচ্চা নিয়ে সামনে দাঁড়ালে।

বললে, "আচ্ছা কিটিন্ হ্যায় সাব।"

বললুম, "না বাবা, দরকার নেই।"

নন্দু দেখি লাফিয়ে উঠেছে।

"আরে বাঃ সুন্দর বাচ্চাটা তো। অবিকল মিনিটার মতো।"

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে, "বেশ খুশী হবে ও, কি বলেন। এ সময়ে ওকে একটু প্রফুল্ল রাখাও দরকার, ডাক্তার বলেছে।"

দর দাম করে নন্দু বাচ্চাটা কিনলে।

বললে, "চলুন না দাদা, কাজ নেই তো কিছু।"

কি মনে হল, বোধহয় ওর স্ত্রীর সেই মুখখানা ভুলতে পারিনি বলেই, রাজী হলুম।

বাড়ি পৌঁছেই নন্দু আমাকে বসতে দিয়ে ভেতরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ভেতরে একটা বিড়াল ক্যাঁক্ করে আর্তনাদ করে উঠল।

নন্দুর স্ত্রীর আওয়াজ শুনলুম, "তুমি কি, আবার একটা ছাই ভস্ম জুটিয়ে আনলে! বিদেয় কর, এক্ষুনি বিদেয় কর।"

নন্দু বিড়ালছানাটা আমাকে গছিয়ে দিয়ে বললে, "দাদা ওটা আপনি নিয়ে যান। ও রাখলে না। বললে, বিড়ালে না কি ডিপথিরিয়া ছড়ায়। ছেলেপুলের ঘর তো, বুঝলেন না?"

কিন্তু আমি বিড়াল দিয়ে কি করব? এইটুকু এক বাচ্চা, তাকে কি করে বাঁচাব? কি খাওয়াব? খুব মুস্কিলে পড়ে গেছি। আপনারা কেউ কি নেবেন? উদ্ধার করবেন আমাকে? ছানাটা বড় সুন্দর। সত্যি বলছি ঠকবেন না।

॥ পাঁচ ॥
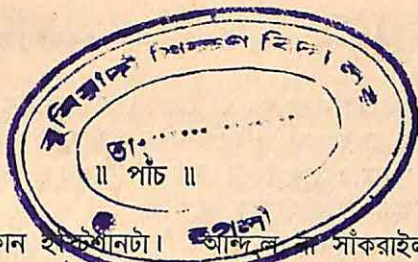
মনে পড়ে না ঠিক কোন ইস্টিশানটা। আন্দুল না সাঁকরাইল। তবে যে কোনও ইস্টিশানের প্ল্যাটফর্মের প্রান্তে যদি কখনো কোনোও একটা ঝাঁকড়া গাছ নজরে পড়ে, অমনি সেই গ্রাম্যবধূটির মুখ মনে ভেসে ওঠে। ভাদ্রের কোনো একটি দিনে এমনি এক ঝাঁকড়া গাছের নিচে বসে প্রচুর হাসি তামাসা করেছিলুম আমরা তিনজন। আমি, আমার এক বন্ধু আর সেই বধূটি—আমার বন্ধুর বৌদি।

মনে পড়ে প্রচুর হেসেছিলুম, হাসিয়েছিলুম। হাসলে কি অদ্ভুত সুন্দর হয়ে উঠত সেই ভদ্রমহিলার মুখ! কিন্তু সেইদিনই শেষ। তারপর থেকে তাঁর সঙ্গে আর কখনো দেখা হয়নি আমার। তবে বন্ধুর মুখে শুনেছি, সেইদিন থেকে তাঁর মুখে আর কখনো কেউ হাসি দেখেনি।

জানিনে, সারাজীবন ধরে তিনি আমায় অভিসম্পাত করেছেন কি না। তবে এ ছাড়া আর কোনো উপায় সেদিন তো মনে পড়েনি। স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ বয়ে নিয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু সেখানে দিতে পারিনি। তাঁকে সঙ্গে করে কলকাতায় এনেছিলুম। এই কয়েকটা ঘণ্টা আমাকে আর বন্ধুটিকে যে কি ভীষণ সংগ্রাম করতে হয়েছিল, সেই ঘটনাই বলি।

বন্ধুর খুড়তুত দাদা হঠাৎ মারা গেল।

ওর বাবা বললেন, "সুনুর দ্বারা হবে না তুমিও ওর সঙ্গে যাও বাবা। বৌমাকে খবরটা তো দিতে হবে। বারোটা সাড়ে বারোটায় ট্রেন আছে, তাতেই চলে যাও।"

গেলুম। প্রায় দুটো নাগাত পৌঁছালুম ইস্টিশানে।

বন্ধু বললে, "এখান থেকে মাইল চারেক রাস্তা। বাড়িতে কাকাও নেই, আছে বৌদি। কি নিদারুণ কাণ্ড হবে, বল দিদি? কি খবর বয়ে নিয়ে চলেছি, হা ঈশ্বর!"

মেঠো পথ দিয়ে চলেছি। প্যাচপেচে কাদায় পা পড়ে কি এক অস্বস্তি। জুতো উঠেছে হাতে। রাস্তার মধ্যে গর্ত হ'য়ে জল জমে জমে আছে। ভাদ্রের রৌদ্রে পা তেতে আগুন হয়ে আছে। পা পড়তেই ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে ছ্যাঁকা লাগছে। ঘামে সর্ব অঙ্গ ভিজে সপ্‌সপ্‌ করছে।

একে এই দৈহিক যন্ত্রণা, তার উপরে কেমন একখানা কাজের ভার! ভাবছি, কেন এলাম।

বন্ধুটি বেজায় নরম ধাতের লোক। শোকের ধাক্কায় মুষড়ে পড়েছে। ভাবিত হলুম, শেষকালে ও না অধীর হয়ে পড়ে।

বললে, "আমার মুখ দিয়ে ভাই বেরুবে না। খবরটা তুই বলে দিস্। বছরখানেক হল বিয়ে হয়েছে, বুঝলি, তার মধ্যেই এই। কি যে করবে বৌদি বুঝতে পারছিনে। আমার বিয়ের পর তো আর আমাকে দেখেনি। খালি দাদাকে দিয়ে আসতে বলে পাঠাত। সেই আসা এই এলাম। কিন্তু কোন্ মুখ নিয়ে বৌদির সামনে দাঁড়াব, বল তো? আমার দ্বারা হবে নারে, বুঝলি?"

কথাগুলো বলছে, আর বন্ধুর চোখ বেয়ে জল গড়াতে শুরু করেছে।

বললুম, "দ্যাখ, তুই যদি এমন ছেলেমানুষি করতে থাকিস্ তো সর্বনাশ হয়ে যাবে। খবরটা দেওয়া তো বড় কথা নয়, শক্ত কাজ হচ্ছে সান্ত্বনা দেওয়া। তা কোথায় তুই সান্ত্বনা দিবি, না নিজেই ভেঙে পড়ছিস।"

বন্ধু একটু সামলে উঠল।

বললে, "পরশুদিন যে লোক এই পথ দিয়ে ইস্টিশানে গিয়েছে, আজ তার মৃত্যুখবর নিয়ে চলেছি, অ্যাঁ, কি বল দিকি? পরশুদিন দাদা এসে বললে, বৌমাকে দেখবার জন্য তোর বৌদি অস্থির হয়ে পড়েছে। ফি শনিবার বাড়ি গেলেই বলে, কলকাতা নিয়ে চল। একেবারে অস্থির করে মারছে। তুই এই শনিবারে যা তোর বৌদিকে নিয়ে আয়। বাবাকে তো দিদি নিয়ে গেছে, দিন কতক থাকবে সেখানে।"

বাড়ির দিকে যতই এগুতে থাকে, বন্ধু ততই নার্ভাস হয়ে পড়ে। শেষকালে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বাদে যখন ওর দাদার বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছুলাম, তখন বন্ধুকে বলব কি, নিজেরই আর এগুতে ইচ্ছে করল না। আমি শুধু আমার কথাই ভাবছিলুম। জন্মে কখনো যার সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা ছিল না, আজ তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। অথচ কেমনতর অবস্থায়!

বেশীক্ষণ ইতস্ততঃ করা গেল না।

বললুম, "দ্যাখ, এখন বরঞ্চ খবরটা দিয়ে কাজ নেই। তোদের বাড়িতেই নিয়ে চল। সেখানেই যা হবার হবে।"

যেন ডুবতে ডুবতে মাটি পেল।

বন্ধু বললে, "যা বলেছিস। কলকাতায়ই নিয়ে যাই।"

বলে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু দরজায় ঘা দিতে আর ওর

হাত ওঠে না। প্রায় দশ পনর মিনিট দাঁড়িয়ে থাকলুম চুপচাপ। মনে হল দশ বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছি।

পাড়া গাঁ। কি হতশ্রী চেহারা! বন ঝোপ চারিদিক থেকে এগিয়ে এসে সরু সরু অজস্র আঙুল দিয়ে যেন লোকালয়ের টুঁটি টিপে ধরার ষড়যন্ত্র করছে। নির্জন নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হতে বসেছে। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘেরা ভেসে এসে সূর্যকে ঢেকে দিচ্ছে আবার ভেসে চলে যাচ্ছে। দূর থেকে ঘুঘুর একটানা ক্লান্তিকর ডাক ভেসে আসছে। ঘু ঘু ঘু......। আমরা দু'জন দাঁড়িয়ে আছি, এসেছি এক সীমন্তিনীর কাছে, বৈধব্যের পরোয়ানা নিয়ে। জীবনে এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখী হয়ে ক'জন দাঁড়িয়েছেন, জানিনে। শুধু আমার কথাই ভাবছিলুম। আমি এদের কে? কেন এলুম এই শোচনীয় ঘটনার সাক্ষ্য হতে? আমাদের মুখ দিয়ে একটামাত্র কথা, কয়েকটা মাত্র শব্দ বের হবে, সঙ্গে সঙ্গে এক কল্যাণীর ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে যাবে, সিঁথির সিঁদুর মুছে যাবে, এয়োতির সমস্ত চিহ্ন ঘুচে যাবে। আগে তো এত গুরুত্ব, এত গুরু দায়িত্বের কথা ভাবিনি।

বন্ধুকে বললুম, "দ্যাখ, এখানে যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পান। তাহলে আর বৌদিকে সামলানো যাবে না। যেন বৌদিকে নিয়ে যেতেই এসেছি, সেইভাবে চলাফেরা করবি।"

কড়া নাড়তেই দরজা খুলল। বৌদিই খুললেন। আমাদের দেখে তাঁর সমস্ত মুখে ক্ষণিকের জন্য বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল। তারপরই দেখলুম হাসি। মনে হল ও-মুখের জন্যই বুঝি হাসির সৃষ্টি হয়েছে। গোটা মুখটাই যেন একটা হাসির সরোবর। এতক্ষণ নিস্তরঙ্গ ছিল। খুশির ঢিল পড়ে তাতে তরঙ্গ উঠল, অজস্র তরঙ্গ।

"ওমা সুনু ঠাকুরপো, এসো এসো। আমি বলি—এই অসময়ে কে এল?"

প্রথমে আমাকে দেখতে পাননি বুঝি। হঠাৎ দেখেই ঘোমটা টেনে দিলেন।

বললুম, "বৌদি, আমি সুনুর বন্ধু।"

মুখে আবার হাসির ঢেউ উঠল বৌদির।

বললেন, "আসুন, আসুন। এই রোদের মধ্যে, ইস্।"

দেখি সুনুর ঠোঁট থরথর করে কাঁপতে লেগেছে। চোখেও জল আসে আসে।

ওর পিঠে এক গ্ঁতো মেরে তাড়াতাড়ি বললুম, "বৌদি, আপনাকে নিতে এসেছি, রেডি হয়ে নিন।"

বৌদির মুখে হাসি আবার চিক্ চিক্ করে উঠল।

বললেন, "সে দেখেই বুঝেছি। দাদার সঙ্গে কবে দেখা হল?"

সুনন্দ বললে, "পরশু।"

বৌদি এবারে খিল খিল করে হেসে ফেললেন, "দেখলে ঠাকুরপো, তোমার দাদা কেমন সুবোধ স্বামী। যাবার সময় বলে গেল আজই সুনন্দর সঙ্গে দেখা করব, আর তাই করলে।"

ফস্ করে বলে বসলুম, "বশ করার মন্ত্রটা ওর বৌকে একটু শিখিয়ে দেবেন তো।"

বৌদি বললেন, "একজনের মন্তর অন্যের কাজে লাগে না ভাই। এ বিলিতী তালার চাবী। নম্বরে নম্বরে মিল।"

কত সহজে এই হাসির মুখে তালা পড়ে যাবে তাই ভাবছি। যে নম্বরে সে তালা খুলত, তার চাবির হদিশ হয়ত জীবনভোর পাওয়াই যাবে না।

সুনন্দ কথাবার্তা বিশেষ বলছিল না। উত্তর প্রত্যুত্তরের পালা চলছিল আমাতে আর বৌদিতে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাসি তামাসার জালে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছিলুম, যার হাত এড়ান আমার সাধ্যের বাইরে।

গোছগাছ করে, বাড়ির ভার প্রতিবেশীর উপর চাপিয়ে এতখানি পথ হেঁটে ইস্টিশানে পেঁছাতেই দেরি হয়ে গেল। ট্রেন চলে গেছে। পরের গাড়ির দু' ঘণ্টা দেরী।

বৌদি যেন খুশির জোয়ারে ভাসছেন।

বললেন, "যাক না গাড়ি। আরও অনেক গাড়ি আছে। আঃ, কতদিন পরে আবার রেলে চড়ব। কি বলব, ঠাকুরপো, ওই বন্ধ গাঁয়ে আর থাকতে ভাল লাগে না। তোমার দাদাকে তো বলছি, ঠাকুরপোদের ওদিকে অল্পের মধ্যে একটা ছোট্ট বাসা দেখ, তা এত ভুলো, কি বলব, কিছু যদি মনে থাকে। এই দ্যাখ না, পান খায়, তা তার কৌটো ফেলে গেছে। নিয়ে এসেছি। হ্যাঁ ভাই, বাসা একটা ঠিক করে দিও তো, তোমাদের কাছাকাছি। থাকব দু' জায়ে।"

সুনন্দ আর পারলে না। "ডাব খাবে বৌদি? নিয়ে আসি।" বলেই সরে পড়ল। বৌদি হাসতে লাগলেন।

বললেন, "বিয়ে করে ঠাকুরপো কনে-বউ হয়ে গেছে, কি বলেন?"

বৌদির সঙ্গে ঘর-সংসারের কথায় মাতলুম। কলকাতায় একটা বাসা করা তাঁর স্বপ্ন-সাধ।

"দেড়খানা ঘর হলেই আমাদের চলে যাবে, বুঝলেন। বাবা আর আমরা দু'জন। ঝামেলা তো নেই, কি বলেন, চলে যাবে না?"

বললুম, "খুব যাবে।"

বৌদি বললেন, "আচ্ছা বলুন তো, দেড়শ টাকায় কুলিয়ে যাবে না? হয়ত দুধে ভাতে যাবে না, কিন্তু কষ্ট করে চলবে তো?"

বললুম, "তা চলবে।"

"তবে ঠাকুরপো," বৌদি গলায় মিনতি ঢেলে বললেন, "আপনাকেও অনুরোধ করছি ভাই, একটা বাসা ঠিক করে দিতে হবে।"

(সুনু এত দেরি করছে কেন? নিজেও বুঝতে পারছি, আর বেশীক্ষণ চালাতে পারব না। গলার কাছটায় কেমন যেন এক অনুভব হচ্ছে।)

বৌদি বললেন, "আপনার দাদা বলেন, তুমি এত তাড়াহুড়ো কর কেন? বুঝুন কথা। ওঁর আবার একটু ভালমন্দ খাবার অব্যেস। নিজেই কিন্তু এদিকে বলেন, মেসে খেয়ে খেয়ে আর পারিনে। অম্বল হয়। হজম হয় না। তারপর কি জানেন, মেসে হোটেলে বারোয়ারী ব্যাপার তো। ঢাকা ঢুকি দেবার বালাই নেই। বিড়ালে মুখ দেয় কি মাছি পড়ে কে জানে? কে তা দেখে বলুন? কলকাতায় তো কলেরা বসন্ত লেগেই আছে। অসাবধানে থাকলে, একটা কিছু হতে কতক্ষণ? তাই বড় ভয়ে ভয়ে থাকি ভাই।"

(সুনুর হ'ল কি? আর কত দেরি করবে?)

বললুম, "একটু বসুন বৌদি, আমি দেখি, সুনু গেল কোথায়?" ওভারব্রিজের আড়ালে বসে আছে সুনু। দু'হাতে চোখ মুছছে।

ওর কাঁধে হাত রাখতেই সুনু বললে, "ওরে, আর তো পারিনে। আর কিছুক্ষণ থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব।"

ওকে সান্ত্বনা আর দেব কি? চুপ করে রইলুম। আর কতক্ষণ এই অভিনয় চালাতে হবে? বন্ধু মহলে তুখোড় বলে আমার কিঞ্চিৎ প্রসিদ্ধি আছে। আমার স্নায়ু নাকি খুব টনকো। কিন্তু তাও তো বিকল হবার যোগাড় হল।

গল্পে গল্পে বাকী পথটুকু তবুও কাটাতে হল। হাসি তামাসায় পথ শেষ হল। বাড়ির কাছে এসে সুনু আর পারলে না, জোর পায়ে বাসার দিকে চলতে লাগল।

বৌদি হাসতে লাগলেন, "ঠাকুরপো দেখি আপনার দাদাকেও

ছাড়িয়ে গেল। আপনার দাদা তো পাড়ায় ঢুকে চেঁচাতে চেঁচাতে আসেন। লোকে তাই ভাবে, কিন্তু আসল কথা, আমাকে খবর দেওয়া।"

বৌদি খিল খিল করে হেসে উঠলেন। কিন্তু এবার আর হাসির তরঙ্গ সমস্ত মুখে ছড়িয়ে পড়তে পারল না।

সুনু দরজার কাছে গিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

চেঁচিয়ে ডাক দিলে, "মা, বৌদিকে নিয়ে এসেছি।"

ভেতর থেকে কাঁদতে কাঁদতে সুনুর মা বেরিয়ে এসে ডুকরে উঠলেন, "ওরে বৌ, ও হতভাগী, কি দেখতে এলি?"

বৌদি হতভম্ব। দেখলুম সারা মুখে যে হাসির আল্পনা ছিল, তা কে মুছে নিয়েছে। সমস্ত মুখ বিস্ময়, ভয়, আশঙ্কা, আতঙ্কে ভরে উঠল। ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপতে লাগল। শুধু দু'টি চোখে আকুল জিজ্ঞাসা ফুটে উঠল।

অতিকষ্টে বৌদি জিজ্ঞেস করলেন, "কি ব্যাপার, কি হয়েছে, ঠাকুরপো?"

আমি পালিয়ে গেলুম।

দূর থেকে শুনলুম বৌদির গলা। অতর্কিতে ডুব জলে পড়ে গেলে যেমনভাবে চেঁচিয়ে ওঠে, বৌদি তেমনি এক চিৎকার দিয়ে উঠলেন।

"ও জ্যেঠিমা, একী! কি ব্যাপার! বলুন, বলুন, আমার কি সর্বনাশ হয়ে গেছে? কপাল পুড়েছে? অ্যাঁ! ঠাকুরপো, ও ঠাকুরপো, বল, বল।"

সুনুর মার চিৎকারও শুনলুম, "ওরে ধর, বৌ যে পড়ে গেল।"

কিন্তু না, আর না।

॥ ছয় ॥

কখনো যখন কোনো শীতের রাত্রে কলকাতায় ঘন কুয়াশা নামে, উত্তরের হাওয়া বইতে সুরু করে বেগে, পুরু আবরণ ভেদ করে দৃষ্টি চলতে অসমর্থ হয়, আর কোনো যোগাযোগে যদি কনভেণ্ট রোডের পুলটায় গিয়ে পৌঁছোই, ঢালু দিয়ে একপা একপা নামতে থাকি, আমার মনে পড়ে যায় তিনধরিয়ার কথা। মনে পড়ে, সেই প্রৌঢ় শেরপাটির কথা। রেলের লণ্ঠনটি হাতে নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে কুলি লাইন থেকে আমাকে রেল হাসপাতালের কম্পাউণ্ডারের বাসায় পৌঁছে দিচ্ছে। ছবিটা এতদিন বাদেও আমার চোখে উজ্জ্বল হয়ে ভাসে। ডিসেম্বরের তিনধরিয়া কলকাতার কনভেণ্ট রোড নয়। অনেক বেশী হিংস্র। বাতাস সেখানে হাঙগরের দাঁত।

আমি তখন রেল মজদুর সঙ্ঘের কর্মী। দার্জিলিং হিমালয় শাখাকে সংগঠন করতে কর্তারা পাঠিয়েছেন। কয়েক দিন পরেই কলকাতা থেকে লেবার কমিশনার আসবেন, দার্জিলিং-এর রেল মজুরদের অবস্থা সরেজমিনে তদন্ত করতে। মালিকদের তরফ থেকে চেষ্টা হচ্ছে আসল ছবি লুকিয়ে রাখবার। সে চেষ্টা ব্যর্থ করতে হবে, তা-ই আমার দায়িত্ব। প্রতিটি মজুরের ঘরে গিয়ে তথ্য জোগাড় করেছিলুম প্রায় তিন মাস পরিশ্রম করে। আর এ কাজে সাহায্য করেছিলেন দার্জিলিং-হিমালয় রেলপথের অনেক নেপালী ভুটিয়া বেহারী বাঙগালী কর্মী। কাঞ্চা শেরপা সব থেকে বেশী। (নাম কাঞ্চাই হবে বোধ হয়।)

লোক যে কত গরীব হতে পারে, তিনধরিয়ায় এসে বুঝলুম। শুধু কি তিনধরিয়া। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং। সর্বত্র।

রেল কম্পাউণ্ডার ইউনিয়নের একজন মাতব্বর।

বললেন, "কাঞ্চাকে দিচ্ছি। ও সঙেগ থাকলে কাজ সোজা হবে।"

সেই থেকে কাঞ্চার সঙেগ তিন মাস ঘুরেছিলুম। মিতবাক, পরিশ্রমী এই প্রৌঢ় তিন মাসের সাহচর্যে আমার মনে এমন দাগ রাখলে, যা সহজে মোছবার নয়।

তিনধরিয়ার ক্যারেজ শপের কয়েক ধাপ নিচে কাঞ্চার আস্তানা। পাহাড়ের খাঁজে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় বাসাটা যেন ঝুলে আছে। ও

ছিল পয়েণ্টসম্যান। মজুরদের হাঁড়ির খবর জোগাড় করতে হবে শুনে কাঞ্চা হেসেছিল।

বলেছিল, "কথার উপর বিশ্বাস করলে চলবে না। গাড়ি করে ঘুরলেও চলবে না। যদি দেখতে হয় তো নিজের চোখে দেখ।"

তাই দেখব বলতে, কাঞ্চা খব খুশী হল।

ডিসেম্বর মাস। তার উপরে সেদিন বৃষ্টি নামল। আমার গায়ে পাঁচ-জনের কাছ থেকে ধার করে আনা কয়েক প্রস্থ গরম জামা ছিল। তাই চাপিয়ে কম্পাউন্ডারবাবুর ঘরে আগুনের মালসা পুরো দখল করেও মনে হচ্ছিল হাত পা শিরদাঁড়া বুঝি জমে গেল। কম্বলের মধ্যে ঢুকব কিনা ভাবছি এমন সময় কাঞ্চা এসে হাজির।

বললে, "সাথী, মজুরদের অবস্থা দেখবে বলেছিলে। চল জলদি।"

কম্পাউন্ডারবাবু বললেন, "সে কি? এই ঠান্ডায় বেরুলে নির্ঘাৎ নিমুনিয়া। এখন যাবেন কোথায়?"

কাঞ্চা আমার দিকে চেয়ে হাসল। ওর দিকে চেয়ে দেখলুম এক নজর। ভিজে শপ শপ করছে। গায়ে শুধু কয়েকটা ছেঁড়া সোয়েটার। পায়ের জুতোয় শত তালি। হলদেটে গোল মুখ নীল হয়ে আসছে। হাতে একটা ছাতি। তাতে ওখানের বৃষ্টির কি আটকাবে? কাঞ্চা আর একবার আমার দিকে চাইল। কি বলি তার জন্য অপেক্ষা করল একটু, তারপর হয়ত চলেই যেত, বললুম, "দাঁড়াও, আমিও যাব।" (বয়স যত কম থাকে মানুষের, তত বেশী সে আদর্শের ক্রীড়নক হয়।) কম্পাউন্ডারের বর্ষাতি, গামবুট ধার করে হি হি শীতে কাঞ্চার বস্তীর দিকে এগিয়ে চললুম।

ভাগ্যিস এসেছিলুম। নইলে দারিদ্র্যকে দেখতে পেতুম না। কখনো, না। কথার ক্ষমতা কি, সে অবস্থা ফোটাতে পারে। 'মর্মন্তুদ', 'হৃদয়-বিদারক', 'করুণ দৃশ্য', 'ভয়াবহ পরিবেশ'—এই খবুরে কাগুজে ফর্মুলাগুলো নিতান্ত হাস্যকর হয়ে ওঠে।

পাহাড়ের খাঁজে কাঠের ঘর। যেদিকে পাহাড় অনেক বাড়ীরই সেদিকে দেওয়াল নেই। বাকী তিন পাশ আর ছাত কাঠের। সে কাঠও মান্ধাতার আমলের। বছরের পর বছর তার উপর বৃষ্টি পড়েছে, কাঠে পচ ধরেছে, এখানে ওখানে ছেঁদা হয়েছে। কুড়িয়ে আনা জ্যাম জেলির টিন, পিচবোর্ড, কাগজ দিয়ে এরা নিজেরাই তাপ্পি দিয়ে রেখেছে। কিন্তু পাহাড়ী বৃষ্টি কি তাতে বাঁধ মানে?

হু হু হাওয়া আর ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যে কাঞ্চার বস্তীতে এসে হাজির

হলুম। এক ঘরে উঁকী মেরে দেখি অন্ধকার। বাতি জ্বালাবার পয়সা নেই। গলগল করে ছাত দিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। মেয়ে মরদে মিলে চালের বাতায় যা পাচ্ছে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে তাই গুঁজে তাপ্পি দিচ্ছে। একটা ছোট ছেলে মেঝের থৈ থৈ জলে বসে পরিত্রাহি চীৎকার করছে। ঘরের ভেতরে ঠাণ্ডা যেন মরে শক্ত হয়ে আছে।

কাঞ্চার ঘরে গেলুম। কাঞ্চার বৌ মোটাসোটা। গোটা তিনেক বাচ্চা। সেগুলোও বেশ শক্ত সমর্থ। সে ঘরের দৃশ্যও একই। হঠাৎ কাঞ্চা ছুটে গেল এক কোণে। চালের ফুটো থেকে এক টানে খুলে আনল এক সোয়েটার। বিজাতীয় ভাষায় সুরু হল দুজনের প্রচণ্ড আস্ফালন। ভাষা বুঝলুম না। আভাসে বুঝে নিলুম সোয়েটার প্রসঙ্গ চলছে। চেঁচামেচি। ছেলেদের কান্না। কনকনে ঠাণ্ডা। স্যাঁতসেঁতে বৃষ্টি। সব যেন একসঙ্গে আমায় আক্রমণ করলে। ভ্যাঁপসা এক গন্ধে পেটের নাড়ী গুলিয়ে উঠল। আমি পালিয়ে এলাম।

পরে শুনলুম কাঞ্চাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়েছে। আর ওর বউ হাসপাতালে।

দুদিন পরে কাঞ্চা এসে হাজির। একটা পুরানো পকেট ঘড়ি নিয়ে। ওর বউএর জন্য টাকা চাই। ঘড়িটা বিক্রী করবে। আমি কিনব কি না। ঘড়িটা পুরনো, কিন্তু খুব সুন্দর। ক্রোনোমিটর ঘড়ি। এখন প্রায় পাওয়া যায় না।

"ঘড়ি কোথায় পেলে কাঞ্চা?"

জানিনে গলায় আমার সন্দেহের আভাস ফুটে উঠেছিল কি না?

কাঞ্চা বললে, "চোরী নেহি কিয়া হ্যায় সাথী। (চুরি করিনি) রাটালজী সাহাব নে দিয়া থা।"

কাঞ্চাকে বললুম, "অবিশ্বাস করিনি।"

তারপর সে রাটালজী সাহেবের উপাখ্যান বললে। সে তো মহাভারত। এখানে সব বলার সুযোগ নেই।

কাঞ্চার যৌবনকালের গল্প। রাটালজী সাহেবের সঙ্গে এভারেষ্ট অভিযানে গিয়েছিল। সে অনেকদিন আগে।

হিমাচল পাহাড়ে অজস্র অভিযান হয়েছে। কোনো না কোনো শেরপার মুখে তার কোনোটার না কোনোটার কাহিনী শোনা যাবে।

কাঞ্চারা সে অভিযানে সুবিধে করতে পারেনি। বেজায় বৃষ্টি আর তুষার ঝড়ের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে তারা ফিরে এসেছিল। না, সবাই ফিরতে পারেনি। কাঞ্চার ভাগ্নে তিন নম্বর ক্যাম্প থেকে যাত্রা করেছিল,

সে দেখেছিল। কিন্তু সেই শেষ দেখা। না, কাঞ্চা তাকে আর কখনো দেখেনি।

কাঞ্চা বললে, "আমরা শেরপা। আমাদের জন্ম ওই হোথা, পেঁজা বরফের মধ্যে। পাহাড়ের মাথায়। বাপ-দাদারা ওইখানে জন্মেছে, ওইখানে মরেছে। আমরা খেতে পাইনে, তাই নিচে নেমে আসি। খেতে পাইনে তাই উপরে উঠি। মাল পিঠে বয়ে। পা হড়কে যাবে তো মরব। মাথায় বরফ খসে পড়বে তো মরব। পাহাড়েই মরব। তাই পাহাড়কে আমাদের কোনো ভয় নেই।"

কাঞ্চা বলছিল, তিনদিন অবিশ্রান্ত তুষার ঝড় বয়ে চলেছে। তিব্বতের পথে ওরা গিয়েছিল। সেদিকে বাতাসের চাবুক আরো কড়া। খাবার ফুরিয়ে আসতেই রাটালজী সাহেব বললেন, ফেরো। দু'নম্বর ক্যাম্পে ফিরে চল। কাঞ্চা দেখল তিনজন শেরপার সঙ্গে ওর ভাগ্নেও বোঝা পিঠে নিয়ে ফিরে চলল। (ব্যস্ সেই শেষ দেখা। কোথায় গড়িয়ে পড়েছে। হাড়গোড় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে তুষার ঝড়ে কোথায় উড়ে গেছে।) একটু পরে ফিরে চলল ওরাও। রাটালজী আর ওরা তিনজন শেরপা। সকালে রওনা দিয়েছিল। দুপুরে ঝড় বাড়ল। দাপটে দুজন শেরপা কোথায় ছিটকে পড়ল। রাটালজীও গড়িয়ে পড়েছিল। কাঞ্চা প্রাণপণে রাটালজীর কোমরের দড়ি নিজের মাথায় পাক মেরে বেঁধে নিয়ে ডান পা এক পাথরের খাঁজে ঢুকিয়ে দিল। তবু তাল সামলাতে পারল না। উল্টে পড়ল নিজেও। ভাগ্যিস পাথরের খাঁজে পা ঢুকেছিল, তাই কাঞ্চা ঝুলে রইল। খানিক পরে রাটালজী টাল সামলে নিলেন। একটু দম নিয়ে সাবধানে উঠে এলেন। কাঞ্চাকে তুলে তার পিঠ থাবড়ে বললেন সাবাস। তুমি আমার জান বাঁচিয়েছ। কাঞ্চা হাঁটতে পারছিল না। ওর পা গুঁড়ো হয়ে গেছে। রাটালজী সাহেবের উপর ভর দিয়ে শেষে দু' নম্বর ক্যাম্পে এসে পৌঁছাল।

কাঞ্চা হেসে বললে, "পায়ের পাতা কেটে ফেলল হাসপাতালে, এই দ্যাখ সাথী।"

দেখলুম, ডান পায়ের পাতা নেই।

কাঞ্চা বললে, "রাটালজী * সাহেব আমাকে তার নিজের ঘড়ি দিল।

---

* রাটালজী সাহেব কে তাঁর খোঁজ পেলাম না। রাটলেজ বলে এক সাহেবের নাম পেয়েছি, যিনি কয়েকবার এভারেস্ট অভিযান করেছিলেন। জানিনে কাঞ্চা এঁরই নাম করেছিল কি না। —লেখক

একশ টাকা দিল। রেল কোম্পানীর সাহেবকে বলে চাকরীও একটা জ্বটিয়ে দিয়ে গেল। এই সেই ঘড়ি। নেবে?”

ঘড়ি আমি নেইনি। দরকার ছিল, টাকা ছিল না।

তেনজিং শেরপার খবর পড়তে পড়তে কাঞ্চার কথা মনে পড়ল। ওর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছে অনেকদিন। তেনজিং বিজয়ী, কাঞ্চারা পরাজিত। এই রকম বহ্ কাঞ্চার বারবার পরাজয়েই না এক একটা উপরে ওঠবার ধাপ তৈরী হয়েছে। যার উপর পা রেখে রেখে শেরপা তেনজিংরা শিখরে উঠে গেছে। তেনজিং-এর জন্য সমস্ত জগৎ আছে, হাতে জয়মাল্য নিয়ে। এই তো প্রকৃষ্ট সময়, তার থেকে দ্বটো ফ্বল ছিঁড়ে নিয়ে কাঞ্চাদের উপরে, কাঞ্চাদের নিখোঁজ ভাগ্নেদের উপরে ছিটিয়ে দেবার।

॥ সাত ॥

দুর্ভাগ্যই একবার আমাকে সৌভাগ্য এনে দিয়েছিল। লাঞ্ছনা দিয়েছিল এমন এক স্বর্ণদ্যুতিময় অভিজ্ঞতার সন্ধান যা জীবনের সঞ্চয়ে চিরভাস্মর হয়ে থাকবে। সেই কথাটাই বলি।

ভবঘুরে অবস্থার আমার তখন পূর্ণদশা। পুরী, কটক, ভুবনেশ্বর ঘুরে খুর্দায় এসে হাজির হয়েছি। সেখান থেকে কোনো এক গভীর রাত্রে একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে চড়ে বসলুম। ইচ্ছে বহরমপুর-গঞ্জামের পথে দক্ষিণ ভারতে টহল মারা। কিন্তু ভোর রাতে ধরা পড়লুম এক টিকিট চেকারের হাতে। বিনা টিকিটের যাত্রী, পকেটে কপর্দকও ছিল না, তাই গঞ্জনা এবং লাঞ্ছনা জুটল অনেক। আকাশে তখনও রাত্রি ছিল, চোখে ছিল ঘুম। কোন একটা স্টেশনে গাড়ী থামতেই চেকারটা ঘাড় ধাক্কা দিয়ে 'নিকাল' বলে নামিয়ে দিলে। কাঁকর বিছানো নিচু প্ল্যাটফর্মে হুমড়ি খেয়ে পড়তে চোখ থেকে ঘুম ছুটে গেল। ট্রেনও চলে গেল। সেই নির্বান্ধব ইস্টিশানে পড়ে রইলুম একা।

এইখানেই তো সেই বৃদ্ধ ভাস্করটির সঙ্গে পরিচয় ঘটে। সেই পক্ক-কেশ, ঋজুদেহ, উগ্রদর্শন অদ্ভুত মানুষটিকে এখনও তেমনিই মনে আছে। চোখ বুঁজলেই তাঁর মুখখানি ভেসে ওঠে। সেই অজস্র বলিরেখার কুঞ্চন, সেই বীতস্পৃহ উজ্জ্বল চাহনি, সেই তিক্ত হাসি—সবই দেখতে পাই।

সেদিন কি তিথি ছিল জানিনে। তবে সেই ভোর রাত্রে, ইস্টিশানের বাইরে, পাতা ঝরা বাবলা গাছের ডালের ফাঁকে চাঁদকে আটকে থাকতে দেখেছিলুম। সমস্ত প্রান্তরে জ্যোৎস্নার প্লাবন নেমেছিল। বাঁধ-ভাঙা প্লাবন। আর মৃদু বাতাসে যে শীতলতা ছিল সেদিন, আমার লাঞ্ছনার ক্ষতে তাই-ই উপসম এনেছিল। চোখ থেকে ঘুমের অতৃপ্তি দূর হয়ে গিয়েছিল।

মনে পড়ে দিন-রাত্রির সেই অদ্ভুত অভিসারক্ষণটুকুকে। পশ্চিমে চাঁদ ঢলে পড়ছে। রূপালী রঙের স্রোত বয়ে যাচ্ছে আকাশে। পূবের দিক-চক্রবালে ফুটে উঠছে সিন্দুরসিক্ত দ্যুতি। সূর্য উঠছে। সেই নির্জন ঊষায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশে রঙের খেলা দেখছিলুম। এখনই সূর্য

উঠবে। সমস্ত রাত্রি ধরে যে সকল রহস্যময়ীরা লীলা করেছে, দিনের আলো ফুটবার আগেই তারা ফিরে যাবে কোন রহস্যলোকে। অপ্সরা, কিন্নর, গন্ধর্বদের কথা দিনের বেলা মনে পড়ে না। সহরে মনে পড়ে না। তখন তাদের, সেখানে তাদের অলীক অবাস্তব বলে মনে হয়। কারণ তখন মন থাকে অপ্রস্তুত, কল্পনা থাকে বন্দী। কিন্তু কখনো যদি দিন-রাত্রির সন্ধিক্ষণে, কোনো জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রি-শেষে, আমার মতো অকস্মাৎ কোনো অপরিচিত প্রান্তরে গিয়ে পড়েন, আমার মনে হয় আপনারাও অপসৃয়মান অশরীরীদের অস্তিত্ব টের পাবেন।

সেই ইস্টিশানটার নামেও কেমন যাদু ছিল। রম্ভা। শুনলুম চিল্কা হ্রদ নাকি খুব কাছেই। শাপে বর হল। ইস্টিশান থেকে বেরিয়ে গ্রামের দিকে চললুম। গ্রামে জেলেদের বাস। তারা মাছ ধরতে বেরিয়ে যায়। পাখীর ডিম সংগ্রহ করে চালান দেয়। তাদের সঙ্গে ভিড়তে পারলে আর কথা নেই। নিখরচায় হ্রদ বেড়িয়ে আসা যাবে। অনেক কষ্টে তাদের সঙ্গী হলাম।

চারদিন ছিলুম নুনিয়া জেলেদের সঙ্গে। লোকগুলো সরল, পরিশ্রমী। ওদের ভাষা এক বর্ণও বুঝতে পারি নি। কিন্তু তাতে বাধা জন্মায়নি। রাত্রি কিছু বাকী থাকতে ওরা অদ্ভুত ধরনের নৌকা চেপে যাত্রা করত। আমাকেও সঙ্গে নিত। সারাদিন জাল টেনে টেনে সন্ধ্যার দিকে ঘরে ফিরে আসত। ওদের দেহের লবণাক্ত আঁসটে গন্ধটা এখনও যেন নাকে এসে লাগে। প্রথম দিন বড় কষ্ট হয়েছিল। ওদের সঙ্গে থাকা, ওদের খাদ্য খাওয়া, প্রথম দিন বড় প্রাণান্তকর বলে ঠেকেছিল। কিন্তু সে কষ্ট সহ্য করেছিলুম। অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে মানুষের মতো কেউ পারে না। পরদিনই সব কিছু আমার অভ্যস্ত হয়ে গেল।

চিল্কা অগভীর। জলে তরঙ্গ আছে, ঢেউ নেই। জলের মধ্য থেকে নানা জায়গায় ছোট ছোট পাহাড় (পাহাড় না বলে পাথরের স্তূপ বলাই ভাল) মাথা জাগিয়ে উঠেছে। ওদের মধ্যে যেগুলোতে জমি বেশী সেগুলোর নাম দ্বীপ। ভাল ভাল দ্বীপগুলো রাজা-মহারাজা জমিদারদের দখলে। মাঝে-মিশেলে তাঁরা ইয়ার-বন্ধু নিয়ে আসেন, মদ বাঈজী সঙ্গে আসে। বিশেষ ধরনের যানবাহন করে তাঁরা ওসব দ্বীপে চলে যান। নুনিয়া রমণী আর তাদের শিশুদের চোখে অপার বিস্ময় ফুটে ওঠে। কি পোষাকের ঘটা! কি বাহারের ছটা! কখনো কখনো গভীর রাত্রে দূরাগত গোলমালের শব্দে নুনিয়া গ্রামের ঘুম ভেঙে যায়। তারা বন্দুকের আওয়াজ শোনে, মরণোন্মুখ কোনো হতভাগ্যের মর্মভেদী আর্তনাদ এদের কানে ঢোকে। এরা দরজা

বন্ধ করে দেয়। ঈশ্বরের নাম জপ করে। ভোর রাত্রে অনেক পায়ের শব্দ ইস্টিশানের দিকে চলেছে শুনতে পায়। যাক। শয়তান বিদায় হল। ওদের স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে। আগামী সূর্যোদয় থেকে আবার চিল্কার বুকে শান্তি আসবে, ওরা আশা করে। এর পর হয়ত বহুদিন কেউ আসেন না। তারপর হঠাৎ একদিন কোনো দল এসে আবার কোনো দ্বীপে চলে যান। কোনো কোনো দ্বীপে হয়ত কখনোই আর কেউ আসেন না। সাধ করে বানানো বাড়িতে ফাটল ধরে। দরজা জানালা আসবাব চুরি হয়ে যায়। মাঝে মাঝে ঝোড়ো বাতাস ঘরের মধ্যে ঢুকে যে প্রচণ্ড গোঁগোঁ ধ্বনি তোলে, ক্বচিৎ কোনো নুনিয়ার কানে ঢুকলে সে ভয়ে কাঁপতে থাকে। গ্রামে গিয়ে সবাইকে জানিয়ে দেয় ওধারে কেউ যেও না, দানো আছে। সে নিজে কর্ণে দানোটার বিকট চীৎকার শুনে এসেছে। চিল্কার জলের তলে যেমন অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে, চিল্কার বুকে ফুটে ওঠা দ্বীপগুলিতেও তেমনি।

নুনিয়ারা বলে, জ্যোৎস্না রাত্রে কেউ চিল্কায় যেও না, বিপদে পড়বে।

কিসের বিপদ, যদি জিজ্ঞেস কর, জবাব পাবে, অনেক রকম বিপদ। মৎস্যনারী এসে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে, আর ফিরতে পারবে না। জ্যোৎস্না-রাত্রে মৎস্যনারীরা উপরে ভেসে ওঠে। শ্যাওলা রঙের চুল এলো করে জলে ভেসে থাকে। তখন তাদের শরীর দিয়ে পদ্মের সুবাস বেরোয়। কোনো মানুষের নাকে গেলে সে পাগল হয়ে ওঠে। মৎস্যনারীর সন্ধানে ছোটে। শঙ্খের মতো আওয়াজ করে মায়াবিনীরা তাদের ভুলিয়ে বার দরিয়ায় নিয়ে যায়। যারা যায়, তারা আর ফেরে না। এমন অনেক জোয়ান নুনিয়াদের গ্রাম থেকে গেছে। আর ফিরে আসেনি। শুধু দু'জন ফিরেছিল। মৎস্য-নারীরা তাদের একজনকে বোবা করে দিয়েছে, অন্যকে করেছে অন্ধ। সেই অন্ধ এইসব কথা বলেছে।

নুনিয়াদের গল্প আমি শুনতুম, আর শুনত এক বৃদ্ধ। আমার মতো সে-ও আগন্তুক। চুলগুলো সব সাদা, ষাটের ওপর বয়স, কিন্তু কি শক্ত, কত সমর্থ সেই দেহ। বৃদ্ধ উড়িষ্যাবাসী। ভাস্কর। দরিদ্র কিন্তু আত্মসচেতন। শিল্পীর দম্ভ তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে ফুটে উঠেছে। যারা ভুবনেশ্বরের মন্দিরগাত্রে একদিন আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিল, বৃদ্ধ যে তাদেরই গৌরবময় উত্তরাধিকার বহন করছে, সে বিষয়ে ছিল অতিমাত্রায় সচেতন। এই বৃদ্ধ বয়সেও অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, রূপকথা সংগ্রহ করছে, জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি রচনা করবে বলে।

বৃদ্ধ ভাস্কর বলেছিল, "সারা জীবন ধরে শুধু খুঁজেই চললাম। বয়েস হয়েছে, কোনদিন ওপার থেকে ডাক আসে কে জানে? কিন্তু পিতৃপুরুষের

দেনা শোধ না করে তো যেতে পারব না। মৎস্যকন্যারা যে শঙ্খস্বরে নুনিয়া তরুণদের ডাকে, তেমন শঙ্খ-স্বরে আমাকে কেন ডাকে না আমার কল্পনা? তেমন ডাক শুনেছিল বলেই আমাদের পূর্বপুরুষরা সাড়া দিয়ে গেছে ভুবনেশ্বর, কোনার্ক, অজন্তা ইলোরার দেওয়ালে দেওয়ালে।"

বলতে বলতে বৃদ্ধের গলা ধরে এল।

বললে, "সারাজীবন ধরে ঠুক্ ঠুক্ শুধু খুচরো কাজই করে এলাম। কিছুই থাকবে না। থাকবার মতো কিছু করলে তো থাকবে। একবার বুঝলে, এক রাজার কাছ থেকে একটা অর্ডার এল, একশ' টাকার অর্ডার। মাথায় একটা সুন্দর ভাব এসেছিল। খুব খেটে তৈরী করে দিলাম এক মোহন মুরলীয়া। ভাল একটা কাজ তুলতে পারলে মনে যে আনন্দ আসে চার পাঁচ দিন তাতেই ডুবে থাকা যায়। কি সুন্দর হাসি ফুটিয়েছিলাম সেই মূর্তিটায়। সব ভুলিয়ে টেনে নিয়ে যায় এমন। সমাজ সংসার মানসম্ভ্রমের শিকড় তো আর একটুখানি নয়। কি তার জোর। সেই শিকড়ও যে-হাসিতে উপড়ে আসে, সেই হাসি এনেছিলাম সেই মুরলীওয়ালার মুখে। তা সেই মূর্তিটার কি হল জান?"

বলতে বলতে ভাস্করের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। ঠোঁটের রেখায় ফুটে উঠল তীক্ষ্ম বিদ্রূপ।

বললে, "সেটা হল রাজার টেবিলের কাগজচাপা। সাত দিন পরে রাজার লোক আবার একশ' টাকা নিয়ে হাজির। বলে, রাজাকে ওই রকম আরেকটা পেপার-ওয়েট বানিয়ে দাও। রিজেণ্ট সাহেবকে দেবেন। খুব সামলে গেছি সেদিন, বেটা নফরের বাচ্চাটাকে খুন করে ফেলিনি। ইচ্ছে হচ্ছিল, তবু অতি কষ্টে রাগ সামলে বললাম, আভি নিকালো।"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ভগ্নকণ্ঠে বললে, "আর কিছু বানাতে পারিনি। কোনো মহৎ, কোনো ভাল কল্পনা এলে সঙ্গে সঙ্গে পরিণামের কথা মনে পড়ে যায়। তিল তিল কল্পনা দিয়ে যে তিলোত্তমা গড়ে তুলব, বেরসিক তাকে নিয়ে ধান ভানাবে। এ কথা মনে পড়ে আর হাত অসাড় হয়ে যায়।"

এই জাতীয় লোকের দেখা আমি আর কখনো পাইনি। মাত্র দু' দিনের পরিচয়। তবু, কি গভীর রেখাপাত করে দিয়ে গেছে আমার মনে।

একদিন গভীর রাত্রে বৃদ্ধ আমাকে ডেকে তুললে।

বললে, "মৎস্যনারী দেখবে এস।"

মৎস্যনারী দেখব! চমকে উঠলুম। তাও কি সম্ভব? দুর্দমনীয় কৌতূহল চাপতে পারলুম না। বৃদ্ধের পিছু পিছু নুনিয়াদের ঘাটে এসে একখানা জেলেডিঙি খুলে নিলুম।

ধীরে ধীরে চতুর্দিকের পাড় মিলিয়ে গেল। চিল্কার বুকে সেই গভীর নিশীথে মাত্র আমরা দু'জন মানুষ। জ্যোৎস্না একটু দেরিতে উঠল। সমস্ত চরাচর একাকার হয়ে গেল এক অপার্থিব উজ্জ্বলতায়। কারো মুখে কথা নেই। কোনোখানে শব্দ নেই। আমাদের বিমুগ্ধ আত্মা শরীরের সীমানা ছাড়িয়ে কি এই অনির্বচনীয় আনন্দের সাগরে অবগাহনে রত?

জলের দিকে নজর পড়ল। জ্যোৎস্নাচ্ছটায় সেখানে অজস্র স্বর্ণকণা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আর আমাদের ডিঙির অদূরে ভেসে রয়েছে গোছা গোছা চুল। সহস্র মৎস্যনারীর দীর্ঘায়ত কুন্তল। দিনের আলোয় যাকে শ্যাওলা বলে ভ্রম হয়।

বৃদ্ধের কণ্ঠে উত্তেজনা। থরথর কম্পমান তার দেহ। জলে অল্প অল্প তরঙ্গ। জ্যোৎস্না পড়ে অপরূপ উজ্জ্বলতায় চলকে চলকে উঠছে।

বৃদ্ধ সেদিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, "ওই দেখ মৎস্যনারীর হাসি। যে হাসি নুনিয়া যুবকদের ভুলিয়ে নিয়ে যায়। বোবা করে দেয়, অন্ধ করে দেয়। ঐ হাসি যদি পাথরের গায়ে ফোটাতে পারি, তবেই না পূর্বপুরুষের ঋণ শোধ হয়।"

স্পষ্ট বুঝতে পারছি, বৃদ্ধ প্রকৃতিস্থ নেই। ওর চোখে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা, ওর মনে অমানুষিক আবেগ। মৃগী রোগীর মতো ওর দেহে কি আকুল আক্ষেপ!

জানি না, এই বৃদ্ধ ভাস্কর কোনো মূর্তির মধ্যে সে দিনকার সেই অপার্থিব অভিজ্ঞতা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিল কি না। কল্পনা তাকে মৎস্যনারীর শঙ্খস্বরে ডেকেছিল কিনা, তাও জানতে পারিনি। কারণ সেই ভোরেই দু'জনে ছাড়াছাড়ি। শুধু জানি, দিন মাস বৎসরের ক্রমবর্ধমান দূরত্বকে সরিয়ে ফেলে বৃদ্ধটি আমার মনে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। তার স্মৃতি কোনোদিন ম্লান হবে না।

॥ আট ॥

দৈনিকপত্রের ব্যক্তিগত কলম পড়া আমার অভ্যাস। বাংলা কাগজে এ দিকটা এখনো অনাদৃত। তাই ইংরাজি কাগজে প্রত্যহই উঁকি মারি। রাজনীতির আবর্ত, স্বার্থের দ্বন্দ্ব, প্রাকৃতিক ওলোটপালট নিয়ে সমস্ত কাগজময় যখন মাতামাতি চলে, তখন একান্তে, অতি নিভৃতে একটি কি দুটি নিতান্ত ব্যক্তিগত সংবাদ সন্ধ্যামণি ফুলের মত, ব্যক্তিগত কলমে ফুটে ওঠে। কে যে সে খবর দেয়, কেন দেয়, কার জন্য দেয়, অনেক সময় তাও বোঝা যায় না। বেশীর ভাগ খবরই জন্ম ও মৃত্যুর। আনন্দের আভাস আর অনুশোচনার কশাঘাত কেমন পাশাপাশি মিশে থাকে।

সেদিনও অভ্যেস বশে চোখ বুলাচ্ছিলাম। বিজ্ঞাপনটা নজর পড়তেই চমকে উঠলাম। "প্রিয়তমা পত্নী জেনি রীডের মৃত্যুতিথি স্মরণে। ১৯৫১ সালে, ২১শে আগস্ট যে হতভাগিনী বিনাদোষে কারান্তরালে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে।" তারপর দু'ছত্র কবিতা। কবিতার নীচে লেখা, "অনুতপ্ত পিটার।"

জেনি রীডকে আমি জানতাম। আড়াই বছর আমরা এক অফিসে কাজ করেছি। ও ছিল স্টেনো। জেনির জেল হয়েছিল জানতাম। ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, বুড়ি মাকে স্বেচ্ছায় ধীর মস্তিষ্কে খুন করার। আদালতে নিজেই তা স্বীকার করেছিল। ঠিক মনে পড়ছে না, সাজাটা কতদিনের ছিল। তবে, মনে পড়ছে, জেনির ফাটক হয় ১৯৫১ সালের মার্চ মাসের শেষ দিকে। তার আগেই আমার চাকরি যায়। তবু খবর পেয়ে জেলে গিয়ে আমি জেনির সঙ্গে দেখা করেছিলাম।

আমার কাছে জেনির একখানা বই ছিল। সঙ্ অব্ বার্ণাদোতে। খৃীস্ট-দিনের উপহার হিসেবে পিটার একবার বইখানা ওকে কিনে দেয়। জেনির সঙ্গে আমার সখ্য গাঢ় হলে, ওখানা ও-ই আমাকে একবার পড়তে দেয়। বোধ হয় তার দিন দুয়েক পরেই আমার চাকরি যায়। বইখানা জেনির খুবই প্রিয় ছিল। বইখানা ফেরত দেব বলেই জেলে ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

সেদিন সেই বিষণ্ণ অপরাহ্নে সেণ্ট্রাল জেলের এক অপরিসর ঘরে জেনিকে দেখে তার কোনো পরিবর্তন তো নজরে পড়েনি। সেই ভীরু

ভীরু চাউনি, ক্লান্ত কোমল মুখ, সেই ধীরে ধীরে কথা বলা, সবই ঠিক আছে। এ মেয়ে মাকে খুন করেছে, সেকথায় মন সায় দেয়নি। এমন নম্র, ধর্মভীরু যে কোনো ফিরিঙ্গী মেয়ে হতে পারে, জেনিকে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না।

সত্যিই খুন করেছে কি না, সেকথা ভেবেছিলাম একবার জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু প্রসঙ্গটা অপ্রীতিকর। তাই ও কথা সেদিন তুলিনি। বরং যে কথা কখনো জেনিকে জিজ্ঞাসা করিনি, তাই করলাম।

"পিটার আসেনি?"

জেনি হাসল। ওর হাসিটা যেন শিথিলবৃন্ত শেফালিকা। টুক করে খসে পড়ল।

বলল, "আজ তুমি আসবে, তাই আসেনি। সপ্তাহে একদিন দেখা করতে পারি। তাও একবার একজনের বেশী তো দেখা করতে পারবে না। সত্যিই, তুমি এলে? আসবে, ভাবিনি। পিটার বলেছিল, আসবে না। আমি জানতাম, আসবে। তবু ভাবনা হয়েছিল। এলে, দেখা হল। এই বোধ হয় শেষ দেখা।"

জেনি আবার হাসল। ক্ষমা-চাওয়া হাসি।

জিজ্ঞাসা করলুম, "শেষ দেখা বলছ কেন, জেনি?"

বলল, "আর তো কারো সঙ্গে দেখা করব না। তুমি আমার লাস্ট ভিজিটার।"

জেনি থামল একটু।

তারপর বলল, "জীবনে চারজনকে ভালবেসেছি। মা, পিটার, তুমি আর ঈশ্বর। আজ থেকে শুধু ঈশ্বরই ভরসা।"

জেনি ভক্তিভরে বুকের উপর ক্রুশ আঁকল। আমার মাথায়ও ক্রুশ এঁকে দিল। বলতে গেলাম, কল্যাণ হোক। পারলাম না। গলার কাছে পুঁটুলী পাকিয়ে রয়েছে। সমস্ত আবেগ ঠেলাঠেলি করে বেরুতে চাচ্ছে। পথ পাবে কি করে?

সেই শেষ দেখা। কিন্তু জেনি যে মারা গেছে, তা আজ জানলাম।

অথচ জেনিকে প্রথম দিকে আমি মোটেই দেখতে পারতাম না। শুধু একা আমি নই, আপিসশুদ্ধ সকলেরই ও ছিল চক্ষুশূল। তার প্রধান কারণ স্ত্রীলোক হয়েও ও দেখতে মোটেই ভাল ছিল না। রং ছিল মেটে, দেহ শুকনো কাঠ, সম্মুখে পশ্চাতে একেবারে সমতল। বয়েস বোঝা ভার। তবে তিরিশ তো নিশ্চয়ই। থাকত গম্ভীর হয়ে। ভয়ে ভয়ে।

কাগজের আফিসে কাজ। সাব-এডিটার নিকুঞ্জ একটু ঠোঁটকাটা।

বলত, "এঃ, এ যে ব্রহ্মচর্যের মেশিন রে। এই পেত্নীটাকে কে জোটালে? সব যে জিতেন্দ্রিয় হয়ে পড়ব।"

নানা রকম মন্তব্য হত। ওর সামনেই। অবশ্য সবই আমাদের স্বভাষায়। ভাগ্যিস জেনি বাংলাটা বোঝে না।

আমাদের রাগের কারণও ছিল। জেনির আগে টাইপিস্ট ছিল মিস্ রিচার্ড। বছর সতের বয়েস। যেমন তার গায়ের রঙ, তেমনি শরীরের বাঁধুনি। চলত ফিরত, আপিস শুদ্ধ লোকের রক্তে মাতাল তুফান তুলে। কিছু কাজ করত না। সময়ে অসময়ে ম্যানেজার সাহেবের খাস কামরায় ডাক পড়ত ডিক্টেশন নিতে। সর্টহ্যান্ড জানত না বলেই বোধ হয় দেরি হত বেরুতে। ফিরে এসে বীরেন টাইপিস্টকে অনুরোধ করত চিঠিখানা টাইপ করতে। বীরেন কৃতার্থ হত, আমরা ঈর্ষিত। কতদিন মনে হয়েছে, কেন সাংবাদিক হলাম, টাইপিস্ট নয়!

সেই মিস্ রিচার্ড একদিন এক অ্যামেরিকান আর্মি ক্যাপ্টেনের কণ্ঠলগ্না হলেন। চাকরি ছেড়ে দিলেন।

মিস্ রিচার্ডের জায়গায় জেনি এল। কি তফাৎ দুজনে! মিস্ রিচার্ড মোটেই কাজ করত না, জেনি মুখ বুঁজে শুধু কাজই করে। মনিবের কাজ তো করেই অনেক চুনোপুঁটির ফরমাসও খেটে দেয়। কাজে মোটে বিরক্তি নেই জেনির। তবু আমরা কেউ ওর উপর সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। জেনি যেন ষড়যন্ত্র করে কি এক অমূল্য ধন থেকে আমাদের বঞ্চিত করেছে। তাই এই আক্রোশ। বীরেনকে এখন প্রায় কিছুই করতে হয় না, সব কাজ জেনির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। তবু তার আক্রোশই সব চেয়ে বেশী। ওরা দুজনে একই কামরায় বসে। জেনির সামনে বসে বসেই কত যে ইতর মন্তব্য করেছে বীরেন, আর, আমরাও তাতে সোৎসাহে যোগ দিয়েছি, তার ঠিকঠিকানা নেই।

তবু জেনির সঙ্গে একদিন আলাপ হয়ে গেল। সেদিন মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। কনভেন্ট রোডে ঢুকতে না ঢুকতেই বৃষ্টি চেপে এল। রাস্তাটা এমন হতচ্ছাড়া যে কোথাও মাথা গোঁজবার জায়গা নেই। নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের একটা মেসবাড়ি ওই রাস্তার উপর আছে। তারই কার্নিসের নীচে দাঁড়িয়ে কোনও রকমে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছি। রাস্তায় প্লাবন নেমেছে যেন। বিরক্তির সীমা কখন ছাড়িয়ে গেছে। অসহায়তা এখন যেন বেঁধে মার দিচ্ছে। এমন সময় জেনি আমাকে এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করল।

রিক্সা ক'রে যাচ্ছিল, আমি দেখিনি, ওই রিক্সা নিয়ে এগিয়ে এল।

ডাকল, "হ্যালো। যদি অসুবিধে বোধ না করেন তো দয়া ক'রে উঠুন।"

রিক্সার পর্দার ফাঁকের ভেতর দিয়ে শুধু ওর মুখখানা ভেসে রয়েছে দেখলাম। করুণা, মমতা, নম্রতা ও দীনতা মিশিয়ে সে মুখখানা তৈরী। কনভেণ্ট রোড নির্জন, বাড়িগুলির দরজা জানালা বন্ধ, কোথাও সাড়া শব্দ নেই, আকাশে ঘনঘটা, মুষলধারে বৃষ্টি। চকিতে মনে হল কোনো জনমানবহীন অসীম প্রান্তরে গভীর দুর্যোগের মধ্যে কতকাল যেন নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছি। কতকাল পরে যেন একটা মানুষের দেখা পেলাম। মনে হল জেনির মুখখানা কি কোমল। ধন্যবাদ জানিয়ে রিক্সায় উঠলাম। সারা পথ কোনো কথা হল না। রিক্সা থেকে আপিসে নেমে শিভালরি দেখাতে পকেটে হাত দিলাম।

জেনি বাধা দিয়ে বলল, "ছি ছি, সে কি কথা ভাড়াটা আমারই দেবার।"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জেনিকে আবার ধন্যবাদ দিলাম। পয়সা বাঁচল বলে নয়, ইজ্জৎ বাঁচল বলে। পকেট আমার ঢুঁ ঢুঁ।

সেই থেকে জেনির সঙ্গে ধীরে ধীরে আমার বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। দেড় বছরে তা গভীর হয়েছিল। অনেকদিন আমরা দুজন হাঁটতে হাঁটতে গেছি। সাডার স্ট্রীটের এক গলির মধ্যে ওর বাসায় বহুদিন ওকে পেঁছে দিয়েছি।

আপিসে কেউ ওর বান্ধব ছিল না, এক আমি। তাই বোধ হয় এত শীঘ্র এত অন্তরঙ্গ হয়ে পড়েছিলাম। ওর পারিবারিক কাহিনীও অনেক জেনেছিলাম, নিজেই বলেছিল।

সংসারে থাকবার মধ্যে ওর মা, আর পিটার—ওর স্বামী। মা বুড়ি। দীর্ঘদিন ধরে ভুগছে। মেজাজ অতিশয় খিটখিটে। রাতদিন চীৎকার করছে, গাল পাড়ছে। শুধু মেয়েকে দেখলে চুপ। চীৎকার বন্ধ হয়ে যায়। তখন ইনিয়ে বিনিয়ে কান্না সুরু করে। আর পৃথিবী শুদ্ধ লোকের বিরুদ্ধে নালিশ করে। ঘ্যান ঘ্যান লেগেই আছে।

জেনি খুব চাপা মেয়ে। কিছুই বিশেষ বলত না। তবু মাঝে মাঝে ভেঙে পড়ত।

বলত, "আর পারিনে ভাই। এখন আমার এক চিন্তা বুড়ি মরবে কবে। জানো, যে মার জন্য সব ছেড়েছি, এমন কি পিটারের বিরাগভাজন হয়েছি, সেই মার মৃত্যু কামনা দিন রাত করছি। প্রতি রবিবারে, চার্চে যাই আর ঈশ্বরকে ডেকে বলি, পিতঃ এ যন্ত্রণার অবসান কর।"

জেনি একমাত্র মেয়ে। বুড়ির সর্বদা আশঙ্কা, জেনি বুঝি ওকে ছেড়ে

চলে গেল। পিটারকে বুড়ি দুচক্ষে দেখতে পারত না। পাছে বুড়িকে ফেলে জেনিকে নিয়ে চলে যায়। দিন দিন বুড়ি অক্ষম হাতে জেনিকে আঁকড়ে ধরতে চায়, আর পিটারের সঙ্গে বিরোধ বেঁধে ওঠে। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন দাঁড়াল, হয় পিটার নয় মা, জেনিকে একটা বেছে নিতে হবে। পিটার ঘাড় শক্ত করেছে, তা আর কিছুতেই নরম হবে না। বুড়িকে না ছাড়লে, পিটারকে ছাড়তে হবে, ওর এক কথা।

জেনি বলল, "পিটারের এক গুঁয়েমিকে একটুও দোষ দিইনে। ও অনেক সহ্য করেছে। কিন্তু বুড়ির আমি ছাড়া আর তো কেউ নেই। জানো, কি ছেলেমানুষি সুরু করেছে। আমাকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে শোয়। মাঝরাত্রে গায়ে হাত বুলিয়ে দেখে, আছি না পালিয়ে গেছি। পিটার গেছে বলে দুঃখ যত পেয়েছি, তার চেয়েও বেশী ব্যথা পাই, যখন দেখি আমার মনের কোনোখানে মার জন্যে একটুও স্নেহ মমতা সমবেদনা আর নেই। দীর্ঘদিনের ক্লান্তিকর টানাপোড়েন সে সব শুকিয়ে গেছে। এখন মার জন্য যেটুকু করছি সব রুটিন মত, অভ্যাস বসে। মেয়ের কাছে এর চেয়েও চরম দুঃখের আর কি থাকতে পারে?"

জেনি নিঃশব্দে কেঁদে ফেলল।

বলল, "মনের জোর আমার কম। নইলে হয় মাকে মারতাম, নয় নিজে মরতাম।"

কিন্তু জেনি নিজে মরল না, মাকেই মারল। অন্তত কোর্টে তাই সপ্রমাণ হল। কেসটার বিষয় সঠিক জানিনে। তার আগেই আমার চাকরি গেছে। বছর খানেকের উপর কলকাতা ছাড়া।

অনেকের ধারণা, জেনি নয়, বুড়িকে পিটারই মেরেছে মালিসের ওষুধ খাইয়ে। বুড়ি নাকি গোঙাতে গোঙাতে সে কথা ব'লে গেছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ পিটারের বিরুদ্ধে ছিল না। একমাত্র সন্দেহ থেকে যায়, বুড়ি যেদিন মরে, পিটার সেদিন ও বাড়িতে উপস্থিত ছিল কেন? ইদানীং তো আসা-যাওয়া ছেড়েই দিয়েছিল। তবে সে সন্দেহ টেঁকেনি। জেনি নিজেই স্বীকারোক্তি করেছিল, দুর্বহ জীবন আর বইতে না পেরে মরীয়া হয়ে ও নিজেই এ কাজ করেছে। এর দায়িত্বও জেনিরই, আর কারো নয়। এর পর আর কারো কথা টেঁকেনি।

তবে আরেকটা খবর শুনেছিলাম, পিটার প্রাণপণ ক'রে এটাকে আত্ম-হত্যার কেস্ প্রমাণ করাতে চেষ্টা করেছিল। পারেনি জেনিকে কয়েদমুক্ত করতে, সফল হয়নি। তাই কি এই অনুতাপ? না কি অন্য কোনো গূঢ় কারণের জন্য পিটার আজ অনুতপ্ত? কি সে কারণ?

পিটারকে আমি চিনিনে, কখনো দেখিনি। তবুও কেমন যেন মনে হ'ল, খবরের কাগজের ব্যক্তিগত কলমের অক্ষরগুলোর মধ্য দিয়ে এক অনুতপ্ত স্বামীর মুখখানা দেখতে পাচ্ছি। মুখখানা পিটারের।

খবরের কাগজের লাইন ক'টার উপর আবার নজর পড়ল। "প্রিয়তমা পত্নী জেনি রীডের মৃত্যুতিথি স্মরণে। ১৯৫১ সালের ২১শে আগষ্ট যে হতভাগিনী বিনাদোষে কারান্তরালে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে।

A loving and devoted wife,
perfect in every way,
We want you Jennie, but
God wants you more
(Inserted by her repentant husband.—Peter)"

॥ নয় ॥

ছেলেটিকে দেখি লালবাজারের পুলিশ হেফাজতে। ওখানে পুলিশের একটা দপ্তর আছে, সংবাদ-সরবরাহ কেন্দ্র। সেখানেই এই পলাতক ছেলেটিকে দেখি। আমাকে আকৃষ্ট করল ওর অদ্ভুত চোখ দু'টি। বেশ ডাগর দুটো চোখ, সে চোখ দু'টি যেন ভেসে রয়েছে অশ্রুর সরোবরে। সমস্ত মুখে একটা ঔদাসীন্য, আর সমস্ত দেহে কি দৃঢ়তা। সমগ্র অবয়বে একটা 'যার সব গেছে তার আর ভয় কি' ভাব। ছেলেটার বয়স আর কত হবে? আমার তো মনে হল, বছর সাতেক।

"এ কি ক'রে এখানে এল?" জিজ্ঞাসা করলাম।

"আর বলবেন না," মহিলা অফিসারটি বললেন, "হয়রাণ ক'রে দিলে। দেখতে এইটুকু হ'লে কি হবে, বিচ্ছু একটি। বাড়ি থেকে পালিয়েছে। ধরা পড়েছে আজ চারদিন। কিন্তু এই চারদিনে সমান চেষ্টা করেও হার মানলুম, না বলে মা বাপের নাম ঠিকানা, না দেখায় বাড়ি।"

তারপর ক্লান্তকণ্ঠে তিনি জেরা সুরু করলেন। হয়ত মহিলা ব'লেই কিছুটা ফল ফলল। চুপ ক'রে থেকে থেকে ছেলেটি হঠাৎ বললে, ও পড়ত সাউথ সুবার্বন স্কুলে।

"সাউথ সুবার্বন স্কুলে? কোন্ ক্লাসে রে কোন্ ক্লাসে?"

"ক্লাস ফোরে।"

"তাই বল্। বাব্বাঃ, তবু যা হোক হদিশ মিলল একটা। করুন তো মশাই একটা ফোন। আরে, তোর মাস্টার মশাই-এর নাম কি?"

"চুনীবাবু।"

"দেখতে কেমন?"

"রোগা, কালো, লম্বা, আর গলায় চাদর ঝোলানো।"

ছেলেটি, দেখলাম, ক্রমেই স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। কথাবার্তায় আড়ষ্টতা কমে আসছে। হঠাৎ ফিক করে হেসে ফেললে।

বলল, "চুনীবাবু পেছন ফিরলে না ছেলেরা বক দেখায়।"

"বটে! সেটা তো খুব মনে রেখেছ। পাজী ছেলে কোথাকার," অফিসার ধমক দিলেন। "বল, বাবার নাম কি। কোথায় থাকিস?"

অমনি ছেলেটার মুখ কালো হয়ে গেল। কথাবার্তা বন্ধ করে

মহিলাটির মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যেটুকু স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছিল, আবার তা অপসৃত হল। ছেলেটির চোখে সন্দেহ, সংশয়, আতঙ্ক ফুটে উঠল। আত্মীয়তার স্পর্শ পেয়ে ওর মনে যে আলো ফুটে উঠছিল, তা যেন হঠাৎ নিভে গেল।

অফিসারটি বললেন, "দেখলেন তো, এই রকম করে জ্বালাচ্ছে। কত চেষ্টা করলুম হদিশ বার করতে, কিন্তু আসল কথা তুললেই মুখে যেন তালা মেরে দিচ্ছে। বদমায়েসিটা দেখুন একবার।"

কিন্তু ছেলেটি যে নিরঙ্কুশ বদমাস, মন তা মানতে চাইলে না। সঙ্গে ছিলেন, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার এক রিপোর্টার, তাঁরও দেখলাম এই মত।

আগেকার কিছু অভিজ্ঞতা আছে, তাই বলতে পারি ছেলেরা কখনও অমনি অমনি বদ হয়ে যায় না। ওদের সুকুমার মনে কোথাও যদি গভীর চোট লেগে থাকে, তবে সে কারণেই বিপথগামী হয়ে পড়ে।

ছেলেটি কৌতূহল জাগাল। শুনলাম ব্যান্ডেল ইস্টিশানে ধরা পড়েছে। জানা গেল, টালিগঞ্জ থানার দারোগাবাবু ওকে চিনতে পেরেছেন। চাকরী খুঁজতে কিছুদিন আগে তাঁর কাছে গিয়েছিল নাকি। সাউথ সুবার্বন মেন ইস্কুল থেকে ফোনে সাড়া মিলল, ছেলেটি নিজের যা নাম বলেছে, সে নামে ক্লাস ফোরে কোনও ছেলে পড়ে না। তবে হ্যাঁ, চুনীবাবু বলে মাস্টার একজন আছেন। আর তার বর্ণনা ছেলেটি যেরকম দিয়েছে, তা-ই বটে। আরও তাজ্জব, বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে জানতে পারা গেছে, ছেলেরা তাঁর অসাক্ষাতে তাঁকে অসম্মান করে থাকে বটে।

কিছুটা মিলল, কিছুটা মিলল না।

ভদ্রমহিলা হতাশ হয়ে বললেন, "এতো আচ্ছা যন্ত্রণা। এখন কি করি?"

ছেলেটার সঙ্গে সাউথ সুবার্বন স্কুলের ঘনিষ্ঠতা আছে বোঝা গেল। ক্লাস ফোরে তবে নাম নেই কেন? অনেক কষ্টে ছেলেটার নাম জানা গেছে. বিপিনচন্দ্র দত্ত। ভাল নাম ছাড়া ডাক নাম যদি কিছু থাকে? ছেলেটি বললে, ডাক নাম নেই। তাহলে?

"আমার ইস্কুলের নাম বলব?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বল, বাবা, লক্ষ্মী সোনা, চা খাওয়াব।"

"আমার ইস্কুলের নাম সত্যনারায়ণ দত্ত।"

আবার ছেলেটির তৎপরতা ফিরে এল। "সত্যনারায়ণ দত্ত? প্রেজেন্ট স্যার। রোল নম্বর চব্বিশ? প্রেজেন্ট স্যার। নাম ধরেও ডাকা যায়, রোল ধরেও ডাকা যায়। স্যর না, কখনো রোল ধরে ডাকতেন, কখনো নাম

ধরে ডাকতেন।" ছেলেটার ভাসা ভাসা চোখ দুটো যেন পরিচিত আশ্রয় খুঁজে পেল। দু চোখে উজ্জ্বলতা ফিরে এল।

বলল, "চুনী স্যার নাম প্রেজেণ্ট করে যেই মুখ ফেরাত অমনি ননী মুখ ভেংচে দিত।" হি হি হি।

"এই ননী কে?"

"বাঃ, আমাদের মণিটার।"

"কি ছেলে রে তুই, মণিটারের নাম বলতে পারছিস, আর বাপের নাম, মায়ের নাম, বাড়ীর ঠিকানা বলতে পারছিসনে।"

"আমি ভুলে গেছি।"

"ভুলে গেছ না হাতী, আচ্ছা করে ধোলাই দিলে তখন পটাপট বেরুবে।"

ইস্কুলে আবার ফোন করা হল। কিন্তু নাঃ, ক্লাস ফোরে সত্যনারায়ণ দত্ত বলে কেউ পড়ে না। ননীও কেউ নেই। রোল চব্বিশের নাম রবীন্দ্রনাথ সাহা, সে এখন ক্লাস করছে।

"ছেলেটি ভয়ানক মিথ্যেবাদী তো। পটাপট কেমন বানিয়ে দিলে দেখলেন। আচ্ছা, দেখাচ্ছি দাঁড়াও।"

ভদ্রমহিলা ফোন তুললেন, "হ্যালো, সাউথ সুবার্বন? কে, হেড মাস্টার মশাই? দেখুন, আপনাদের চুনীবাবুকে একবারটি পাঠাবেন আমাদের এখানে, তিনি যদি ছেলেটিকে চিনতে পারেন। কি বললেন, চুনীবাবু আজ আসেন নি? ও। কি বলছেন? অন্য টিচার? ক্লাস ফোরের অন্য একজন টিচারকে পাঠাবেন? দিন না। তাহলে তো খুবই ভাল। ধন্যবাদ। হ্যাঁ হ্যাঁ। পুরনো লোকই পাঠান। ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ।"

ভদ্রমহিলা ফোন শেষ করে ছেলেটিকে একটি আদরের ধমক দিলেন। "দেখবে, এইবার মজা। মাস্টার মশাই আসছেন, মেরে ঠাণ্ডা করে দেবেন।"

ছেলেটিকে দেখে ইস্তক, আমার এক পুরানো কথা মনে পড়ছিল। জ্যাকব মিত্তির বলে এমনি একটা ছেলের কাহিনী। মানসিক অসন্তোষে অতি ধারাল একটি ছেলে কেমন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

তখন লালমণিরহাটে থাকতুম। পাশের কোয়ার্টারে থাকত এক ক্রীশ্চান দম্পতি। জ্যাকব তাদের একমাত্র সন্তান, জ্যাকবের বাবা ছিলেন লোকো শেডের এক চার্জম্যান, মা করতেন মেয়ে ইস্কুলে মাস্টারী। এক মাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, ডাগর চোখ, মোটা মোটা হাত-পা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছেলেটাকে ভালই লাগত। আয়ার সঙ্গে যেতে যেতে আমাকে দেখতে পেয়ে

কতদিন যে ঝাঁপিয়ে কোলে উঠেছে, তার হিসেব নেই। তবে আমার চেয়েও জ্যাকব বেশী ন্যাওটা ছিল রেলের ছোকরা মাদ্রাজী ডাক্তার আয়েঙ্গারের।

সে এক অপূর্ব যোগাযোগ। আয়েঙ্গার ডাক্তার হলে কি হবে, জাতে মাদ্রাজী বামুন। বড্ড ছোঁয়াছুয়ি বাঁচিয়ে চলত। কিন্তু এই ক্রীশ্চান শিশুটি তার মধ্যে যে কি দেখেছিল কে জানে! দিনের পর দিন দুজনের ব্যবধান কমে যেতে লাগল। সেই বন্য স্নেহের আকর্ষণে ছোঁয়াছুয়ির প্রাচীরটা কোথায় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

ঠাট্টা করে বলতুম, "ডাক্তার, শয়তানটা তোমার বারটা বাজালে।"

ডাক্তার অসহায়ের মত জবাব দিত, "কাণ্ট হেল্প।"

এমন সময় জ্যাকবের একদিন কলেরা হল। আয়াটা বাজার থেকে ওকে কি যেন কিনে খাইয়েছিল। আর তাতেই এই বিপর্যয়। ডাক্তার আয়েঙ্গারের সে একটা মূর্তি দেখেছিলুম। এখনো স্পষ্ট মনে আছে। তিনটে দিন, চব্বিশ ঘণ্টা জ্যাকবের কাছে পড়ে রইল। আয়েঙ্গার ছাড়া আর কারো সাধ্য ছিল না সেবার জ্যাকবকে বাঁচায়। জ্যাকব বাঁচল। কিন্তু মারা গেল, ওর বাবা, ওই কলেরাতেই। তাঁকে বাঁচান গেল না।

এর পর থেকে জ্যাকব আয়েঙ্গারকে আরো আঁকড়ে ধরলে। তবে সামান্য অসুবিধাও দেখা দিল। নতুন চার্জম্যান বহাল হলে জ্যাকবের মা কোয়ার্টার ছেড়ে দিয়ে বাসা নিলেন ইস্কুলের কোয়ার্টারে। পোস্টাফিসের কাছে। আধ মাইল দূরে চলে গেলেন। জ্যাকব আয়েঙ্গারকে ছাড়া থাকতে পারে না। আয়েঙ্গারও না। কাজেই ওর মাকে রোজ এতটা রাস্তা দু-তিনবার করে টান পাড়াপাড়ি করতে হতো। আয়েঙ্গারও যেত দু-তিনবার। তবু জ্যাকবের বায়না মিটত না। এমনি এক বছর কাটল। আমি লালমণিরহাট ছেড়ে ততদিনে ডেরা বেঁধেছি দোমোহানিতে।

হঠাৎ একদিন আয়েঙ্গারের চিঠি পেলাম। তার সঙ্গে জ্যাকবের মার বিয়ে। আমাকে যেতে লিখেছে। মনে মনে হাসলাম, ব্যাটা ছয় বছরের বিচ্ছুটার ক্ষমতা দেখে। অঘটন ঘটিয়ে ছাড়লে। মাদ্রাজী ডাক্তারের বামনাই ওই কচি হাতের এক তুড়িতে কোথায় উড়ে গেল। ওদের অভিনন্দন জানালাম। যেতে না পেরে দুঃখ প্রকাশ করলাম। আর যথাসাধ্য কিছু উপহার পাঠালাম। ঠাট্টা করে লিখলাম, জ্যাকব খুব কেরামতি দেখালে। ঈশ্বর তাকে দীর্ঘজীবী করুন।

এর প্রায় বছরখানেক বাদে সৈয়দপুরে হঠাৎ আয়েঙ্গারের সঙ্গে দেখা। জলপাইগুড়ি যাচ্ছিলাম। উঁকি মারতেই প্ল্যাটফরমের উপর দেখি আয়েঙ্গার। বিষণ্ণ মনে পায়চারি করছে।

ডাক দিলাম, "আরে, আয়েঙ্গার।"

আয়েঙ্গার দেখল। ওর বিষণ্ণ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হ্যাল্লো বলে গাড়ির কাছে এগিয়ে এল।

প্রথম প্রশ্নই করলাম, "জ্যাকব কেমন আছে।"

আয়েঙ্গার গম্ভীর হয়ে গেল।

বলল, "ও রাস্কেলটার কথা আর তুলো না। আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। কি করে যে ওর হাত থেকে রেহাই পাই, এখন আমার দিনরাতের ভাবনা তাই।"

বলে কি! আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম আয়েঙ্গারের কথা শুনে। ঠাট্টা করছে নাকি! কিন্তু ওর মুখে চোখে কোথাও পরিহাসের বিন্দু পরিমাণ পরিচয় নেই। আয়েঙ্গার হয়ত আমার মনোভাব বুঝল।

বলল, "কল্পনা করতে পারবে না ভাই, কি দুর্বিষহ জীবন যাপন করছি। ওই ক্ষুদে শয়তানটা আমার সুখ-শান্তি সব বরবাদ করে দিয়েছে। আমার স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিতে চায়।"

সেদিন সময় ছিল না। আর কিছু জানতে পারিনি। তবে ক্রমে ক্রমে জেনে নিয়েছিলুম। আয়েঙ্গারের সঙ্গে আরেকবার দেখা হয়েছিল, এই বিষয়ে আমাদের দুজনের মধ্যে পত্রালাপও কিছু হয়েছিল। আর জ্যাকব একবার পালিয়ে এসে আমার কাছে ছিল। দুদিন পরে আবার কোথায় পালাল। এই ছেলেটির মুখে যেরকম ভাবের খেলা দেখলাম, সেদিন জ্যাকবের মুখে অবিকল সেই ভাব প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

জ্যাকব বলেছিল, "কাকাবাবু, আমাকে একটা কাজ দেখে দাও। চাকরী করব।"

"সাত-আট বছরের ছেলে চাকরী করবি কি করে? কেন, বাড়ি ভাল লাগে না?"

জ্যাকব বলল, "জীবনে আর আয়েঙ্গারের বাড়ি ফিরব না।"

বলেছিলাম, "আয়েঙ্গারের বাড়ি কি রে বোকা। আয়েঙ্গার তো তোরই বাবা।"

ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মত জ্যাকব লাফিয়ে উঠল। ওই ডাগর চোখ দুটোর মধ্যে এত আগুন কি করে রেখেছিল, ভাবলে অবাক হই।

জ্যাকব মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলেছিল, "না-না, ও আমার বাবা নয়, ও তো আয়েঙ্গার, একটা বদমায়েস। আমার বাবা তো গ্রেহ্যাম মিত্র, মারা গেছে। তারপর ওই রাস্কেলটা এসে আমার মাকেও কেড়ে নিয়েছে।"

তারপর ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। বলল, "মা-ও ওর দলে। মা

আর আমাকে দেখতে পারে না। গালি দেয়। বোর্ডিংয়ে রেখে দিতে চায়। আমি আর বাঁচতে চাইনে। যার কেউ নেই, কিছু নেই, তার বেঁচে থেকে আর লাভ কি বল? আমিও একদিন মরব। রেলের তলে গলা দিয়ে মরব।"

বললাম, "ছি বাবা, ও সব বলে না। তুমি বরঞ্চ আমার কাছে থাক।"

জ্যাকব তক্ষুণি রাজী হল। দুদিন বেশ থাকল। তারপর হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে গেল।

সেই সব কথাই ভাবছিলাম। এই ছেলেটিকে দেখে, এর মুখ চোখের ভাবে কেন জানিনে জ্যাকবের কথাই মনে পড়ছিল। সাউথ সুবার্বন ইস্কুল থেকে একজন মাস্টার মশাই এলেন। রোগা চেহারা। ছেলেটি তাঁকে চিনল। মাস্টার মশাই কথাবার্তা বলতে বলতে বের করলেন, ক্লাস ফোরে নয়, দু বছর আগে ক্লাস টুতে ছেলেটি পড়ত।

ছেলেটি বলল, "মনে নেই স্যার, আমার মা একদিন আপনার কাছে নিয়ে গিয়েছিল।"

মাস্টার মশাই-এর চোখ জ্বলে উঠল, "ও হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। ঠিক, ঠিক তো। তোকে ইস্কুলে দিয়ে গিয়েছিলেন বটে তোর মা। তা সে তো বাপু দু বছর আগেকার কথা।"

তারপর মাস্টার মশাই ইস্কুলে ফোন করে, দু বছর আগেকার ক্লাস টু-এর রেজিস্টার বই থেকে ছেলেটির নাম-ঠিকানা বের করলেন। বাবার নামও পাওয়া গেল। সুব্রত দত্ত।

সত্যনারায়ণ ফোঁস করে উঠল, "ও আমার বাবা নয়, আমার বাবা তো নিশিকান্ত দত্ত, মারা গেছে এরোপ্লেন থেকে পড়ে। ও তো আমার কাকা। বদমায়েস, আমাকে মার কাছে যেতে দেয় না। আমি ওর বাড়িতে যাব না। আমি এখানে থাকব। না হয় জেলেই থাকব।"

অনুনয়ে ছেলেটির গলা ভেঙে এল। আর দু চোখে অভিমানের অশ্রু টল টল করতে লাগল।

॥ দশ ॥

মিনুর সঙ্গে এতদিন পরে, এখানে, এমনভাবে দেখা হয়ে যাবে, ভাবিনি। বালীগঞ্জে রাগ-সংগীতের জলসা হচ্ছিল। শেষের দিন প্রোগ্রাম ছিল ভাল। ভিড়ও প্রচুর হয়েছে। প্রেসের লোকেদের জন্য যে জায়গাটুকু বরাদ্দ ছিল, সেখানে অবিদ লোক ধাওয়া করেছে। গঙ্গুবাঈ পর পর দুখানা খেয়াল শেষ করে, আবার আরেকখানা ধরলেন 'বাহার'-এ। সমস্ত আবহাওয়া দুলে উঠল। সংগীতের মধ্যে ডুবে গিয়েছিলুম। পর পর তিন রাত্রি জাগরণ চলছে, তাই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লুম। আহা, কি অপরূপ সংগীত। তন্দ্রার ঘোরে মনে হ'ল সুরের সাগরে আমি যেন ভাসমান এক পদ্মকলি। হঠাৎ কে যেন খোঁচা মারল পিঠে। বিরক্ত হয়ে পিছনে চাইলুম, দেখি ব্যাজ আঁটা এক ভলাণ্টিয়ার।

ফিস ফিস বলল, "আপনাকে এক মহিলা অনেকক্ষণ ধরে ডাকছেন। বাইরে, চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে আছেন।"

কে আবার ডাকছে! মহা বিরক্ত হয়ে উঠে পড়লুম।

কিন্তু মিনুকে দেখে বিরক্তি জল হয়ে গেল। এ ক'বছরেই মিনুর বেশ পরিবর্তন হয়েছে তো। আমি বছর চারেক আগে ওকে তো দেখেছি, সেই সময়েই ওদের সঙ্গে পরিচয় হয়, তখন ও এত সুন্দর ছিল না। রংটা ফর্সা ছিল, কিন্তু দেহটা ছিল ঢোসকা। বড়লোকের মেয়ে, অতি আদরে লালিত পালিত হলে যা হয়। এখন মেদ কিছু ঝরে গিয়ে দেহের বাঁধুনি সুন্দর হয়েছে, তার চেয়েও বড় কথা, ওর মুখে চোখে সন্তোষের ছাপ পড়েছে।

আমাকে দেখে হাসল। পাশে একটা গরম র‍্যাপার গায়ে জড়ান ভদ্রলোক শান্তশিষ্টভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন, মিনুর স্বামী, নমস্কার করলেন।

মিনু বলল, "বাবা বাবা, কি গানই শুনছেন! ঠায় এখানে কুড়ি মিনিট দাঁড়িয়ে। পা ব্যথা হয়ে গেল। ওগো, চা আনো এবার।"

মিনুর গলায় বেশ কর্তৃত্বের সুর ফুটে উঠল। ভদ্রলোক চা আনতে গেলেন।

মিনু বলল, "খুব তো মাথা নাড়ছেন দেখলুম। তাল-টাল বোঝেন কিছু?"

বললুম, "মিনু, আমার তো একটাই তাল।"

"কি সে তাল, শুনি।"

বললুম, "কেন, ফাঁকতাল।"

মিনু খিল খিল করে হেসে উঠল। ওর স্বামী চা নিয়ে এলেন।

মিনু বলল, "ওগো শুনছ, দাদাটির কথা, উনি নাকি ফাঁকতালে মাথা নাড়েন।"

বললুম, "শুধু মাথা নাড়া নয়, হাত-পা গা, সবই নাড়াই ওই তালে। পৃথিবীতে আমার সম্বল ওই ফাঁকতালটি।"

ভদ্রলোক স্বভাবত গম্ভীর, শান্ত প্রকৃতির। আমার বলার ধরনে উনিও হেসে ফেললেন।

মিনু বলল, "দেখা যখন হয়েছে, আজ ছাড়ছিনে, কাছেই বাসা। গান শেষ হলে নিয়ে যাব।"

মিনুর আগ্রহ দেখে আর না করতে পারলুম না। যেতেই হল। হিন্দুস্থান রোডে, একটা গ্যারেজের উপর ওরা থাকে। ঘর একখানাই, তবে বেশ বড়। বারান্দা মতন একটু আছে, সেখানে রান্না করে। কিন্তু খুব ছিমছাম করে রেখেছে ঘরখানা। আসবাবের বাহুল্য নেই। গোটা তিনেক ট্রাঙ্ক, একটা তক্তপোষ, একটা আলনা, একটা বই-এর শেল্ফ। একটি টিপয় আর বেতের একখানি ইজিচেয়ার। দরজা, জানালায় সুন্দর পর্দা ঝোলান, বিছানায় কি চমৎকার একখানি চাদর বিছান। ঘরে ঢুকতেই রজনী-গন্ধার মৃদু গন্ধ নাকে লাগল। সারা রাত জাগার পর চোখজ্বলা ভোরে মিনুদের ঘরের শ্রীটি বড় মিষ্টি লাগল। সংসারটা মিনু যে খুব সুখেই করছে, তা ওকে আর বোঝাতে হ'ল না।

আমি ওদের খাটে গিয়ে বসলুম। মিনু ওর ছেলেকে ওই বাড়িরই এক ঘরে কার কাছে যেন শুইয়ে রেখে গিয়েছিল, আনতে গেল। আর ওর স্বামীটি গেলেন উনুন ধরাতে। ভাব দেখে মনে হ'ল, এটি ও'র নিত্যকর্ম। এই স্বল্পবাক্, শান্ত ছেলেটিকে প্রথম যখন মিনুদের বাড়িতে দেখি, তখনই ভাল লেগেছিল। সেই ছেলেটি যে এত কাণ্ড করবে, সেদিন তো ভাবতেই পারিনি।

সেই সব পুরোনো কথাই ভাবছিলুম।

শরীরটা খারাপ হয়েছিল বলে রাঁচীতে গিয়েছিলুম চেঞ্জে। এক বন্ধুর সঙ্গেই গিয়েছিলুম। ওর বাবা-মা তখন রাঁচীতেই থাকতেন। এমন একটি মহৎ পরিবারের পোষ্য হওয়া পরম ভাগ্য। আমি স্বভাবজ ভবঘুরে। বহু লোকের সঙ্গে মিশেছি, কিন্তু এত ভাল লোকের সঙ্গে আর বেশী মিশেছি

কিনা সন্দেহ। এত যত্ন, এত আদর, এত স্নেহ এই হতভাগ্যকে তাঁরা করেছেন, যা স্মৃতিপটে সর্বদা ভেসে থাকে।

আমি কুঁড়ে, আমার বন্ধুটি তস্য কুঁড়ে। কেউই আর বিছানা ছেড়ে উঠিনে। দিব্যি সুখে আছি। অকস্মাৎ একদিন মিনুর মা এসে হাজির। এ বাড়ির সঙ্গে ওঁদের বিলক্ষণ যোগাযোগ আছে। শুধু এ বাড়িরই নয়, সাধারণ মধ্যবিত্তের এমন কোনও বাড়ি রাঁচীতে নেই, যেখানে মিসেস চ্যাটার্জির মানে মিনুর মার গতায়াত নেই।

মিনুর বাবা, মিঃ এস্ ডি চ্যাটার্জি, বিরাট বড়লোক, অভ্রের খনির মালিক। কিন্তু শুনলুম, সাধারণ ধনীদের মত নাকি তাঁর চালচলন নয়। অতি সাদাসিধে ভাবে থাকেন। আর গরীবদের প্রতি ওঁদের খুব টান। ইচ্ছে করলেই অভিজাত মহল্লায় সাতখানা বাড়ি হাঁকড়াতে পারেন। আছেও দু-তিনখানা বাড়ি। কিন্তু সেগুলো ভাড়া দেওয়া। ওঁরা থাকেন গরীব মহল্লায়। ওঁরা বলেন, এই মূর্খ ভারতবাসী, এই দরিদ্র ভারতবাসী, এরাই আমার ভাই।

সত্যি, কি সুন্দর বাড়িখানা ওঁদের। বিরাট তিনতলা বাড়ি। সামনে সুন্দর ফুলের বাগান। রাঁচীর টান মাটিতে ফুলবাগান করা শুধু প্রচুর খরচই নয়, হাঙ্গামাও ঢের। দশটা মালীই ছিল ওঁদের। আর তাঁদের খবরদারী করত এই ছেলেটি, এখন যে মিনুর স্বামী।

চারদিকে খোলার বাড়ি থাকায় বাড়িটার কিছু সৌন্দর্যহানি হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই, আর তা ওঁরা জানতেন। কোনও বড়লোকের স্ত্রী কারো বাড়িতে স্বামী কিশোরানন্দের 'নিষ্কাম ধর্ম ও গার্হস্থ্যজীবন' সম্পর্কে বক্তৃতা শুনতে শুনতে যদি সে কথাটা তুলতেন, তো মিসেস চ্যাটার্জি মধুর হেসে বলতেন, "অন্যখানে কি আর বাড়ি তুলতে পারতুম না দিদি। এ পাড়ায় বাড়ি তুলতে খরচ তো কম করিনি, লক্ষ টাকার উপর বেরিয়ে গেছে। ও খরচায় রাঁচীর যেখানে খুশী বাড়ি তুলতে পারতুম। কিন্তু আমরা তা চাইনি! আমরা গরীবের সঙ্গেই থাকতে চাই। ওদের সুখ-দুঃখের ভাগী হতে চাই। ওদের যে কত অভাব, তা যদি দেখতে দিদি। কি সব বাড়িতে থাকে! শুনলে অবাক হবে, এমন অনেক বাড়ি আছে, যাতে একটা বাথরুম পর্যন্ত নেই। অনবরত দেখছি তো। বড় কষ্ট হয় ভাই। দেখে থাকতে পারিনে, তাই সাধ্যমত করি। মাস মাস পাঁচ ছ'শ টাকা এই কাজে বেরিয়ে যাচ্ছে।"

শুনে সবাই ধন্য ধন্য করেন। আত্মপ্রসাদে মিসেস চ্যাটার্জির মুখখানা উজ্জ্বল হয়, আরো সুন্দর দেখায়।

রাঁচী এসে ইস্তক ভদ্রমহিলার কথা সর্বত্র শুনছি। দেখা হ'তে খুশী

হলাম। বেশ সাদাসিধে। পরনে একখানা লালপেড়ে গরদের শাড়ি। হাতে মুক্তাখচিত দুগাছা রুলি। আর কানে টাব। তাতে চকচক করছে দুটো দ্যুতিময় হীরে। ও দুটোরও একটা ইতিহাস আছে। মিসেস চ্যাটার্জি আমার বন্ধুর মাকে একদিন বলছিলেন, আমরা সেই সময় শুনে ফেলেছি।

মিস্টার চ্যাটার্জি'র এক মারোয়াড়ী বন্ধু বিশেষ বিপদে পড়ে একবার ওঁর কাছে আসে এই দুটো কমল হীরে নিয়ে। এ নাকি ওদের পারিবারিক সম্পদ, হাতছাড়া করবার নয়। নিতান্ত দায়ে পড়েই ও দুটো বন্ধক রাখতে এসেছে। বাজারের দাম ত্রিশ হাজার, কিন্তু তাঁর দরকার পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা।

মিসেস চ্যাটার্জি বললেন, "তা দিদি বলব কি, উনি এককথায় টাকা দিয়ে দিলেন। হীরেজোড়াও রাখতে চাননি। উনি বলেন, মানুষের বিপদে আপদে সাহায্যই যদি না করব তো টাকা-পয়সা রোজগার করছি কেন? মাড়োয়ারীটা যদি জোর করে হীরেজোড়া গছিয়ে না দিত তো উনি কিছুতেই নিতে পারতেন না। ওঁর মন এমনই নরম।"

বলেই আরেকটা ঘটনা বললেন। মিস্টার চ্যাটার্জি'র খুবই কুকুর পোষার সখ। একবার প্রায় দুই হাজার টাকা দিয়ে একটা খুব ভাল জাতের কুকুর আনলেন ফ্রান্স থেকে। সে কুকুর নাকি এখানে পাওয়া যায় না।

মিসেস চ্যাটার্জি বললেন, "বলব কি দিদি, সেই কুকুরের পিছনে মাস মাস তিন-চারশ' টাকা বেরিয়ে যেতে লাগল। একদিন ওঁকে বললুম, দ্যাখ, পাড়ার মেয়েরা ধরেছে একটা দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র খুলবে, কিছু টাকা চাঁদা দিও তো। দিদি, বলব কি, এমন সরল লোক ও, জানেই না যে, এমন গরীব লোকও পৃথিবীতে আছে, যাদের ছেলেরা দুধ খেতে পায় না। শুনে তো অবাক। বললে, বল তো কি অন্যায়। আর আমরা বড়লোকরা কত টাকা-পয়সা বৃথাই নষ্ট করছি। কুকুরটা কালই বিলিয়ে দাও। দিয়ে, কুকুরের খরচটা তোমার দুগ্ধ কেন্দ্রের চাঁদা হিসেবে দিয়ে দাও। ওঁর প্রশ্রয় পেয়েছি বলেই না এমন দান ধ্যান অক্লেশে করতে পারছি।"

মিসেস চ্যাটার্জিকে আমার মন্দ লাগেনি। তবে মিনুকে তার চেয়েও ভাল লাগল। ও আবার আমার বন্ধুর বোনের ক্লাসফ্রেণ্ড। সেই সূত্রে কয়েকদিন এল এ বাসায়। তখন ওর সঙ্গে বিশেষ আলাপ টালাপ হয়নি। হ'ল কয়েকদিন পরে। ওঁর মা এসে নেমন্তন্ন করে গেলেন, মিনুর গান শুনতে।

বন্ধুটি গেল না, তার সেণ্টিমেণ্টের বালাই নেই, সাফ বলে দিলে, সে ওসব পছন্দ করে না। বাড়িতে দুটি মাত্র যুবক, তার মধ্যে একজনও যদি

প্রতিনিধিত্ব না করে, তবে কি কোনও অনূঢ়া মেয়ের গান জমে? তাই অপেক্ষাকৃত দুর্বল আমি, আমাকেই যেতে হ'ল, গানের তারিফ করতে হ'ল। তবুও বন্ধুভাগ্যে ঈর্ষিত হলাম। খাওয়া-দাওয়াটা বেশ হ'ল।

ফিরে আসছি, শুনলুম মিনু যেন কাকে বলছে, "কি, তুমি যে গান শুনতে এলে না?"

চেয়ে দেখি, সেই প্রথম দেখলুম, মিনুর স্বামীকে। তেমনি শান্ত-শিষ্ট ছেলেটি।

ধীরভাবে বলল, "আমার ভাল লাগে না।"

"ভাল লাগে না? গান ভাল লাগে না?"

ছেলেটি জবাব দিল, "গান কেন ভাল লাগবে না? তবে সত্যি কথা বলি, মিনু, তুমি আর কাউকে গান শুনিও না। তোমার গানের বোধ আছে, কিন্তু গলা নেই। মাসিমা তো এটা বোঝেন না।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

ছেলেটি বলল, "রাগ করলে?"

তার স্বরে স্নেহ ঝরে পড়ল।

মিনু বলল, "না। তোমার কথাই ঠিক, আর গাইব না।"

ওদের সামনে পড়ে যেতে দুজনেই চমকে উঠল। দেখলুম মিনুর চোখে জল।

মিসেস চ্যাটার্জি আমাদের দেখে বললেন, "এই যে, এখানে কি হচ্ছে?"

বললাম, "গান সম্পর্কে একটু আলাপ করছিলুম।"

তিনি খুশী হলেন। কলকাতার এক বিখ্যাত গাইয়ের নাম করে বললেন, "মাসে উনি দুবার আসেন মিনুকে গান শেখাতে। বেশ গায়, কি বল।"

মাথা নাড়লুম শুধু।

মিসেস চ্যাটার্জি আলাপ করিয়ে দিলেন ছেলেটির সঙ্গে, বললেন, "আমাদেরই আশ্রিত। বড় ভাল ছেলে বাবা, একেবারে ছেলের মত। আচ্ছা আলাপ কর। আমি চলি।"

আমাদের কলকাতায় চলে আসবার সময় হ'ল। এমন সময় মিসেস চ্যাটার্জি আবার নেমন্তন্ন করলেন। মিনুর জন্মদিন, কলকাতা থেকে মিস্টার চ্যাটার্জির কয়েকজন বন্ধুপুত্র এসেছেন। সেই উপলক্ষে একটা ডিনার দিচ্ছেন রাত্রে। সকালে গরীবদের মধ্যে সাতাশ সের দুধ বিতরণ করছেন মেয়ের কল্যাণ কামনায়। অনেকদিন পরে মিস্টার চ্যাটার্জির বাড়িতে

খুব ধুমধাম হচ্ছে। ঠিক দু বছর আগে মিনুর দিদির বিয়ের আগে এরকম একটা জমজমাট পার্টি দিয়েছিলেন। সেই পার্টিতে নিমন্ত্রিত এক তরুণ 'ডি ভি সি'র ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গেই মিনুর দিদির বিয়ে হয়েছিল।

বন্ধুটি যথারীতি আবার ডুব মারলেন। এবং যথারীতি আমিই আবার গেলুম নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। উদ্দেশ্যটা বুঝেছিলুম ডিনারের। কিন্তু একটা ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে গেলুম। প্রায় গোটা পনের ছেলে বেশ কায়দাদুরস্ত পোষাক আসাক পরে মিসেস চ্যাটার্জির পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মিনুর কাছাকাছিও কেউ ঘেঁষছে না। যদিও বা সামনে পড়ে যাচ্ছে, অমনি একটু কাষ্ঠ আলাপ করে 'মাসিমা'র কাছে সরে যাচ্ছে। ওরা অত মাসিমা মাসিমা করছে কেন?

মিনু আমার কাছে এসে বসল। একটু বোকা বনে গেছে মনে হ'ল। একটু হাসল ছেলেগুলোর দিকে চেয়ে।

তারপর বলল, "আপনাকে পেয়ে বাঁচলুম। নইলে তো দম বন্ধ হয়ে যেত। আসুন একটু গল্প করি।"

অনেক খবর পেলাম ওর কাছ থেকে। ওরা দু বোন, দুই ভাই। ও ছাড়া আর সকলের বিয়ে হয়ে গেছে। 'সেই ছেলের মত' ছেলেটির নাম জ্যোতিষ। দুটো বড় গরু আছে ওদের। এক একটা গরু সতের সের দুধ দেয়। জ্যোতিষ লেখাপড়ায় খুব ভাল, আর ছ্যাবলা নয় মোটে। মিনুর বি-এ পরীক্ষাটা আর দেওয়া হয়ে উঠবে না। ওর শরীর মোটে ভাল নয়। কোনও কাজে মন লাগে না। কত ওষুধ, কত ডাক্তার, কিন্তু কিছুতেই রোগ সারছে না। জ্যোতিষ বলে, এ আলস্য রোগ। খুব খাটলে নাকি ও রোগ একেবারে সেরে যাবে।

"ও বেজায় ঠাট্টা করে আমাকে। কিন্তু আপনিই বলুন," মিনু বললে, "এ বাড়িতে কি খাটবার কোনও সুযোগ আছে আমার?"

মিনু মেয়েটার কথায় খুব আন্তরিকতা ফুটে উঠেছিল সেদিন। সে আন্তরিকতার ছোঁয়া আমাতে লেগেছিল। একটি মেয়ে পরিশ্রম করতে চায়, নিছক শারীরিক শ্রম, অথচ তার সুযোগ পাচ্ছে না। ব্যাপারটা আমার কাছে অদ্ভুত লেগেছিল।

দেখলুম, সে সুযোগ মিনু আজ পেয়েছে। নিজের শ্রমে নিজের সংসার গড়ে তুলেছে, তাই খুশীতে তৃপ্তিতে সে ভরপুর হয়ে আছে। তার কৃতিত্ব দেখাতে চায় কাউকে, এমন কাউকে যে তাদের ইতিহাস জানে। তাই আমাকে পেয়ে তার খুশির অন্ত নেই।

ছেলেটিকে আমার কাছে রেখে ও খাবার করতে বসল। কি সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটি। আমি ওর সঙ্গে খেলা করতে লাগলুম। স্বামীটি বাজার করে নিয়ে এলেন। মিনু প্রচুর রান্না করল আর সেদিনের মত অনেক গল্প করল। ওরা পালিয়ে এসে বিয়ে করেছে। জ্যোতিষ আর ও দুজনেই চাকরি করছে। ও ডেড্‌লেটার আপিসে আর জ্যোতিষ রেল অ্যাকাউণ্টস্-এ।

জিজ্ঞাসা করলুম, "মিনু, তোমার অসুখ সেরেছে?"

মিনু একটু অবাক হ'ল, অসুখ!

"ও হ্যাঁ," মনে পড়ল তার, "কি দুষ্টু আপনি। সে কথা এখনও মনে রেখেছেন?"

তারপর হেসে ফেলল, বলল, "হ্যাঁ, একদম সেরে গেছে। খুব পরিশ্রম করছি দাদা। ও শুধু উনুনটা ধরায়। কিছুতেই আমাকে ধোঁয়ার কাছে যেতে দেয় না।"

বললুম, "তোমাকে ধোঁয়ার থেকে উদ্ধার করেছে কি না—"

মিনু বাধা দিয়ে বলল, "ওমা ভয়ানক ইয়ে তো আপনি।"

লজ্জায় ওঁর মুখ রাঙা হয়ে গেল।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলুম, "মাসিমা তোমাদের খোঁজখবর নেন?"

মিনু হেসে ফেলল, বলল, "ও বাব্বা, এর পরেও। ওঁর বোন্‌পো-গুলোর কাছে কি আর ওঁর মুখ আছে। তাছাড়া—"

"তাছাড়া, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী ওঁদের ভাই হ'তে পারে", জ্যোতিষবাবু ঘরের ভিতর ঢুকতে ঢুকতে বললেন, "তা বলে সাক্ষাৎ জামাই—এ কি সহ্য করা যায়। সেজন্যে চাই আই এ এস কি ডি ভি সি'র ইঞ্জিনীয়ার।"

জ্যোতিষের বলার ধরনে আমি আর মিনু হো-হো করে হেসে উঠলুম। হঠাৎ মিনুর ছেলেটাও বিরাট মজা পেয়ে হাততালি দিয়ে হ্যা হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগল।

॥ এগার ॥

লর্ড গার্লিংটন সাহেব নন, বাঙালী। জানিনে, এ নাম তাকে কে দিয়েছিল, সন্দেহ করি পাড়ার ছেলেরা। তবে এ নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন। এ পাড়ায় প্রথম যেদিন আসি, সেইদিনই তাঁর সঙ্গে দেখা। রোয়াকে বসে, কলাই-করা বাটিতে করে চা খাচ্ছিলেন, সে এক হেমন্তের রোদ-ঝরা সকালে, বছর দুই আগে। মালপত্র বোঝাই ঠ্যালার পিছু পিছু সেই গলিতে ঢুকতেই তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা।

মুখ তুলে দেখলেন। স্মিত হাসলেন।

বললেন, "সাতের-বি তে বুঝি?"

বলতে গেলুম, "আজ্ঞে না। তের'র—"

বাধা দিলেন, "বুঝেছি। ভূপেনের দোতলায়। বেশ। তা ব্যাচেলার?"

সায় দিলুম। চায়ের বাটি রেখে উঠে এলেন। তারপর পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও বারণ মানলেন না, ঠ্যালাঅলাকে বকাঝকা করে মাল নামিয়ে জিনিসপত্র গোছগাছ করে দিয়ে গেলেন।

পরদিন অফিস যাবার পথে আবার দেখা। গলির মোড়ে একটা চিল্‌ড্রেন্‌স্‌ পার্ক, সেইখানে। নিবিষ্ট মনে কি যেন খুঁটে খুঁটে মাঠ থেকে তুলে ফেলছেন। ও'র তন্ময়তা দেখে না ডেকেই চলে যাচ্ছিলাম।

ডাক দিলেন, "শোন। অফিস যাচ্ছ?"

ঘাড় নাড়লুম।

বললেন, "দেখেছ কাণ্ড।"

একটা সেফটিপিন্‌ দেখালেন।

"ইস্‌। কি মারাত্মক ব্যাপার বল দিকিনি। ছেলেরা খেলে এখানে। পায়ে ফুটে তো রক্তারক্তি হয়ে যেতে পারে? কি ধর, যদি গিলে ফেলে কেউ? তৎক্ষণাৎ মৃত্যু।"

কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে ভাবলেন। তারপর বললেন, "উদ্দেশ্যটা পায়ে ফোটানো নয়, সেফটিপিনটা তাহলে খুলে রেখে যেত। এ আরো সিরিয়স। ওর উদ্দেশ্য ছিল, পিনটা গিলিয়ে দেওয়া। নইলে এমন নতুন একটা পিন রেখে গেছে। কি রকম চকচক করছে দেখছ। ছেলেদের কারোর নজরে পড়বে কি আর দেখতে হবে না, টপ করে একেবারে মুখে। একেবারে

পরিষ্কার উদ্দেশ্য। তোমাকে ডাকলুম সাক্ষী রাখবার জন্য। আচ্ছা যাও।"

কথাবার্তার ধরনে কেমন যেন মনে হ'ল। বুঝতে পারলুম, সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই। পাড়ার ছেলেরা বক্সিং নিয়ে মেতে উঠল। ফোর্ট উইলিয়মে আন্তর্জাতিক মুষ্টিযুদ্ধের একটা প্রতিযোগিতা কিছুদিন আগেই হৈ হৈ করে হয়ে গেল। ভারতবর্ষ তার মধ্যে কোনও স্থানই করতে পারলে না। একদিন আমিও হুজুগে পড়ে দেখে এলাম। ভারতের খেলোয়াড়রা দাঁড়াতেই পারলে না। গো-হারা হেরে গেল। হারের জন্য নয়, খেলার ধরনটাই আমার মোটে ভাল লাগেনি। পরস্পরের প্রতি হিংস্র ও নিষ্ঠুর আক্রমণের মধ্যে, নির্দয়ভাবে বেধড়ক ঘুঁষি চালানোর মধ্যে যে কি উল্লাস থাকতে পারে, আমি বুঝতে পারিনি। আমার স্নায়ুকে বড্ড পীড়িত করেছিল। যাক, যা বলছিলুম, ছেলেরা কোমর বাঁধল, দেশের দুর্নাম ঘুচাবে বলে। পাড়ায় পাড়ায় ধাঁই ধপাধপ শুরু হ'ল, বক্সিং ক্লাব গজিয়ে উঠল।

পাড়ার মাতব্বরাও উৎসাহ দিতে লাগলেন। কর্পোরেশনের কাউন্সিলার, বিধান সভার সদস্য, মন্ত্রী—ওঁদের মধ্যে প্রতিযোগিতা সুরু হ'ল উদ্বোধন করার ব্যাপারে। খবরের কাগজে ফলাও করে ছবি আর বিবরণী ছাপা হতে লাগল।

এর মধ্যে আশ্চর্যের ব্যাপার দেখলুম, লর্ড গার্লিংটন বক্সিং-এর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগলেন। বক্সিং-এর নাম পর্যন্ত শুনলে ক্ষেপে উঠতেন। খবরের কাগজে চিঠির পর চিঠি ছাড়লেন, 'সর্বনাশা খুনের খেলা'য় দেশের লোককে না মাতাতে। নেতাদের দরজায় ধর্না দিতে লাগলেন। কিন্তু কেউ ওঁর কথায় কর্ণপাত করলে না। উল্টো হাওয়ায় কে আর নৌকো বাইতে চায়?

একমাত্র আমিই ছিলুম তাঁর সমর্থক। অথবা আরো হয়ত ছিল, তবে তাঁরা বোধ হয় আমার মতোই নিষ্ক্রিয়। যখনকার কথা বলছি, লর্ড গার্লিংটনের বয়স তখন পঞ্চান্ন পেরিয়ে গেছে। তবু কি অসাধারণ পরিশ্রমই না করছিলেন। আর সেইজন্যই সমগ্র পাড়ার লোক ওঁর উপর চটে গেল। পাড়ার ছেলেরা পিছনে লাগল। কিন্তু ওঁর তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। ওঁর এক কথা, যে করেই হোক এ 'খুনের খেলা' বন্ধ করতে হবে।

হয়ত বলতুম, "এ নিয়ে কেন এত মাথা ঘামাচ্ছেন। চুপচাপ থাকুন, দুদিনেই হুজুগ বন্ধ হয়ে যাবে।"

উনি ক্ষেপে উঠতেন।

"রক্তের স্বাদ একবার পেলে বাঘকে তুমি থামাতে পারো?"

এদিকে ওঁর একগুঁয়েমি যেমন বেড়ে চলল, তেমনি, যেন ওঁকে জব্দ

করবার জন্যই, হুজুগও বেড়ে উঠল। সারা অঞ্চলটা নিয়ে এক প্রতিযোগিতা ঘোষণা করা হ'ল। আর চিলড্রেন্স পার্কের কোনাটাতেই তোড়জোড় করে একটা বিরাট বক্সিং রিং তৈরী সুরু হল। সারা পাড়া তাই নিয়ে মেতে উঠল।

লর্ড গার্লিংটন শুধু পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘের মত ছটফট করে বেড়াতে লাগলেন। সে যে কি অস্থিরতা, যে না দেখেছে বুঝতে পারবে না। সমস্ত শরীর ওর শীর্ণ হয়ে এল, ভাবনায় ভাবনায়। চোখ দুটো শুধু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। কথাবার্তা বন্ধ করে দিলেন। এমন কি আমার সঙ্গেও বিশেষ বলতেন না। তারপর তাঁকে আর বড় বিশেষ দেখতেও পেতুম না।

অফিসে যাওয়া-আসার পথে দেখতুম ছেলেরা মাটি কুপিয়ে, বাঁশ পুঁতে তাতে লাল নীল কাগজ জড়িয়ে, দড়িদড়া দিয়ে ঘিরে মহোৎসাহে খেলার আগের দিনই রিংটা তৈরী করে ফেললে। বিরাট সামিয়ানা টাঙানো হল। মাইক আসবে। ফ্লাড লাইট বসবে। শুনলুম মেয়র আসবেন সভাপতিত্ব করতে। আমাদের পাড়ার কাউন্সিলার মেয়রকে এ পাড়ার পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন।

প্রতিদিনই নতুন নতুন খবর শুনি। ফোর্ট উইলিয়াম থেকে সাহেব রেফারী আসছে, প্রধান অতিথি হচ্ছেন পুলিশের বড়কর্তা, কোনো এক বিখ্যাত ব্যক্তির স্ত্রী আসছেন পুরস্কার বিতরণ করতে। খবরগুলো একটা একটা করে আসে আর পাড়াটাকে উত্তেজনায় চুবিয়ে রাখে। আশ্চর্য, এত হৈ চৈ-এর মধ্যে লর্ড গার্লিংটনেরই কোনো সাড়াশব্দ নেই। বুড়ো কি তবে মনের দুঃখে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল?

অনুষ্ঠানের আগের রাত্রির কথা বলছি। শহরে হাঙ্গামা চলেছে। তাই ফিরতে রোজই রাত্রি হচ্ছে—দুটো আড়াইটে তো হচ্ছেই। সেদিনও ওই সময়েই প্রায় ফিরছি। বেজায় শীত পড়েছে। আপিসের গাড়ি আমাদের গলিতে ঢোকে না। ঘোরাবার জায়গা নেই বলে। পার্কের কোণে নামিয়ে গাড়িটা ব্যাক করে ঘোরাতেই গাড়ির লাইটের আলো মাঠে পড়ল। একী! এক নজরে যা দেখলুম তাতে আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। অমন সুন্দর রিংটার র-ও আর অবশিষ্ট নেই যে! ভেঙেচুরে ছিঁড়ে খুঁড়ে সব তচনচ। যে এ কাজ করেছে তাকেও মাঠের মধ্যেই দেখলুম। দেখলুম, সেই হাড় কাঁপানো শীতের মধ্যে লর্ড গার্লিংটন মাটি কোপাচ্ছেন। খালি গা, দরদর করে ঘাম ঝরছে, ভ্রূক্ষেপ নেই। আমি যে এগিয়ে গেলুম তাতেও মুখ তুলে চাইলেন না। কোদালের কোপে কোপে রিং-এর মাটি কেটে নামিয়ে দিচ্ছেন।

কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। তাঁর এই কাজ আমার মনঃপূত হ'ল না। সত্যি, পাঁচজনের কাজের, যদি সেটা অন্যায়ও হয়ে থাকে, প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করা, সমালোচনা করা—সে সবের মধ্যে আমি কোনও অন্যায় দেখিনে, কিন্তু এ কী! রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে ক্ষতি করা, এ আমি সমর্থন করতে পারলুম না।

চাপা ধমক দিলুম, "কি হচ্ছে এসব!"

লর্ড গার্লিংটন এবারে মুখ তুলে চাইলেন। চোখ দুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, মুখে সেই স্বল্পালোকিত জ্যোৎস্নায় দেখলুম ক্লান্তির ছাপ পড়েছে। সত্যি, এতই পরিশ্রান্ত হয়েছেন, যে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছেন না। আমার কথার জবাব না দিয়ে চারিদিক একবার ভাল করে চেয়ে নিলেন। ধূলিসাৎ-রিং-টা দেখে মুখে কৃতিত্বের হাসি ফুটে উঠল। সমর্থনের আশায় আমার দিকে চাইলেন।

বললেন, "সাড়ে তিন ঘণ্টায় যথেষ্ট করেছি, কি বল? আড়াইটে বাজে বলে যেন মনে হ'ল। কাল আর খুনের মাতনে মাতা চলবে না বাবুদের। বক্সিং খেলবে! সব খুনের নেশায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে!"

তারপর আমাকে বললেন, "ওই কোনায় জামাগুলো আছে, এনে দাও তো ভাই। কোদাল কোপাতে কোপাতে গরম বোধ করলুম বলে খুলে রেখে-ছিলুম। বড্ড পরিশ্রম হয়েছে আর নড়তে পারছিনে।"

জামা এনে দেওয়াই শুধু নয়, তাঁকে ধরাধরি করে আমার ঘরে এনে ফেললুম। ঠাণ্ডা লেগে গেছে।

বললেন, "গলায় ব্যথা লাগছে। একটু চা কর।" স্টোভ জ্বালিয়ে চা বানালুম।

বললুম, "কাজটা কি ভাল হ'ল? কাল যে পাড়ায় কি কাণ্ড হবে, ভাবতে পারছেন?"

বললেন, "জাহান্নমে যাক। বক্সিংএর নেশা কি তুমি জানোনা, আমি জানি, নিজে একজন ভুক্তভোগী। যার মাথায় বক্সিং একবার ঢুকেছে, তার মনে খুনের নেশাও চেপেছে।"

একটুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। মুখের ভাব মুহূর্তেই বদলে গেল। গলার স্বর ভারী হয়ে এল।

আপন মনে বলে উঠলেন, "একটা রোগীকে খুনই করে ফেললুম। কোথায় তাকে সারিয়ে তুলব, না মেরে ফেললুম, এই হাতের দুটো ঘুষিতে।"

নিজের হাত দুটো আলোয় তুলে ধরে দেখতে লাগলেন। আর প্রাণপণে নিজেকে সামলাতে লাগলেন।

হঠাৎ বলে উঠলেন, "পশু, পশু হয়ে গিয়েছিলুম। তোমার আমার সকলের মধ্যেই এক পশু ঘুমিয়ে আছে। জেগে উঠলেই রক্ত খেতে চাইবে। তাই আমি ভয় পাই, তাই আমি সতর্ক থাকি, পাছে কেউ বুঝি খোঁচা মেরে তাকে জাগিয়ে দেয়। বক্সিং-এ যত সহজে তাকে জাগানো যায়, তত সহজে আর কিছুতে নয়।"

আমার খাটটা ছোট। সেটা ওঁকে ছেড়ে দিলুম। আমি বসলুম ইজি-চেয়ারটায়। বাকী রাতটুকু, না ওঁর না আমার, কারোরই ঘুম এল না। চা খেতে চাইলেন, বার তিনেক চা করলুম। উনি শুয়ে শুয়ে ওঁর কাহিনীটা বললেন। বুঝলুম ক্ষতটা কোথায়।

লর্ড গার্লিংটন কলেজ জীবনে ভাল বক্সার ছিলেন। কলেজ চ্যাম্পিয়ান-শিপ আন্তর্বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ানশিপও তাঁর ছিল। যে বছর ডাক্তারী পাশ করলেন, সেই বছরই ফেদার ওয়েটে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ান হলেন। বক্সিং আর বক্সিং। লর্ড গার্লিংটনের এ ছাড়া আর অন্য ধ্যান কিছু ছিল না। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপের স্বপ্নে মশগুল হয়ে রইলেন। অবস্থা ভাল নয়, প্র্যাকটিশ জমানো শক্ত। তিনি চাকরি খুঁজতে লাগলেন। অবশেষে চাকরি পেলেন, সিঙ্গাপুরে। হলেন উন্মাদ হাসপাতালের সহকারী চিকিৎসক।

চাকরিতে ঢোকবার পর বাস্তবিক পক্ষে আর বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হবার আশা রইল না। তবু চোখ থেকে তা মোছা গেল না। হায় সেটাও যদি মুছে ফেলা যেত!

লর্ড গার্লিংটন বললেন, "এইখানেই স্ট্যানলী ওয়াং-এর সঙ্গে আমার আলাপ। আমি বুঝতেই পারিনি, কেন ওকে উন্মাদ হাসপাতালে রাখা হয়েছে। ছোকরা অ্যাংলো চাইনিজ। ওদের রবারের বাগান আছে। অল্প-দিনের মধ্যেই ওয়াং-এর সঙ্গে আমার জমে গেল। প্রথম কারণ, দুজনেই প্রায় এক বয়সী। আর দ্বিতীয় কারণ, সেইটেই আরো জোরালো, বক্সিং। সেও বক্সিং পাগল। দুজনেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে চ্যাম্পিয়ান হবার স্বপ্নটা ঝাড়পোছ করে আবার চোখে এঁটে নিলুম।

"ব্যাচারা ওয়াং-এর জন্য আমার দুঃখ হ'ত। একটা হীন ষড়যন্ত্রের ফলে সুস্থ হয়েও ওকে পাগলা গারদে থাকতে হয়েছে। বক্সিং জগতে মালয়ে ওর যারা প্রতিদ্বন্দ্বি ছিল, তারা ওকে পাগল প্রতিপন্ন করে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ, খেলতে খেলতে ঘুঁষি মেরে ও দুবার দুজনকে খুন করেছে। ওয়াং জোর দিয়ে বলত, এ অভিযোগ মিথ্যে।

ওয়াং-এর কথা আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতুম। ওর বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রটা হয়েছে, ওর প্রতি যে অবিচার করা হচ্ছে, সেটা আমি একবার সুযোগ পেয়ে আমার মনিবকে বললুম। ডাক্তার ঘোষ বড় কড়া লোক। আমাকে ধমকে বললেন, তোমার অধিকারের বাইরে নাক গলাতে যেও না। যা করছ, করো।

"ডাক্তার ঘোষের ব্যবহারে বড় অপমানিত বোধ করলুম। ওয়াং সম্পর্কে আমার মনে হ'ল, উনি একটু যেন বিদ্বেষের ভাব পোষণ করেন।

"ব্যাচারা ওয়াং। ওর জন্য আমার মনটা ব্যথায় ভরে উঠত। এই প্রাচীর বেষ্টনীর বাইরে যাবার কোনও উপায় ওর নেই। ওর কেসটা আমি দেখেছি। ডাক্তারের রিপোর্টে আছে, মাঝে মাঝে ওর মধ্যে খুনের স্পৃহা জেগে ওঠে। ওয়াংও জানত, ও আর বাইরে যেতে পারবে না। তাই হতাশ হয়ে পড়তে লাগল।

"সিঙ্গাপুরে একটা ভ্রাম্যমাণ বক্সার দল এল। অবসরপ্রাপ্ত কয়েকজন বিশ্ববিজয়ী মুষ্টিযোদ্ধা সেই দলে আছে। ওয়াংকে বললুম, আমি দেখতে যাচ্ছি ওয়াং। ওয়াং ম্লান হেসে বললে, গুডলাক।

"বেশ লাগল। অনেক মারের কায়দা দেখলুম। ও সব মার আমরা জানিইনে। এই সবের জন্যই আমরা পাত্তা পাইনে ওদের কাছে। বক্সিং দেখতে দেখতে ওয়াং-এর ম্লান মুখখানা যতই মনে পড়ছিল, ততই খারাপ লাগছিল।

"রাত দশটা নাগাত ফিরলুম। শোবার আগে হাসপাতালের রসুইখানায় ঢুকলুম এক পেয়ালা কোকো খেতে। বুড়ো বাবুর্চি কোকোর পেয়ালা হাতে দিয়ে বললে, ওয়াং সাহেবের আজ খুন চেপেছে। ওয়ার্ডারকে আর একটু হলে মেরেই ফেলত। ওর উপর খুব বক্সিং চালিয়েছে। সাত নম্বরে ওকে ভরে রাখা হয়েছে।

"শুনেই ছুটলুম সাত নম্বরে। বাজে কথা যত! সাত নম্বর 'সেল' দুর্দান্ত পাগলদের জন্য। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই ভেতরে ঢুকে পড়লুম। ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে ওয়াং আমাকে প্রচণ্ড ধাক্কা মারল। ধাক্কা খেয়ে দরজার উপর পড়ে গেলুম। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। সে দরজা ভেতর থেকে খোলা যায় না। ওয়াং-এর দিকে চেয়ে বুঝলুম, মারাত্মক ভুল করেছি। ওয়াং-এর চেহারাই বদলে গেছে। ওর মুখ চোখ চেহারা সব কিছুই জানিয়ে দিলে ওয়াং এখন একজন উন্মাদ খুনী। বিপদের গুরুত্ব বুঝে, হাত পা ঠান্ডা হয়ে এল। একমাত্র ভরসা, ওয়াং আমার চেয়ে হাল্কা। আর তাছাড়া ঘুষি বিদ্যেটাও আমার ভাল জানা আছে।

"সেই বিপজ্জনক সেলের মধ্যে দুজনের বক্সিং প্রতিযোগিতা সুরু হল।

প্রথমটায় আমি ওয়াংকে কত ডাকলুম। কত বোঝালুম। কিন্তু বৃথা। এ-ওয়াং সে-ওয়াং নয়। তারপর যতক্ষণ সম্ভব আমি আত্মরক্ষা করতে লাললুম। তারপর হঠাৎ ভুলে গেলুম আমি ডাক্তার, ওয়াং রোগী। আমি আর ওয়াং যেন বিশ্ব টাইটেল প্রতিযোগিতার দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। যে অতৃপ্ত বাসনাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলুম, তা জেগে উঠল। ওয়াং আমার সঙ্গে পারবে কেন? ওর কি বুদ্ধি তখন সজাগ আছে? ও তো উন্মাদ। এলোপাতাড়ি ঘুঁষি মারছে। সুযোগ পেতেই একটা 'আপার-কাট' মারলুম ডান হাতের। কড়াক করে শব্দ হ'ল। বুঝলুম ওয়াং-এর চোয়াল ভাঙল। যন্ত্রণায় গর্জন করে ওয়াং সিঁড়ির উপর গড়িয়ে পড়ল। সাফল্যে আমার তখন কি উল্লাস।

"দরজা খোলার শব্দ পেলুম। ওদিকে ওয়াং হিংস্রতম হয়ে উঠেছে। সিঁড়ির উপর থেকে সমস্ত শরীরের ওজন নিয়ে ও ততক্ষণে আমার উপর লাফ দিয়েছে। চকিতে সরে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে একটা 'লেফট' ঝাড়লুম। বাঁহাতের মারে আমার আবার বিশেষ সুনাম ছিল। ঘুঁষিটা পড়ল তল-পেটে। কোঁক করে শব্দ করে ওয়াং ছিটকে পড়ল। আর উঠতে পারলে না।

"তারপর মাত্র দুদিন বেঁচেছিল। শেষ দিন আমাকে বললে, মুখার্জি, আমি তোমাকে আক্রমণ করেছিলুম। ভেরি স্যরি। তখন আমার জ্ঞান ছিল না। তুমি খুব ভাল বক্সার হতে পারবে। তারপর আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে, তুমি ফাউল করেছ মুখার্জি। 'ইউ নকড্‌ বিলো দি বেলট'। কোমরের নীচে মারা বে-আইনী। তবে আমি সে কথা কাউকে বলিনি। ওয়াং হাসতে লাগল। কে বলবে, ও খুনে পাগল!"

লর্ড গার্লিংটনের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। ভোর হয়ে এসেছে। রাত্রে লক্ষ্য করিনি, এখন দেখি ওঁর চোখ মুখ লাল। গলা দিয়ে সাঁই সাঁই আওয়াজ বেরুচ্ছে। বিড়বিড় করে কি বকছেন।

"পশু...পশু...জাগিও না..."

কপালে হাত দিয়ে দেখি, সাংঘাতিক তাপ। খই ফুটছে। কোনোরকমে ওঁকে বাড়ি পৌঁছে দিলুম।

পাড়ায় সে কি হৈ চৈ। বক্সিং রিং কে ভেঙ্গে দিয়েছে। সমস্ত পাড়া খেপে উঠল। আমার ভয় হ'ল, ওরা যদি ঘুনাক্ষরেও টের পায়, এটা লর্ড গার্লিংটনের কীর্তি তো ওঁকে এরা ছিঁড়েই ফেলবে। বক্সিং প্রতিযোগিতা সেদিনের মতো বন্ধ হ'ল বটে, কিন্তু তিন গুণ উৎসাহে তোড়জোড় সুরু হল। আপিসে যাতায়াতের পথে দেখি আরেকটা রিং তৈরী হচ্ছে। এবার ছেলেরা পাহারা বসিয়েছে।

লর্ড গার্লিংটন শয্যাশায়ী। ডবল নিউমোনিয়া। ডাক্তারে আশা ছেড়ে দিয়েছেন। রোজই একবার করে দেখা করতে যাই। খুব খুশী হন।

জিজ্ঞেস করেন, "বক্সিং বন্ধ হয়ে গেছে তো।"

মিথ্যে কথা বলি, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

খুশী হন। বলেন, "বুঝেছে তাহলে কি বল?"

যে পশু মনের খাঁচায় আটক আছে তাকে আর খুলে দিও না। এই ছিল লর্ড গার্লিংটনের শেষ কথা। ওকে দাহ করে ফেরবার পথে কথাটা বার-বার মনে পড়ছিল। ছেলেরা বক্সিং দেখতে গেছে, তাই লোকের অভাবে আমাকেই শ্মশানে যেতে হয়েছিল।

চিল্ড্রেন্স্ পার্কের কাছাকাছি আসতেই মাইকের আওয়াজ কানে গেল।

বক্সিং প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হচ্ছে। মেয়র ভাষণ দিচ্ছেন, "কবি বলেছেন, অবলা কেন মা, এত বলে? বহুবল ধারিণীং...স্বাধীনতা পেয়েছ, শক্তির চর্চা কর। অবলা মাতার দুর্নাম ঘুচাও...খুশী হলাম তোমাদের উৎসাহ দেখে, উদ্দীপনা দেখে। আজকের অনুষ্ঠানেই আশা করি তোমাদের সব উৎসাহ ব্যয় হয়ে যাবে না। উঠে পড়ে লাগো। বক্সিং-এর চর্চা ঘরে ঘরে সুরু করো। বিশ্ব প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ হও। ভারত মাতার মুখ উজ্জ্বল করো। এই আমার আশীর্বাদ......"

॥ বার ॥

সমস্ত দিন অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরিয়ে, কোনো বর্ষাদিনের অপরাহ্ন আকাশ থেকে শেষ মেঘটুকু মুছে ফেলে, যদি কখনো হঠাৎ কোনো খেয়ালবশে মৃদু হেসে ওঠে, আর সে হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ে মাঠের প্রান্তরে, ঘরের দেওয়ালে, সেই ইঁটরঙা আসন্ন সন্ধ্যায় আমার মনে পড়ে যায়, আসামের ঘন জঙ্গলের মধ্যে, এক রেল কোয়ার্টারের জানালা ধরে দাঁড়িয়ে থাকা নিঃসঙ্গ শ্যামা মেয়েটির কথা। মনে পড়ে, তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলুম, তার প্রিয়কে খুঁজে বের করব, তারপর একদিন ফিরতি পথে মেয়েটিকে জানিয়ে যাব সে কথা। আমার দিকে উত্তরের অপেক্ষায় তাকিয়েছিল। যদি প্রত্যাখ্যান করি, যদি বিরক্ত হই, যদি বা বিদ্রূপে শানিয়ে ওঠে আমার ঠোঁট, তাই ভয়ে ভয়ে চেয়েছিল আমার মুখের দিকে। তার মুখখানাকে মেঘভারানত আকাশের মতই লেগেছিল সেদিন। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম। আশ্বস্ত হয়ে সে হেসেছিল। ঠিক এই বর্ষণশেষ অপরাহ্ন বেলার আলো তার মুখে ফুটে উঠেছিল, দেখেছিলুম।

কিন্তু কি আশ্চর্য! মেয়েটির নাম ভুলে গেছি। শুধু মনে আছে রেল কোয়ার্টারের জানালা ধরে দাঁড়িয়ে থাকা দুটি চোখের আকুল প্রতীক্ষা। আর মনে আছে, অদ্ভুত সেই ইস্টিশানের নামটা—টিহু। হ্যাঁ, আর মনে আছে, আমি আমার কথা রাখিনি।

এ সব আমার অতীত জীবনের ঘটনা। সে জীবনকে অনেক দূরে ফেলে এসেছি। ইস্কুলের বন্ধুদের মত, হঠাৎ মুখোমুখি পড়ে গেলে দু-একটা ঘটনা আবার স্মৃতির আয়নায় ঝিলিক মেরে ওঠে।

তখন লালমণিরহাটে থাকি। বি এন্ড এ রেল-কর্মীদের এক সংগঠন ছিল, আমি ছিলুম তার লালমণিরহাট ডিভিসনের অর্গানাইজিং সেক্রেটারী। এলাকা ছিল বিরাট। একদিকে পার্বতীপুর, অন্যদিকে আমিনগাঁও। একদিকে ফুলছড়িঘাট আর অন্যদিকে দালসিংপাড়া। আবার আরেকদিকে সেই মাদারীহাট। আমি ছিলুম বেতনভুক, কিন্তু তা নামে, কাজে ছিলুম হাওয়াভুক। এ কাজে পয়সা ছিল না, মাইনে কুড়ি টাকা, ডিয়ারনেস আট টাকা। কিন্তু আমি বলতুম, মাইনে আট টাকা আর

ডিয়ারনেস কুড়ি টাকা। কারণ এই আট টাকা মাস প্রথমেই পেয়ে যেতুম। কুড়ি টাকা নিতে হত কয়েক খেপে।

পয়সা ছিল না, তবে দাপট ছিল। আর তখন একে কাঁচা বয়স, তার উপর আদর্শের পাগলা ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে চেপে বসেছি। হু হু করে ছুটছি।

এই সময়েই একদিন আলাপ হয়ে গেল জানকীরামের সঙ্গে। টিহু ইস্টিশানের সিগন্যালম্যান। রেলকর্মী ইউনিয়নের সে ডিভিশন্যাল একজিকিউটিভ কমিটির সদস্য। লালমণিরহাটের রেল ইনস্টিটিউটটাতে মিটিং বসেছে। মিটিং সুরু হতে না হতেই তুমুল ঝগড়া বেধে গেল। বাবু আর কুলীর সওয়াল উঠে পড়ল। মজুরদের প্রতিনিধিরা অভিযোগ করলেন, এ ইউনিয়ন শুধু বাবুদের সুখ-সুবিধাই দেখছে। মজুররা ফাঁক পড়ছে। বাবুরা বললেন, এ মিথ্যে কথা। তুমুল হট্টগোল, মিটিং ভেঙে যায়। এমন সময় দেখলুম জানকীরাম উঠল। আর ঝাড়া এক ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়ে দু' দলকে শান্ত করলে।

জানকী বলল, "এই ইউনিয়ন বাবুদের স্বার্থ বেশী দেখছে, এটা ঠিক। কারণ মজুররা এতদিন এর মধ্যে আসেনি। তাদের আনবার জন্য বাবুরাও চেষ্টা করেন নি। এতদিন বাবুদের একটা আর মজুরদের একটা, এমনি আলাদা করে ইউনিয়ন গড়েই শ্রমিক সংস্থাকে কমজোরী করে ফেলা হয়েছে। এখন চেষ্টা হচ্ছে নতুন ভাবে তৈরী করবার। বাবু কি কুলী, এই সব বাজে ঝগড়া মিটিয়ে, এস, নতুনভাবে কাজ সুরু করা যাক। কোম্পানী বাবুকেও শুষছে, কুলীকেও শুষছে। অতএব দুইকে এক করে সেই শোষণ বন্ধ করার কাজে লেগে পড়।"

দেখলুম, জানকীরামের ক্ষমতা আছে। সে তার ব্যক্তিত্ব দিয়ে সমস্ত মিটিংটা পরিচালিত করল। ঠিক হল, মজুরদের মধ্যে কাজ করবার জন্য একজনকে নিয়োগ করা হবে। আমাকেই সে মিটিংএ পছন্দ করা হল।

জানকীরাম বলল, "আমার ওদিক থেকেই কাজটা তাহলে সুরু হোক। সাপটগ্রাম থেকে সরভোগ পর্যন্ত গ্যাংমেনদের আমি বলে রাখব। তারপর একটা তারিখ ঠিক করে চিঠি লিখব, আপনি যাবেন।"

জানকীরাম বাঙ্গালী সেদিন বুঝতে পারিনি। বুঝলুম চিঠিখানা পেয়ে। পনের দিন পার না হতেই জানকীরামের চিঠি এসে হাজির। বাংলা গোটা গোটা অক্ষরে লেখা! মেয়েলী ছাঁদের অক্ষর। সেদিন কিন্তু জানকীরাম আগাগোড়া হিন্দীতেই কথাবার্তা বলেছিল। লোকটার বয়েস

হয়েছে। কিন্তু উৎসাহ উদ্যম যুবকের মত। বহু সংগ্রামের চিহ্ন মুখের বলিতে আঁকা রয়েছে, তবু হতাশা সেখানে বাসা বাঁধতে পারেনি। যে কয়টি মুখ সারাজীবনেও মন থেকে মুছে যাবে না, তার একটি এই জানকীরামের।

দিনমতই রওনা দিয়েছিলুম। বিকেল নাগাদ টিহু পেঁছবার কথা। সন্ধ্যের সময় মিটিং। কর্মসূচী ছিল চার-পাঁচ দিনের। কথা ছিল, টিহুর কাজ সেরে, লাইন ধরে ধরে সরভোগ পর্যন্ত যাব। তারপর সেখান থেকে ট্রেণে চেপে লালমণিরহাট।

কিন্তু কপালে দুর্ভোগ ছিল। ট্রেণ লেট হয়ে গেল চার ঘণ্টা। টিহুতে যখন নামলুম, তখন ঘোর অন্ধকার। আর আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। ট্রেণ থেকে নেমে ইস্টিশান ঘর কতটুকু রাস্তা! কিন্তু ওর মধ্যেই ভিজে সপসপে হয়ে গেলুম। ছোট ইস্টিশান। এইটেই শেষ গাড়ি। ইস্টিশানে ঢুকতেই দেখি জানকীরাম। হাসল।

তারপর বলল, হিন্দীতেই বলল, "এঃ, একেবারে পকেটে গঙ্গা যমুনা নিয়েই এসে পড়লেন দেখছি। তো চলুন আমার ডেরাতেই যাই। আজ কাজ সব পণ্ড হয়ে গেল। তবে কাল হপ্তাবার আছে। লোকজন মাইনে নিতে জড় হবে। তখন কিছু কথাবার্তা বলা যাবে।"

কথা বলতে বলতে ওর বাসার দিকে চললুম।

হঠাৎ জানকীরাম বলল, "আমার বাসাতেই আপনাকে থাকতে হবে। খুব কষ্ট হবে। কিন্তু নাচার। ভেবেছিলাম, ইস্টিশানে আপনাকে রাখতে পারব। আগের বাবু রাজিও হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পরশু 'সিক' হয়ে চলে গেছেন। 'রিলিভিং'-এ যিনি এসেছেন, তিনি ইউনিয়নবিরোধী। কাজেই কষ্ট আপনাকে একটু করতেই হচ্ছে।"

কারো বাসায় কেউ থাকতে বললে, সে তো ভদ্রতা করে বলবেই, 'বড্ড কষ্ট পাবেন।' কিন্তু এ ভদ্রতা নয়। রেল কোয়ার্টারে যাঁরা বসবাস করেন, ভদ্রতা তাঁরা কোন্‌কালে জলাঞ্জলি দিয়েছেন। রেলের লোক খেতে দিতে ভয় পায় না, কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু কাউকে থাকতে দিতে হলে তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। কোম্পানী কর্মচারীদের জন্য যে ইঁটের মজবুত অন্ধকূপ বানিয়েছেন তারই সরকারী নাম কোয়াটার। দীর্ঘ-দিনের অভিজ্ঞতা দিয়েও বুঝে উঠতে পারিনি এর মধ্যে মানুষ বেঁচে থাকে কেমন করে? কারো ভাগে একখানা, কারো বা দুখানা ঘর, শতকরা নব্বইজন রেলকর্মীর জন্য এই বরাদ্দ। লালমণিরহাট তো রেলেরই শহর। সেখানে দেখেছি, এক ছোটবাবু আলাদা বাড়ি ভাড়া করে মেয়ের বিয়ে

দিলেন। অষ্টমঙ্গলায় মেয়ে জামাই ফিরে আসতেই, ছোটবাবুকে মাত্র দু'খানা ঘরের একখানা ঘর ছাড়তে হল। দুটি ছেলেকে ওয়েটিং রুমে পাঠিয়ে নিজে ক'দিন ওভারব্রিজে শুলেন। দেখা হতেই তিক্ত হেসে বলেছিলেন, দেখুন দেখুন, কেমন সুখে রেখেছে কোম্পানী। মেয়ের বিয়ে দিয়েই ওভারব্রিজে এসেছি মশাই, এর পর নাতি হলে কোথায় যাব?

ছোটবাবু তবু তো ভাগ্যবান। 'বাবু কোয়ার্টার' পান। জানকীরাম বাবু নয়, মিনিয়েলস্। তার দুখানা ঘরও পাবার কথা নয়। একখানা ঘর। সেই এক ঘরে রাত কাটাব কি করে? জায়গা খারাপ বলে নয়। জানকীরামের মেয়ে আছে, কত বড়, অত রাত্রে আন্দাজ করতে পারলুম না। মেয়েটা টিমটিমে এক কেরাসিনের 'ডিব্রি' জ্বালল। তাতে আলো হল না। তবে ঘর কত অন্ধকার তা বোঝা গেল।

জানকীরাম মেয়েকে বলল, পরিষ্কার বাংলায়, "বাবুকে একটা কাপড় দে।"

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "তুমি বাঙ্গালী?"

জানকীরাম বলল, "হ্যাঁ, চক্রবর্তী, আমরা বারেন্দ্র।"

যেন বিজলীর তরঙ্গে হাত দিয়েছি, এমনই শক্ খেলুম। হিন্দুস্থানী ভেবে যাকে এতক্ষণ তুমি তুমি করে যাচ্ছিলুম, বাঙ্গালী বামুন শুনেই, তাকে আর তুমি বলতে পারলুম না। মধ্যবিত্ত সংস্কারের কি অদ্ভুত প্রভাব।

মেয়ে বলল, "কিছু নেই, কি পরতে দেব?"

জানকীরাম বলল, "যা হয় দে, বাক্সটা খুলে দ্যাখ না। শাড়িটাড়ী যদি থাকে।"

মেয়ে বলল, "বাক্সেও কিছু নেই।"

জানকীরাম বিরক্ত হল। আমি বিব্রত। জানকীরাম কথা না বলে বাক্স হাতড়াতে লাগল। তারপর একখানা কি বের করল। বলল, "এই তো।"

সেই অন্ধকারেই দেখলুম, মেয়েটি বাজের মত ছোঁ দিয়ে কাপড়খানা বাবার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল।

তারপর বলল, "না এখানা দেব না। এখানা নয়।"

হঠাৎ জানকীরাম রেগে উঠল। মেয়েটাকে দমাদম গোটা দুচ্চার কিল চড় মেরে কাপড়টা কেড়ে নিল। মেয়েটা ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

আর জানকীরাম গজরাতে লাগল, "যত বয়েস বাড়ছে ততই অবুঝ হচ্ছে। একটা লোক ভিজে মারা যাচ্ছে, আর উনি সোহাগের কাপড়খানা তুলে রেখে দিচ্ছেন। কি, না উনি ওখানা পরে বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন।

আরে, তোকে বিয়ে করতে আসবে কে? কি আছে তোর? রূপ আছে? ওই তো ছিরি, কালী অবতার। টাকা আছে তোর বাপের? তবে?"

ওই ছোট অপরিসর ঘর, বাইরের মুষলধার বৃষ্টি, কালি ওঠা ল্যাম্পের শিশ্‌, বাপের তর্জন গর্জন, মেয়ের ফুঁপিয়ে কান্না, ঘরের মধ্যেকার ভ্যাপসা গরম, চিমসে দুর্গন্ধ সব মিলিয়ে কি বিচিত্র অভিজ্ঞতা যে হল সেদিন, বোঝাই কেমন করে।

শুধু এইটুকু মনে আছে, এতদ্‌সত্ত্বেও সেই রাত্রে কাপড়খানা পরেছিলুম। না পরে উপায় ছিল না। ওই ঘরে পাশাপাশি তিনজনে ঘুমিয়েছিলুম। উপায় ছিল না।

কিন্তু স্তোকবাক্যটা না দিলেও তো পারতুম! আজ বড় অনুশোচনা হয়।

পরদিন ভোরে উঠেই জানকীরামের মেয়েকে দেখলুম। বেশ হৃষ্টপুষ্ট। বছর বাইশ বয়েস। মুখশ্রী সরল। একটু বোকা। আর কালো। আর দেখলুম, আমার পরণে এক চৌলির শাড়ি।

পরে শুনেছিলুম, এটা ওর মায়ের। এটা পরেই ওর মায়ের বিয়ে হয়েছিল। আর মৃত্যুর সময়ে, এটা ওর মা, ওকে দিয়ে বলে গিয়েছিল. 'এই আমার আশীর্বাদ। এটা বিয়ের সময় পরিস।'

আরো দুদিন ছিলুম। সরলা মেয়েটির মনের অনেক কথা শুনে নিয়েছিলুম।

তারপর আসবার দিন, কি যে দুর্বুদ্ধি হল, ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে জানকীরামকে বলেছিলুম, "আপনার মেয়ের বিয়ের জন্য ভাববেন না; আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু আছে। সে বিয়ে করবে বলছে, আমার কথা বড্ড মানে, আমি বললে, নিশ্চয়ই শুনবে। আর আপনার মেয়েও তো ভাল মেয়ে। যে কেউই একে বিয়ে করবে।"

জানকীর মুখের বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। সে বহু রকম লোক দেখেছে। কিন্তু মেয়েটির মুখে সেই আলো ফুটে উঠেছিল, সমস্তদিন বৃষ্টি ঝরার পর বর্ষাদিনের অপরাহ্ণে যে আলো ফুটে ওঠে।

আসবার সময় দেখেছিলুম সেই শ্যামা মেয়েটি কি যত্নে পাট করে আনলায় চৌলিখানা তুলে রেখেছে। আর ট্রেণে যেতে যেতে দেখেছিলুম, কি আকুল আগ্রহ নিয়ে সে আমার দিকে চেয়ে আছে। জানি, এমনি আরো বহুদিন সে ইটরঙা রেল কোয়ার্টারের জালানা ধরে নিষ্ফল দাঁড়িয়ে থাকবে। শ্রান্ত হবে। ক্লান্ত হয়ে পড়বে। তবু ট্রেণের শব্দে শতছিন্ন আশাটাকে রিফু করে ফের জানালায় এসে দাঁড়াবে।

॥ তের ॥
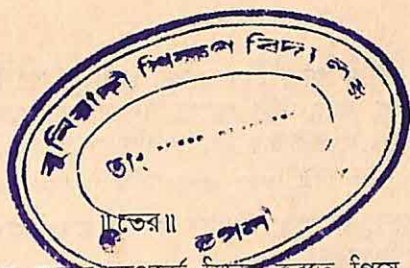
যাকে বলে হিসেবে ভুল, মানুষ সম্পর্কে বিচার করতে গিয়ে অনেকবার তা আমার হয়েছে। সেইরকম ভুল জীবনবাবুর ব্যাপারেও করেছি।

না ক'রে হয়ত উপায়ও ছিল না। জীবনবাবুর সঙ্গে পরিচয় হতে না হতেই ওঁর সঙ্গে ঠোক্কর লেগে গেল। সে আমার মিস্ত্রী-জীবনের কথা। কলকাতার উপকণ্ঠে কোনও এক কারখানায় ঠং ঠং লোহা পিটছি। জীবনবাবু, জীবনরতন সুর, সেই কারখানারই অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট। কারখানার মালিক পাইন ব্রাদার্স, দু' ভাই, বড়বাবু আর ছোট সাহেব। আর তাঁদের পরেই অ্যাকাউণ্ট্যাণ্টবাবু।

হেড মিস্ত্রী ইদ্রিস মিঞা থেকে শুরু ক'রে ছোট সাহেবের বেয়ারা পাঁচু দাস অবধি কেউ আমরা ওকে দেখতে পারতুম না। ইদ্রিস বলত, শালা, বড় চুক্‌লিখোর। আর এক নম্বরের বদমাইস।

আর সেকথা বর্ণে বর্ণে সত্যি, সেকথা সেদিন মনে হয়েছিল। আমরা 'হাড়ভাঙা' পরিশ্রম করতুম, তাতেও কাজ উঠত না, ওভারটাইম করতুম। হাড়ভাঙা পরিশ্রম সম্পর্কে ইদ্রিস আমাকে ফ্যাক্টরীতে ঢুকতে না ঢুকতেই পাঠ দিয়েছিল, দ্যাখ্‌ ডিউটির বখতে একদিনের কাজ দুইদিনে কর্‌বি, তাহ'লে ওভারটাইম মিলবে, আর ওভারটাইমের সময় দুই ঘণ্টার কাজ এক ঘণ্টায় উঠাবি, তাহ'লে মাইনে বাড়বে। এই হ'ল ফ্যাক্টরীর হাড়ভাঙা কাজের তরিকা।

কাজেই ওভারটাইম প্রত্যেক দিনই করতে হ'ত। আর ওভারটাইমের পাওনা নগদ ব'লে প্রায় প্রত্যেক দিন অ্যাকাউণ্ট্যাণ্টের সঙ্গে আমাদের, বিশেষ ক'রে আমার বেজায় ঝগড়া হত।

আমাকে জীবনবাবু দু'চোখে দেখতে পারতেন না। প্রথম যেদিন এই কারখানায় এসে ঢুকলুম, সেদিন থেকেই তাঁর বিষনজরে পড়েছিলুম।

আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ভদ্দরলোকের ছেলে ব'লেই তো মনে হচ্ছে। তা বাবা ভবিষ্যৎটা ঝরঝরে করতে এখানে আসা কেন? চাকরি-বাকরি একটা জুটল না কোনও চুলোয়।"

আরেক দিন ওভারটাইম নিতে গিয়েছি, ওঁর ভাউচার আর লেখা হয়ে

উঠছে না। টাকা পাব, তবে বাসায় ফিরব। সবাই ওঁর টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, আর উনি পাশের বিলবাবুর সঙ্গে দিব্যি জমিয়ে গল্প করছেন। আধ ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে আছি, শেষে সবাই ধৈর্য হারিয়ে ফেলল।

ইদ্রিস বলল, "কি বাবু, ওভারটাইম মিলবে কি না।"

জীবনবাবু বললেন, "মিলবে না তো মুফৎ ঘরে যাবে তোমরা?"

"কখন মিলবে?"

"সময় হলেই মিলবে।"

জিজ্ঞেস করলুম, "অত কথায় দরকার কি মশাই, সে সময় আসবে আর কতক্ষণ পরে, তাই বলুন না।"

"বলি, খুব যে ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে এসেছ দেখছি, অ্যাঁ।"

বললুম, "আজ্ঞে না, পায়ে গাছ গজিয়ে গেল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ন্যায্য পাওনা দেবেন, তাতেও গড়িমসি।"

জীবনবাবু খেপে গেলেন। "ন্যায্য অন্যায্য খুব দেখাচ্ছ যে, তখনই জানি, ভদ্রলোকের ছেলে কারখানায় ঢুকেছে, ফোঁস ফোঁস ক'রে অস্থির ক'রে দেবে। তা' বাবা করছ মজুরের কাজ, ওদের মতই থাক, ঢোঁড়া হয়ে কুলোপানা চক্কর কেন?"

বেধে গেল তুমুল। তারপর থেকে আর সদ্ভাব হয়নি। যতদিন কারখানায় ছিলুম জ্বালিয়ে মেরেছিল, তারপর চাকরিটাই একদিন খেয়ে দিল।

তারপর জীবনের অনেক কারখানায় অনেক পোড় খেলুম। ক্রমাগত পাঁচ বছর ভাগ্য আমাকে নানা ছাঁচে ঢালাই করল। একাজ সেকাজ ধরতে ধরতে করতে করতে ছাড়তে ছাড়তে সাংবাদিকের বৃত্তিতে ঢুকে গেলুম। আর এখানেই আবার জীবনবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ। এই প্রতিষ্ঠানের তিনিই অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট। আমার বৃত্তি বদল হয়েছে, হয়ত চেহারাও কিছু বদল হয়ে থাকবে। তাই প্রথম বেশ কিছুদিন চিনতে হয়ত পারেননি। হয়ত বলছি এই কারণে যে তাঁর হাবভাব দেখে আমি বুঝতে পারিনি যে তিনি আমায় চিনেছেন।

আর চিনলেও কোনো ফয়দা হ'ত না। প্রতিষ্ঠানের বড়কর্তা যিনি, আমি তাঁর নেকনজরে পড়েছিলুম। আর সেই খুঁটি ভরসা ক'রে ওঁকে এক হাত নিতে হবে, এই ছিল আমার মতলব। এই অফিসেও ওঁর বড় বদনাম ছিল। ওঁর বিরুদ্ধে অভিযোগও সেই মামুলী, চুক্‌লিখোর, খোসামুদে।

সাব-এডিটর হিমাংশু বলত, "জীবনে শালা, অয়লোলজিতে ডক্টরেট পাবার উপযুক্ত। জি এম কে কি তেলটাই দেয় দেখেছিস।"

আমি হেসে বলি, "তোরা নতুন, তোরা দ্যাখ। আমি ওর পাস্ট হিস্ট্রি সব জানি। পুরোনো আলাপ ওর সঙ্গে। ও আমার চাকরি খেয়েছে একবার।"

মজাটা হচ্ছে, এতদিন ধরে এত যে দুঃখকষ্ট সহ্য করলুম, কোনোদিন কিন্তু জীবনবাবুকে তার মূলাধার বলে ভাবিনি। কখনো মনেই হয়নি জীবনবাবুর কথা। যেদিন এখানে প্রথম ওকে দেখলুম, সেইদিন থেকে ওর উপর প্রতিহিংসা নেবার ইচ্ছেটা জেগে উঠল। ওর বড়রকম ক্ষতি করবার সাধ্য আমার ছিল না। তাই ছুতোনাতা পেলেই ওকে অপমান করতুম। আর তাতেই বড় খুশী হতাম।

অফিসের কাজে বাইরে যেতে হবে। জরুরী কাজ। জি এম হুকুম দিয়ে গেছেন। টাকা আনতে গিয়েছি, বলে টাকা তো পাবেন না। কেন?

ক্যাশিয়ারবাবু বললেন, "কি করব বলুন, আকাণ্ট্যাণ্টবাবুর সই না হ'লে তো আর দিতে পারিনে।"

অ্যাকাউণ্ট্যাণ্টবাবুর কাছে পারতপক্ষে যাইনে। একটা চিরকুট লিখে পাঠিয়ে দিলুম। সে চিরকুট ফিরে এল, টাকা এল না। তিনি কয়েকছত্র লিখে জানালেন, জি এম-এর লিখিত নির্দেশ ব্যতীত টাকা দেওয়া সম্ভব নয়।

ভালই হ'ল, সুযোগ মিলল। তারপর আমার সামনে জি এম যখন জীবনবাবুকে খুব অপমান করলেন, গালাগালি দিলেন, তখন আমার উল্লাস দেখে কে? কিন্তু এই তো শুরু, এই তো সবে ওঁকে আমার হাতের মুঠোয় পেলাম, আরো প্রতিশোধ নিয়ে তবে আমার শান্তি।

কিন্তু আমার সময় আর এলো না। এবারও জীবনবাবুই জিতলেন। আমার যিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনি বদলি হয়ে গেলেন। তাঁর বদলে যিনি এলেন, তাঁকে হাতের মুঠোয় পুরতে জীবনবাবুর একদিনও সময় লাগল না। তারপর থেকে অপিসে জীবনবাবুর কি পোজিশন। ক্ষমতার দিক থেকে জি এম-এর পরেই উনি।

আমার অবস্থা বলাই বাহুল্য। একদিন মাইনে নিতে গেলুম। মাইনে পেলুম দু' মাসের আর একখানা নোটিশ। মাইনে নিতে গিয়ে দেখি পঁচিশ টাকা কম। কি ব্যাপার? না জি এম-এর নির্দেশ। দুটো কাজ করতুম ব'লে পঁচিশ টাকা অ্যালাউন্স পেতাম, নোটিশ মাসের মাইনে থেকে সেটা কেটে রেখেছে।

জি এম-এর সঙ্গে দেখা করতেই তিনি বললেন, "সে কি কথা, এমন অর্ডার তো আমি দিইনি। আপনার যা মাইনে নোটিশ-মাসেও তাই পাবেন।"

তিনি জীবনবাবুকে ডাকলেন।

জীবনবাবু এলে বললেন, "ওঁর পুরো মাইনে ওঁকে দিয়ে দিন।"

জীবনবাবু বললেন, "পুরো মাইনে তো দিয়েছি স্যর, শুধু অ্যালাউন্সটা কেটে রেখেছি। উনি তো আর কাজ করছেন না।"

জি এম বললেন, "দিয়ে দিন।"

এই ঘটনার আরো দু' বছর বাদে জীবনবাবুর সঙ্গে আবার দেখা। শ্যামবাজারের মোড়ে। জীবনবাবুদের প্রতিষ্ঠান হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে। কর্মীরা চাঁদা তুলে মামলা-মোকদ্দমা চালাচ্ছে। পুরানো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়। হিমাংশু কর্মীদের এক প্রধান পাণ্ডা। কিছুদিন আগে আমার অফিসে এসেছিল চাঁদা নিতে। সলোমন ব'লে ওদের এক সহকর্মী বেকার অবস্থায় সংসার চালাতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে। তার স্ত্রী-পুত্রের সাহায্যার্থে চাঁদা তুলে বেড়াচ্ছে হিমাংশুরা, তাই আমার কাছেও এসেছিল।

হিমাংশুই বলল, "সব্বাই-এর চাকরি গেল, কিন্তু শালা অয়লোলজিস্ট ঠিক আছে। তেল দেবার গুণ কি দ্যাখ। আমাদের সঙ্গে কেসটা মিটে গেলেই ওকে হেড অপিসে বদলি করে দেবে।"

শ্যামবাজারের মোড়ে জীবনবাবুর সঙ্গে দেখা হতেই, মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছিলাম।

জীবনবাবু ডাকলেন, "কি মশাই, কেমন আছেন?"

বললাম, "আমাদের আর থাকাথাকি কি। তা আপনার চাকরি তো টাইট আছে, ওঃ, বলিহারী ক্ষমতা দাদা, কোম্পানি উঠে গেলেও আপনার চাকরি মারে কে? ব্রাঞ্চ অপিস উঠলে হেড অপিসে বদলি। আর হেড অপিসও যদি উঠে যায়, তো বড়কত্তার বৈঠকখানাটুকু কে কেড়ে নেয়? অ্যাঁ?"

খোঁচাটা যথাশক্তি বেঁধালুম।

কিন্তু তা হজম ক'রে ম্লান হেসে জীবনবাবু বললেন, "কি করি বলুন, ওঁরা ছাড়তে চাইছেন না।"

বললুম, "এমন গুণের কর্মচারী কেউ ছাড়তে চায়।"

জীবনবাবু অদ্ভুত ধরনের হাসতে লাগলেন। বুঝলুম, খোঁচাটা হজম করবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

জীবনবাবুর সঙ্গে আবার দেখা হ'ল, বেশ কয়েক মাস পরে, কল্যাণী কংগ্রেসনগরে। সেদিন ছিল শনিবার। অকস্মাৎ লোকের ভিড় এত অসম্ভব বেড়ে গেল যে, কেউ আর কিছুতে কুলিয়ে উঠতে পারলে না। হোটেল রেস্টুরেণ্টের খাবার-দাবার সব নিঃশেষ, কোথাও একদানা খাবার নেই। কলকাতায়, আমাদের কাগজের অপিসে শেষ সংবাদ পাঠিয়ে দিয়ে, কোনোক্রমে দুটি ভাত মুখে গুঁজে দুর্জয় শীতে কাঁপতে কাঁপতে তাঁবুতে ফিরছি, হঠাৎ থানার দারোগাবাবু ডাক দিলেন।

"মশাই আপনারা তো রিপোর্টার লোক, দেখুন না চেষ্টা ক'রে এই ছেলেটিকে কোথাও খাওয়াতে পারেন নাকি। আমরা তো পারলুম না।"

বছর দশেকের একটি ছেলে, ক্ষিধে তেষ্টায় শীতে একেবারে নেতিয়ে পড়েছে। কি আর করা, তাকে নিয়ে সম্ভব অসম্ভব সব হোটেল রেস্টু-রেণ্টেই হানা দিতে লাগলুম। কিন্তু যেখানেই যাই, এক কথা, কিচ্ছু নেই দাদা, কিচ্ছু নেই। হাঁড়ির তলা অবধি খতম। খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে ফিরে আসছি, এমন সময় জীবনবাবুর সঙ্গে দেখা। তাকে কেমন যেন মলিন মলিন লাগল। এখানে জীবনবাবুর কি?

জিজ্ঞেস করলুম, "কি দাদা কংগ্রেস দেখতে নাকি?"

জীবনবাবু বললেন, "রথ দেখা সকলের ভাগ্যে কি জোটে ভাই, আমরা কলা বেচতে এসেছি।"

কি ক্লান্ত কণ্ঠস্বর!

বললেন, "এই হোটেলটা দিয়েছি। সারাদিন বড্ড খাটুনী গেছে। তা কি খবর?"

বললুম সব। শুনে একটু চুপ ক'রে থাকলেন। বোধহয় কিছু ভাবলেন।

তারপর বললেন, "ঠিক আছে, এস খোকা।"

"গোটাকতক ভাত আছে এখনও, খেয়ে নাও। তারপর যাবে কোথায়?"

বললুম, "ছিল তো থানায়, দল ছাড়া হয়ে পড়েছে বোধহয়।"

তিনি বললেন, "ব্যস্, ব্যস্, কোথাও যেতে হবে না। খাও, খেয়ে রাতটা এখানেই কাটাও, তারপর কাল বাড়ি যেও।"

এতদিন পরে লোকটিকে, এই প্রথমবার আমার একটু ভাল লাগল, বোধহয় ঝামেলার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল বলেই। পরদিন সকালে উঠে কি মনে হল, জীবনবাবুর হোটেলে গেলাম। দিনের আলোয় জীবনবাবুকে অনেকটা রোগা লাগল। অবস্থা যে ভাল যাচ্ছে না, একনজর দেখলেই বোঝা যায়। বয়সের চাপটা বেশ তীক্ষ্ণভাবে ফুটে উঠেছে।

চা দিতে বললুম। চা এল। জীবনবাবু এসে বসলেন।

বললেন, "দিলে তো কারবারের বারটা বাজিয়ে। যা রিপোর্ট দিয়েছ, লোক আর আজ আসছে না। কি বল?"

হঠাৎ জিজ্ঞেস করলুম, "আচ্ছা, হঠাৎ হোটেল দিলেন যে বড়।"

জীবনবাবু বললেন, "কি করব, খেতে হবে তো।"

বললুম, "কেন চাকরি?"

জীবনবাবু বললেন, "চাকরি তো নেই।"

এবার বিস্মিত হলাম, "চাকরি নেই, কেন?"

জীবনবাবু ম্লান হাসলেন।

বললেন, "মনিবের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলুম। অ্যাকাউণ্টেণ্টগিরি করছি, বিস্তর ঘরের খবর জানতুম। সব বললুম। আর কি অ্যাকাউণ্টেণ্টের চাকরি কেউ দেয়? বাঁধা চাকরিটা ভাই ছাড়তে হল। দুর্বল লোক। সাক্ষী দিতে উঠলাম মনিবদের নামে। সামনে দেখলুম, শুকনো মুখে ব'সে আছে সব। সবাই আমার দিকে চেয়েছিল। ওদের সবারই তো চাকরি গেছে। কি ক্ষুধিত চোখ সব। সলোমনের বউ এসেছিল, রোগা রোগা ছেলেমেয়েরা এসেছিল। সবাইকার চোখই আমার দিকে। দুর্বলতা, দুর্বলতা। সেরেফ দুর্বলতা, আর কিছু নয় ভাই, উল্টো সাক্ষী দিয়ে বসলুম। একমাস ক'রে ক্ষতিপূরণ সব পেয়েছে ওরা। আরও হয়ত পাবে।"

বললুম, "সে তো আপনিও পাবেন।"

জীবনবাবুর মুখে ম্লান হাসিটা ফুটে উঠল।

বললেন, "না, আমরা পাব না, আমরা তো শ্রমিক নই, আমরা যে অফিসার। আর, আর আমার তো নোটিশ পিরিয়ডের মাইনেও মেলেনি। কোম্পানী ওদের এক মাসের মাইনে চুকিয়ে নোটিশ দিয়েছিল। আমাকে তো নোটিশ দেয়নি কোম্পানী।"

একটু চুপ করে থেকে জীবনবাবু আবার বললেন, "অ্যাকাউণ্টেণ্টগিরি এই খতম। কোন্ মনিব আর বিশ্বাস ক'রে আমায় চাকরি দেবে, বল? ব্যবসাপত্তর আমার ধাতে সয় না, সে বিষয়ে দক্ষতাও নেই। তবু, আর কিছু করবার নেই দেখে তাই করছি।"

"ওরে, চল চল", বয়টাকে ডেকে জীবনবাবু উঠলেন। বললেন, "জিনিসপত্র কিছু কিনে আনি ভাই, বেলা হ'ল। আচ্ছা পরে দেখা হবে।"

॥ চৌদ্দ ॥

আজ বিশেষ করে মিসেস হেলেন দত্তের কথা মনে পড়ছে। একটু পরেই তাঁর লোক আসবে, চাই কি নিজেও আসতে পারেন। যদি লোক পাঠান, তবেই বাঁচোয়া, চিঠিখানা তার হাতে দিয়ে দিলেই চুকে যাবে। জানি, চিঠিখানা পড়ে নিরাশ হবেন। কাজটি না পাওয়ায় তাঁকে বিলক্ষণ অসুবিধায় পড়তে হবে। এই কাজটি হবে বলে তিনি ধরেই নিয়েছিলেন। সত্যি বলতে কি, তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কেও কারো দ্বিমত ছিল না। তবুও মেনন রাজী হল না, বিশেষ করে সেদিনকার ঘটনার পর মেননকে রাজী করান দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াল।

মেনন স্পষ্টই বললে, "ভদ্রমহিলা আদব-কায়দা মোটে জানেন না। সেদিন ইণ্টারন্যাশনালের ডিরেকটারটার সঙ্গে যে হ্যাংলামিটা করলেন তাতে আমার মাথা কাটা গেছে। বড্ড বকবক করেন। আর ও ভ্যাজালে জড়াতে চাইনে।"

তবুও, অধ্যাপক বন্ধু ওঁর হয়ে মেননকে অনেক বলেছিলেন। মেনন রাজী হয়নি।

ভেবে দেখলে, মেননকে খুব দোষও দেওয়া যায় না। ওঁদের প্রতিষ্ঠানে আন্তর্জাতিক সংস্থার যে ডিরেকটরটি এসেছিলেন, তিনি জার্মান। ইংরেজী ভাল বোঝেন না। তাই দোভাষীর কাজ করবার জন্য একজনের দরকার হওয়াতে অধ্যাপক হেলেনকে সুপারিশ করেছিলেন। হেলেনের তখন খুবই দুরবস্থা যাচ্ছে। দিন তিনেকের কাজ। শ' খানেক টাকা পারিশ্রমিক। হেলেন কাজটা করল বটে, ভালভাবেই করল, কিন্তু জার্মান ভদ্রলোকটির সঙ্গে এমন মাখামাখি শুরু করল, যেটা সকলেরই চোখে লাগল। তার বকবকানির চোটে জার্মান ভদ্রলোকটিও নাকি বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। যাবার সময় মেননকে সে কথা জানিয়েও গেছেন।

অধ্যাপক আমাকে বললেন, "মেনন রাজী হ'ল না। মিসেস দত্ত লোক পাঠাবেন। তুমি চিঠিখানা তাকে দিয়ে দিও।"

তাই, সেই কথাই ভাবছি। হেলেন কেন ভদ্রলোককে বিরক্ত করতে গেলেন? একটু বকবকানি কমালে ক্ষতিটা ছিল কী? আর এত কথা কী

থাকতে পারে ? ভদ্রলোক না হয় হেলেনের স্বদেশবাসী। তা বলে কি তিনি তাঁর কাছে হাত পেতেছিলেন ? সাহায্য চেয়েছিলেন কোনও কিছুর ? না সে সব কিচ্ছু নয়। হেলেন আবাল্য বার্লিনে মানুষ। সেই যে ডাঃ অবিনাশ দত্তকে বিয়ে করে কলকাতায় এসেছেন, আর দেশে যাননি। কত বছর হয়ে গেল ! বিশ বছর ! দীর্ঘ বিশ বছর ! আর কি বার্লিনে যেতে পারবেন কোনওদিন ! বার্লিন ! বার্লিনের রোদ, বার্লিনের শীত, সেই অসম্ভব শীত, আর মদ, আহা, লোভনীয় রাইন! কথায় আছে, যে জার্মান রাইন ফেলে বার্গান্ডীতে মন দেয়, সে দেশদ্রোহী। কতদিন যে সে সব অপূর্ব আস্বাদ জিভে ঠেকেনি! ভুলেই গেছেন সে সব অনুভূতি। স্মৃতির একটা ফিকে রেশ শুধু রয়ে গেছে। বহুদিন পরে এক স্বদেশ-বাসীকে পেয়ে তাই হেলেন আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন। স্বদেশবাসী যে আর পাননি তা নয়। তবে এ ভদ্রলোক তাদের চেয়ে স্বতন্ত্র। একেবারে আপনার লোক। হেলেন যে কলেজ থেকে পাশ করেছিলেন, ইনিও সেই কলেজের ছেলে। তাই প্রাণ খুলে কথা বলেছিলেন। অধ্যাপকদের কথা, নামকরা সহপাঠীদের কথা, লাইব্রেরিয়ানটির কথা, বার্লিনের খুঁটিনাটি খবর, সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন। ভদ্রলোক সব খবর জানেন না, এখন তো বার্লিন তাঁর কাছেও রুদ্ধ, বিদেশ, সবাইকে চেনেনও না। এই প্রবাসী ভদ্রমহিলার বকবকানিতে তাঁর ক্লান্তি এসেছিল, বিরক্তিবোধ করেছিলেন। হেলেন তা জানতেন। এভাবে তাঁর আবেগ আলগা হয়ে পড়ায় লজ্জিতও হয়েছিলেন। কিন্তু লজ্জা আর সঙ্কোচ সত্ত্বেও তাঁর প্রবল হৃদয়াবেগকে তিনি শাসনে রাখতে পারেননি। সে কথা তিনিই আমাকে বলেছিলেন। আরও অনেক কথা বলেছিলেন। সে সব কথা শুনেই তো ওঁর প্রতি আমার ধারণা বদলাল। সেদিন থেকেই ওঁর সঙ্গে বন্ধুত্বও গড়ে উঠল।

অথচ আট বছর ধরে ওঁদের সঙ্গে আমার পরিচয়। ওঁদের বাড়িতেও গিয়েছি কয়েকবার। কিন্তু তখন ওঁর সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক ছিল না। ওঁর স্বামী ডাঃ দত্ত, বিজ্ঞান কলেজের পদার্থবিদ্, আমাদের পার্টির বড় সমর্থক ছিলেন। টাকা পয়সার দরকার হলেই ডাঃ দত্তের কাছে যেতাম। তিনি মুক্তহস্তে সাহায্য করতেন। ডাঃ দত্তের মত সদাশিব লোক আমি কমই দেখেছি। কিন্তু ডাঃ দত্ত সদাশিব হলে কি হবে, হেলেন

ছিলেন একেবারে মা মনসা। স্বামী কাউকে পয়সাকড়ি দেন, এটা তিনি একেবারে সহ্য করতে পারতেন না।

প্রথম দিন ডাঃ দত্তের কাছে গিয়ে যে আক্কেল হয়েছিল, জীবনে ভুলব না। আমি কি এসব ব্যাপার তখন জানতুম। আমাকে পার্টি থেকে বলে দিয়েছে ডাঃ দত্তের কাছ থেকে টাকা আনতে, আমি গিয়েছি। টাকার যে জরুরী দরকার তা জানতুম। খুঁজে খুঁজে নর্থ রেঞ্জে গেলাম। বাড়িটা বের করতেও বেশী বেগ পেতে হল না। নীচেটায় উঠোন, দোতলায় ওঁরা থাকেন। সদর ঠেলে যেই ভিতরে ঢুকেছি, আর দেখি হেলেন হাঁ হাঁ করে ছুটে আসছেন। ডাঃ দত্তের যে মেম বউ, আমি তা জানতুম না। ভাবলুম, বোধ হয় বাড়ি ভুল করেছি। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। কিন্তু না বাড়ি তো ভুল হয়নি। নম্বর লাগান আছে দরজায়, তা ছাড়া বাড়িটার বর্ণনা যা শুনেছিলুম, তার সঙ্গেও মিলে যাচ্ছে। কি করি, সাহস করে আবার ঢুকলুম।

ভেতরে এবার পা দিতে না দিতেই এক বিরাট কুকুর লাফিয়ে আমার ঘাড়ে এসে পড়ল। আমার তো তখন হয়ে গেছে। সর্বশরীর শিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। কুকুরটাও এমন বেয়াদব, আমার দু'কাঁধে সামনের দু'পা তুলে আমার গলার কাছে মুখটা এনে দাঁড়িয়ে রইল। আমি না পারি নড়তে, না পারি চেঁচাতে। বিলাতী কুকুরের মেজাজ যে কেমন তা তো জানিনে। কখন যে ব্যাটা ঘ্যাঁক করে গলাটা কামড়ে দেবে, তার ঠিক কি? পাঁচ মিনিট গেল কি পঁচিশ মিনিট, তা বলতে পারব না। আমার মনে হল, কুকুরটা নিঃশ্বাস দিয়ে ঠেলে ঠেলে আমার বাকী জীবনটাই ফুঁকে দিচ্ছে।

হঠাৎ দেখি, মেমসাহেব আসছেন। মুখ কুকুরটার চেয়েও গম্ভীর।

আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন, "পার্টির লোক?"

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

বললুম, "হ্যাঁ।"

"ডাঃ দত্তের কাছে এসেছ?"

ঘাড় নাড়লুম।

"টাকা চাই, কি বল?"

এক গাল হেসে, সেক্রেটারী যে চিঠিখানা ডাঃ দত্তকে দিয়েছিলেন, সেখানা বের করলুম।

মেমসাহেব গর্জন করে উঠলেন, "বেরোও, বেরিয়ে যাও বাড়ি থেকে। শোন, এ কুকুরটা লোককে কামড়ায় না। অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু

বুঝলাম, একে দিয়ে চলবে না। আজ বিকালে বুলডগ আনব। তারা আস্ত মানুষ চিবিয়ে খায়।"

বলে কি রে বাবা!

"বুঝলে, তোমার পার্টির লোফারগুলোকে ব'ল, আজ বিকেল থেকেই মিসেস দত্ত বুলডগ আনছেন। এবার থেকে জীবনের মায়া করলে যেন আর এদিক মাড়ায় না।"

কি সাংঘাতিক মহিলা! প্রথমবারের অভিজ্ঞতাতেই পুরো শিক্ষে পেয়ে গেলাম।

তারপর থেকেই হেলেনকে এড়িয়ে চলতুম। পথে ঘাটে দেখা হলেই হৃৎকম্প হতো। আমরা দু'চক্ষে ও'কে দেখতে পারতুম না। আমাদের মধ্যে অনেকেরই আবার ও'র উপর আক্রোশ ছিল খুব। তারা বলত, এই ডাকিনীটাই ডাঃ দত্তকে চুষে খাচ্ছে। কি দেখে যে ডাঃ দত্ত ও'কে বিয়ে করেছিলেন, কে জানে?

তারপর অনেকদিন পার হয়ে গেছে। পলিটিকস্ ছেড়েছি। চাকরি করি এক দৈনিক কাগজে। সিনেমা এডিটার। একদিন এক নাচের শো হচ্ছে, দেখতে গিয়েছি। হঠাৎ দেখি ডাঃ দত্ত। আমাকে দেখে ডাঃ দত্ত এগিয়ে এলেন।

স্মিত হেসে বললেন, "আরে তুমি!"

হেসে জবাব দিলাম, "চাকরি, দাদা চাকরি। কিন্তু আপনার শরীরটা তো ভাল যাচ্ছে না।"

বললেন, "অসুখ করেছিল। আসবার ইচ্ছে ছিল না, তবে বৌটি নাচছে কিনা, না এসে পারলুম না। আজ আবার ফাস্ট' অ্যাপিয়ারেন্স কিনা। তোমরা বাংলায় কি লিখবে, প্রথম আত্মপ্রকাশ?"

হো হো করে হাসলেন। তারপর হেলেনকে ডাকলেন।

হেলেন ব্যস্তসমস্ত হয়ে এদিক ওদিক ঘুরছিলেন। এর তার সঙ্গে আলাপ করছিলেন। ডাক শুনে এগিয়ে এলেন। ডাঃ দত্ত পরিচয় করিয়ে দিলেন।

বললেন, "সিনেমা এডিটার। সমঝদার লোক।"

হেলেন অত্যধিক খুশী হলেন। আমার বুক দুরুদুরু করছিল।

বললেন, "মুখটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে।"

ভাবলুম সেরেছে।

বললুম, "এইরকম শোয়ে টোয়ে দেখে থাকবেন।"

খুশী হয়ে হেলেন বললেন, "তাই হবে।"

ছ'বছর আগের কথা কি আর মনে থাকে। হেলেন যে তা ভুলে গেছেন, বেঁচেছি। নাচ আরম্ভ হ'ল। হেলেন এসে আমার পাশেই বসলেন। নৃত্যনাট্য। এঁর মেয়ের খুব একটা যে প্রধান অংশ তা নয়। সামান্য একটা ভূমিকা। কয়েকবার প্রবেশ করল। কিন্তু হেলেন তাতেই উচ্ছ্বসিত। ওঁর বাড়াবাড়ি দেখে মনে মনে হাসলুম। মেয়ের প্রতিভা সম্পর্কে এমন সালঙ্কার ফিরিস্তি হেলেন দিতে লাগলেন যে, নাচ দেখা আমার মাথায় উঠল। উঠেও যেতে পারিনে, অভদ্রতা হয়। শেষে সিগারেট খাবার নাম করে উঠে এলাম, আর ঢুকলাম না।

পরদিন হেলেন মেয়ের ফটো নিয়ে আমার আফিসে গিয়ে হাজির। বলেন, ফটো ছাপাতে হবে। মেয়ের চেহারাটা সত্যিই ভাল। বছর চোদ্দ বয়েস। ভারী কাঁচ মুখখানা। দিলুম ছবি ছাপিয়ে। তারপর থেকে কতবার যে হেলেন তাঁর মেয়ের ফটো আর তার সম্পর্কে খবর ছাপতে পাঠিয়েছিলেন তার হিসেব নেই। যেন কাগজের মালিক আমি নিজে। একবার দুবার হয়, এক কথা। কিন্তু বারবার কি করে পারা যায়। কিন্তু হেলেন তা শোনেন না, বোঝালে বোঝেন না। সে এক মহা যন্ত্রণা। শুধু কি তাই, একদিন শুনলুম, এক সিনেমা সাপ্তাহিকের সম্পাদক ওঁর মেয়ের সম্পর্কে সমালোচনা করায় হেলেন তার আফিসে গিয়ে তাকে ঠেঙিয়ে এসেছেন। আমি শেষটায় ওঁকে এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়াতে লাগলুম। তারপর একদিন সিনেমা এডিটরীও আমার ঘুচে গেল।

দু' বছর কাটল। রিপোর্টারি করি। বর্ধমান থেকে আসছি। গাড়িতে উঠেই মন খারাপ হয়ে গেল। দেখি, ওধারের এক বেঞ্চে হেলেন বসে আছেন। একবার ভাবলুম, হেলেনের চোখ এধারে পড়বার আগেই নেমে যাই। কিন্তু একটা জায়গা পেয়ে যেতেই বসে পড়লুম। হেলেন চাইলেন না। যেমন ছিলেন, তেমনি চুপচাপ বসে থাকলেন। কেমন যেন ভেঙে পড়েছেন মনে হ'ল। বাইরের দিকে চেয়ে বসে ছিলেন। মাঝে মাঝে রুমাল দিয়ে চোখমুখ মুছছিলেন। প্রথমটায় আমি ভেবেছিলুম, চোখে বোধ হয় কয়লা টয়লা পড়েছে তাই। পরে দেখলুম, না, তা তো নয়। তবে কি হেলেন কাঁদছেন?

আমি এধারে বসেছিলুম। মাঝখানে একখানা বেঞ্চ ছেড়ে হেলেন বসেছিলেন ওধারের জানালার কাছে। বেলা গড়িয়ে আসছিল, সেই কারণে, অথবা অন্য কোনও কারণে ঠিক জানিনে, হেলেনকে বড় কোমল দেখাচ্ছিল। ওঁর বয়েস চল্লিশ পার হয়ে গেছে। অন্যান্য যতবার ওঁকে দেখেছি

ততবারই কেমন কাটখোট্টা গোছ লেগেছে। আর মেজাজটা তো সর্বদাই মিলিটারীর মত, উঁচিয়েই রাখতেন। ট্রেনের গতিচ্ছন্দে, হেলেনের মুষড়ে পড়া ভাবে ওঁকে আজ সম্পূর্ণ অন্যরকম দেখাচ্ছিল।

কেন জানিনে, আজ ওঁকে এড়িয়ে যেতে মন চাইল না। ধীরে ধীরে উঠে ওঁর সামনের বেঞ্চে বসে পড়লুম। হেলেন মুখ ফেরালেন। অপরিচিতের অরণ্যে চোখ থেকে যে অশ্রু আপনিই বেরিয়ে আসছিল. পরিচিত জনকে দেখে তা বাধা পেল। হেলেন লজ্জিত হয়ে চোখ মুছলেন। ওঁর মুখে খানিকটা কাঠিন্য ফিরে এল।

হেসে জিজ্ঞেস করলুম, "এখানে কোথায় এসেছিলেন ?"

"বর্ধমান কোর্টে," হেলেন ছোট্ট একটু জবাব দিয়ে চুপ করে গেলেন। যেন আমাকে চেনেন না। বড় অপ্রস্তুত বোধ করলুম। চুপচাপ বসে থাকলুম। দু-একজন যাত্রী আমার দিকে একবার চাইলে।

শেষ পর্যন্ত হেলেনই কথা শুরু করলেন।

বললেন, "আমাকে অস্বীকার করে করুক, কিন্তু অবিনাশের মেয়েকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করবে, এ হতে দেব না।"

খানিকটা স্বগতোক্তির মত। কিছুই বুঝলুম না।

হেলেন বললেন, "কি রকম অকৃতজ্ঞ সব, দ্যাখো। অবিনাশ বেঁচে থাকতে ওঁর কাছ থেকে কম উপকার ওঁর ভায়েদের কেউ পেয়েছে? আজ তারাই কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছে অবিনাশের বৌ মেয়েকে পথে বসাবে বলে। কিন্তু আমিও সহজে ছাড়ছি না।"

আমি চমকে উঠলুম। বললুম, "ডাঃ দত্ত নেই ?"

হেলেনও বিস্মিত হলেন, "তুমি জানতে না !"

"না।"

"সে তো গত জুনে মারা গেছে। দশ মাস হতে চলল।"

হেলেন একটু থামলেন।

তারপর বললেন, "অদ্ভুত মানুষ। যা রোজগার করেছে, তাই উড়িয়ে দিয়ে গেছে। বাজে কাজে নয়, ভাল কাজে। কত লোককে যে টাকা দিত, তার সন্ধান আগে পাইনি। পেলাম ও মরবার পরে। আর বৃথাই আমি ক'টা লোকের সঙ্গে লড়াই করতে গেছি। আমার সামনে আর ক'জন পড়েছে। অতি সামান্য। ওঁর নোটবুকে যে অসংখ্য নামের এক বিরাট তালিকা আছে, তার তুলনায় বাড়িতে যারা আসত, তাদের সংখ্যা কত, কত কম। বেচারারা যে কি নির্যাতন সহ্য করেছে আমার কাছে, সে তুমি বুঝবে না।"

আজ আর আমার ভয় হল না।

বললুম, "জানি। আপনি আমাকে একবার কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিলেন। আপনি ভুলে গেছেন।"

ম্লান একটা অনুশোচনার হাসি তাঁর মুখে ফুটে উঠল।

বললেন, "তা হবে। অবিশ্বাস করিনে। ট্রেন শুদ্ধ লোক যদি এসে একথা বলে, তাও অবাক হব না। সারা জীবন ওকে আগলে নিয়ে বেড়িয়েছি। কিন্তু কি হল। দান ধ্যান করে ও স্বর্গে চলে গেল। ওকে তো সংসার চালাতে হয়নি। মুদির দেনা, মনোহারীর দেনা ওকে শোধ করতে হয়নি। নাবালক এক মেয়ে আর সহায়স্বজনহীনা এক নারীকে রেখে গেল ঘরের দেনা শুধতে।"

হেলেন খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন, তারপর বললেন, "যাক যা করেছে ভালই করেছে। ঈশ্বর ওঁকে শান্তি দিন।"

খালি হেলেনের সেদিনকার মুখখানাই ভেসে উঠছে। সকাল সন্ধ্যা জার্মান পড়ান। কিন্তু তাতে আর কত পান। এই চাকরিটা পেলে ওঁর বড় উপকার হত। চাকরির খবরটা ওঁকে দিয়ে যখন বলেছিলুম, এ আমাদের জানা লোক, আশা করি কাজটা আপনার হয়ে যাবে, হেলেন তখন শিশুর মত খুশি হয়ে উঠেছিলেন। সেই উজ্জ্বল মুখ, এই চিঠি পেয়ে কেমনতর হয়ে উঠবে আবার?

॥ পনর ॥

যদি সেই মুহূর্তে সেখানে আমরা এসে হাজির না হতাম, যদি অধ্যাপক রায় আমাদের মতো নিষ্ক্রিয় থেকে ওদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটিকে ছিনিয়ে না আনতেন, তবে সেই উন্মত্ত জনতা সেদিন ওকে খুন করে ছাড়ত।

অধ্যাপক রায়ের সাহসকে এজন্য সাধুবাদ দিই। সেই ক্রুদ্ধ জনতা তাঁর উপরও আক্রমণ চালাতে উদ্যত হয়েছিল। ক্ষুধিত বাঘের গ্রাস থেকে খাদ্য সরিয়ে নিলে তার যে মনোভাব হয়, জনতার মনোভাব তার চেয়ে উন্নত ছিল না। তাদের তখন খুনের নেশা চেপেছে।

সেই তেজী অধ্যাপকের দৃপ্ত চেহারাটা আজো আমার চোখে ভাসে। কিন্তু তার চেয়েও বেশী স্পষ্ট হয়ে ভাসে, হঠাৎ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সেই লোকটির মুখখানি। কপাল ফেটে রক্ত চুইয়ে পড়ছে। দাঁত ভেঙে গেছে বলে মুহুর্মুহু থুথু ফেলছে—থুথু নয় রক্ত। পাকাটে ফ্যাকাশে ক্ষতবিক্ষত মুখখানায় ভীতি ও আতঙ্ক মাখানো। লোকটা এমনই হতভম্ব হয়ে গেছে যে, যন্ত্রণাও ভুলে গেছে। সেই বোধশক্তিহীন মুখখানা এমন গভীরভাবে আমার মনে রেখাপাত করেছে, যা ভোলবার সাধ্য আমার নেই। বোধ হয়, সেই কারণেই তাকে রক্ষা করবার জন্য সেদিন অমন মরিয়া হয়ে উঠেছিলুম।

রিপোর্টারদের ভাগ্যে যা প্রায়শই জোটে না—সন্ধ্যেবেলায় ছুটি—সেদিন হঠাৎ তাই জুটে গেল। রেস্তোরাঁয় যেতে পুরানো সঙ্গীও জুটল—অধ্যাপক রায়, সাহিত্যিক গৌরীদা আর একজন বড়লোক বন্ধু। তিনি আবার সাহিত্য কলা সঙ্গীত ইত্যাদির সমঝদার। চারজনে বেড়াতে বেড়াতে পাইকপাড়ায় পৌঁছালুম। দত্তবাগানের কাছে দেখি, এক ভিড় উত্তেজিত লোক। বড়লোক বন্ধুটি সর্ববিষয়ে সাফ্ থাকতে চান। যেখানে ঝামেলা তার একশ' হাতের মধ্যে তিনি নেই। তাঁরই জন্য আমরা কৌতূহল চেপে রেখে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলুম। কিন্তু পারলুম না। কোত্থেকে বছর নয়েকের একটা রোগা ছেলে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে অধ্যাপক রায়কে জড়িয়ে ধরলে।

"বাবু, বাবু শিগ্‌গির আসুন, ওরা আমার বাবাকে মেরে ফেললে। বাবু গো, আমার বাবাকে মেরে ফেললে।"

বলেই ছেলেটি হাউ হাউ ক'রে কেঁদে ফেললে।

বড়লোক বন্ধুটির সন্ধ্যেটা মাটি হবার সম্ভাবনা দেখা দিতেই তিনি চটে উঠলেন।

"তোর বাবাকে মেরে ফেললে, তা আমরা কি করব? আমরা কি পুলিশ? যা ভাগ্‌। পুলিশে খবর দে।"

কিন্তু ছেলেটি নাছোড়।

"বাবু গো, শিগ্‌গির আসুন, বোধ হয় শেষ ক'রে দিল, পায়ে পড়ি বাবু, চলুন, বাবাকে বাঁচান," ব'লে যে কাতর আহ্বান জানালে তা এড়ানো অধ্যাপক রায়ের সাধ্যের বাইরে।

"চল," ব'লে সেই গোলমালের দিকে এগুতেই বড়লোক বন্ধুটি তাঁর হাত চেপে ধরলেন।

"খেপেছেন নাকি! ওই গুণ্ডাদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কি আমাদের সাজে!"

অধ্যাপক রায় বললেন, "থামুন"। তারপর ছেলেটিকে বললেন, "চল"।

করি কি, আমরাও তখন তাঁর সঙ্গ নিলুম। ভিড় ঠেলে ঢুকতেই দেখি, লোকটার উপর বিশটা উন্মত্ত লোক হিংস্র আক্রোশে সমানে কিল চড় ঘুষি চালিয়ে যাচ্ছে। লোকটা গড়িয়ে প'ড়ে গেল। ছেলেটা বাবাগো বলে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তেই একজন তার পেটে মারলে এক লাথি। কোঁক ক'রে ছেলেটা ছিটকে পড়ল। তারপর গোঁ গোঁ করে তার সে কি অবর্ণনীয় গোঙানি।

কে একজন বললে, "সব শালা ভেলকি। মার শালাকে। এই বয়েসেই কেমন তৈরী হয়েছে দেখেছিস্‌।"

আরেকজন বললে, "হবে না, কেমন বাপের ছেলে। চোরের ছেলে শালা বাটপাড় হবে তো।"

অধ্যাপক রায় এগিয়ে গেলেন।

তারপর শান্ত স্বরে বললেন, "ব্যস্‌ আর না, এবার ওকে ছেড়ে দিন।"

পেছন থেকে কে যেন বললে, "কে হে ছাড়নেওয়ালা"।

"দলের কেউ হবে, আর কে?"

অধ্যাপক রায় বললেন, "যথেষ্ট হয়েছে আর না, এবার ওকে ছেড়ে দিন।"

"আপনি কেটে পড়ুন মশাই, আর বেশী মাতব্বরি করলে ফল ভাল হবে না।"

"দে না শালার খুপরি উড়িয়ে।"

"মার শালাকে, মার মার।"

কিন্তু অধ্যাপক রায় লোকটাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছেন। নড়ছেনও না, উত্তেজিতও হচ্ছেন না।

"দোষ করলে পুলিশে ধরিয়ে দিন। আইন নিজের হাতে নেওয়া ঠিক নয়।"

"পুলিশ! পুলিশ কি করবে মশাই। পুলিশের মুরোদ জানা আছে। ওখান থেকে ধরবে, তারপর খানিকটা গিয়ে টু-পাইস পকেটে পুরে ছেড়ে দেবে।"

"সব ফোর-টুয়েণ্টি মশাই। খুব জানা আছে।"

"প্যাঁদানি, বুঝলেন দাদা, এসব কেসে প্যাঁদানি ইজ্ দি ওন্লি মেডিসিন।"

"আপনি কেটে পড়ুন না, ও দাদা, এতে আপনার ইণ্টারেস্ট কি? আর দু ঘা দিয়ে আমরাও বাড়ি চলে যাই।"

"আহা হা হা কেবল জমেছিল গো, কোত্থেকে ও ব্যাটা এসে সব গ্যাস্ ক'রে দিলে।"

"আপনি চোরকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন।"

কিন্তু অধ্যাপককে কেউ সরাতে পারলে না, উনি ধীরে সুস্থে লোকটিকে ধ'রে তুললেন, তারপর এক চায়ের দোকানের সামনে নিয়ে গেলেন। দোকানের আলোতে দেখলুম, কি সাঙ্ঘাতিক ধকলটা গেছে। বেচারা! সোজা হ'য়ে বসতে পারলে না। বেঞ্চিতে পিঠ রেখে এলিয়ে পড়ল। নাক, ঠোঁট ফেটে গেছে। ছিট ছিট রক্তে ধূসর জামাটা চিত্রিত হয়ে গেছে।

লোকটির বয়েস হয়েছে। দড়ি পাকানো চেহারা আর তোবড়ানো মুখই তার পরিচয় দেয়। ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে এল। লোকটা একবার চোখ তুলে চাইলে। ছেলেটার মুখও ফুলে উঠেছে। তার মাথায় লোকটা হাত বোলাতে লাগল। কোনও কথা বললে না। শুধু দু' চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

অধ্যাপক রায় রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "দেখুন, কি করেছেন।"

আশ্চর্য, কেউ প্রতিবাদ করলে না। উজ্জ্বল আলোয় নিজেদের কীর্তি দেখে বোধ করি লজ্জিত হয়েছিল। তাই ধীরে ধীরে সব স'রে পড়ল।

কিন্তু লোকটি চোর, সত্যিই সেদিন চুরি করেছিল। জনতার ভিড়

ক'মে গেলে, যে দোকানের সামনে ওকে নিয়ে বসিয়েছিলুম, তার মালিক এসে ঘটনাটা বললে।

দোকানির কথাতেই জানলুম, লোকটা ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়ায়। কথাটা শুনে কৌতূহল হ'ল। একবার ওর দিকে চাইলুম। এতক্ষণ পরে হাসি পেল। একটা পুরোনো খাকির প্যাণ্টালুন পরনে, পাছার দিকে তালি মারা। আর খালি গায়ে একটা ঢলঢলে কোট চাপানো। শুনেছি, কালো রং নাকি অন্য রং গায়ে মাখে না। কথাটা যে মিথ্যে তা এর কোট দেখলেই বোঝা যায়। কোটটা যে ভুষকালো ছিল এককালে, ভেতরের আস্তিন না দেখলে তা কেউ ধরতেই পারবে না। আমি ম্যাজিক পাগল। ভাল ম্যাজিশিয়ান মাত্রেরই আমি গোঁড়া ভক্ত। তাদের অনেকের খেলাই আমি দেখেছি। কি তাদের চলন বলন আর কি পোষাকের বাহার। সেই পোষাকগুলোর সঙ্গে লোকটার ছেঁড়া জামা কাপড়কে এক গোত্রে ফেলতে গিয়ে কিছুতেই পারলুম না। মনে মনে হাসলুম লোকটির প্রগল্‌ভতা দেখে। ম্যাজিসিয়ান! ম্যাজিসিয়ান হওয়া কি অতই সোজা!

দোকানী বললে, "বাবু, ও মেজিক খেলা দেখাচ্ছিল। টাকা ওড়ানোর খেল দেখাতে এক বাবুর কাছ থেকে একটা টাকা চেয়ে নিল। তারপর সে টাকা অদৃশ্য ক'রে দিলে। খানিক পরে আবার আর এক বাবুর পকেট থেকে সে টাকা বের করে বাবুকে দিলে। বাবু তো চলে গেলেন। ও-ও চলে যাচ্ছিল, এমন সময় বাবু ছুটতে ছুটতে এসে ওকে চেপে ধরলেন। "টাকা নিয়ে ভাগছ, টাকা দাও ফেরত। বাবু টাকা ফেরত চায়, আর ও বলে ফেরত তো দিয়েছি। ঝগড়া শুরু হ'ল, লোক জমল। বাবু ওর পকেট সার্চ করতেই টাকা বেরিয়ে পড়ল। তখন সবাই দিলে মার। এই তো ওর সামনেই বলছি, বলুক না, ও টাকা নিয়েছিল কিনা।"

দোকানীর অভিযোগ শুনে লোকটি হাঁ না কিছুই বললে না। ছেলেকে জড়িয়ে ধ'রে বসে রইল চুপচাপ।

ছেলে বললে, "বাবা ওঠো। চল যাই।"

লোকটি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকল শুধু। সে চাউনি বোবা, সে চাউনি ফাঁকা। ছেলেটা উঠল। একটা টিনের সুটকেশ রাস্তার ধারে খোলা পড়েছিল। বহু জিনিস ছত্রখান হয়ে পড়ে ছিল। ছেলেটি খুঁটে খুঁটে সে সব সুটকেশে ভরতে লাগল। দেখলুম, সেগুলো ঘরে তৈরী ম্যাজিকের সরঞ্জাম। কয়েক প্যাকেট তাস, রঙিন রুমাল, রকমারি কয়েকটা বল, কয়েকটা গেলাস, টিনের ছুরি, চৌকো টিনের বাক্স, রড্, আরো টুকি টাকি নানান জিনিস। নর্দমার ধার ঘেঁষে যে একটা মাথার ঝুলি পড়েছিল;
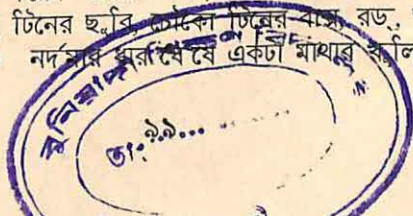
দেখতে পেয়ে সেটাও কুড়িয়ে আনলে, তবুও ছেলেটার মুখ দেখে মনে হ'ল, কিছু জিনিস হারিয়েছে।

অধ্যাপক মশাই পকেট থেকে একটা টাকা বের করে লোকটিকে দিলেন আর দিলেন তাঁর ঠিকানা।

বললেন, "টাকাটা অগ্রিম দিলুম, ঠিকানা দিলুম, কোনও এক রবিবারে এসে খেলা দেখিয়ে যেও। তুমি শিল্পী লোক, মস্ত গুণ তোমার আছে। তুমি তার থেকেই পয়সা রোজগার কর। তুমি চুরি করবে কেন? ছিঃ!"

"বাবু!" এই প্রথমবার লোকটি কথা বললে, ভাঙা ভাঙা কেমন কর্কশ শোনাল আওয়াজটা।

"বাবু! চুরি করেছি সত্যি, মারও খেয়েছি খুব। তবু বলি, চোট্ আমার দেহেতে যা লেগেছে, তার চার গুণ লেগেছে মনে। ছেলেও দেখল তার বাপ চোর—"

আর পারলে না, কান্না এসে কথা ডুবিয়ে দিলে। একটু পরে শান্ত হ'ল। তারপর যেন নিজের মনকেই বলতে লাগল,

"আমার এ খেলা কে দেখবে। লোকে গুণ তত চায় না, যতটা চায় ভেক। আমার কি বড় স্টেজ্ আছে, পোষাক আছে রঙদার? লাইট আছে, ব্যাণ্ড আছে? তবে, আমার খেলা কে দেখবে? আমার স্টেজ্ তো গাছতলা, আমার ফ্ল্যাশ্ আলো তো ওই সূর্য। সূর্যের সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে বের হই এই বালক বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে, আর সূর্যের আলো শেষ হ'লে বাড়ি ফিরি। সারাদিন খেলা দেখাই। বাপ ব্যাটায় যে দু' আনা দু' আনা জল খাব, সে পয়সাও কোনো কোনো দিন জোটে না। গতকাল জোটে নি, আজও জুটল না। বাবু, এ ছাড়া আরও পাঁচটা বাচ্চা বাড়িতে আছে, তাদের মা আছে, ভুগছে। কাল থেকে কারোরই খাওয়া নাই। তাই দিনের শেষে বাড়ি ফেরবার পথে দুষ্কর্মটা করলাম। অভ্যাস যে নাই তাতো দেখতেই পেলেন।"

সেদিন, ম্যাজিকঅলার কথা আমাদের বড়লোক বন্ধুটি বিশ্বাস করেননি। মানবচরিত্র অধ্যয়নে তিনি একজন এক্সপার্ট। অনেক লোক চরিয়ে খান কিনা।

অধ্যাপক রায়কে প্রায়ই বলেন, "কি মশাই আপনার গ্রেট ম্যাজিসিয়ানটি কই? এল?"

অধ্যাপক রায় মৃদু হেসে মাথা নাড়েন, "না এখনো আসেনি। তবে আসবে। ব্যস্ত লোক। শুনলেন না, ব্যাচারাকে কত খাটতে হয়। ফুরসৎ হয়নি হয়ত।"

বন্ধুটি বলেন, "ওর ফুরসৎ আর এ জন্মে হবে না। কত দেখলুম। ও আর আসবে না, এ আমি বাজী রেখে বলতে পারি।"

অধ্যাপক রায় বললেন, "বেশ, কত বাজী?"

বন্ধুটি বললেন, "দশ টাকা।"

অধ্যাপক রায় মৃদু হেসে বললেন, "বেশ। মিছিমিছি টাকাটা হারবেন।"

কিন্তু বাজী ধরবার পর দু সপ্তাহ কেটে গেল। লোকটির দেখা নেই। অধ্যাপকের বিশ্বাস সে আসবেই। আমরা বড়লোক বন্ধুর দিকেই মত করে ফেললাম।

একে ছুটির দিন তার উপরে বৃষ্টি সুরু হয়েছে। মৌজ করে চা মুড়ি চলছিল। আর চলছিল তাস। বাজী ধরে ব্রিজ খেলা। সমস্ত মনপ্রাণ তখন তাসের পাঁজায় বন্দী। কোনোদিকে চাইবার ফুরসৎ নেই। দান তোলবার সময়টুকুতে যা দু' চার কথা চলছে। বিষয় কদিন যাবৎ একই—ওই ম্যাজিকঅলা। বড়লোক বন্ধুটি কই মশাই, কই মশাই করে অস্থির করে তুলেছেন। তবে সেদিন খেলাটা এমন জমেছে যে, অমন মুখরোচক বিষয়টিও আমাদের ঠোঁট জিভের এলাকার বাইরে চলে গেছে। রাবারের খেলা। একটা গেম হয়ে আছে ওদিকে। কাজেই খুব হিসেব করে তাস ছাড়তে হচ্ছে। এমন সময় দরজায় খট্‌খট্‌, কে যেন কড়া নাড়লে।

আর সঙ্গে সঙ্গেই অধ্যাপক রায়ের ভাইপো ঢুকে বললে, "কাকা, ম্যাজিকঅলা এসেছে।"

অধ্যাপক রায় বললেন, "এখানে নিয়ে আয়।"

তারপর হেসে বললেন, "কি এল তো?" বাজী একটা যখন জেতা গেল, তখন আরেকটার আশায় আর থেকে কি হবে? খেলা বন্ধ থাক, আসুন বৃষ্টির দিনে ম্যাজিক দেখি।"

বড়লোক বন্ধুটি অপ্রস্তুত হলেন। আমরাও।

তিনি বললেন, একটু জোর দিয়েই বললেন, "বেশ, তা এ ঘরে কেন? চলুন বারান্দায় যাই। ঘরের চারধারে জিনিসপত্র ছড়ানো, এ ঘরে যাকে তাকে ঢোকানো ঠিক নয়। কোন জিনিসটা বেহাত হয়ে যায় ঠিক কি?"

কথাটা বন্ধু বেশ জোরেই বলেছিলেন। লোকটি ততক্ষণে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল, কথাটা কানে ঢুকতেই থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লে, অপরাধীর মতো ম্লান হাসলে, তারপর তাড়াতাড়ি বারান্দায় নেমে পড়ল।

বলল, "বেশ তো, বারান্দাই ভাল, আসুন দয়া করে, এখানেই খেলা দেখাই।"

অধ্যাপক রায় বিরক্ত হয়েছেন বুঝলুম।

তাড়াতাড়ি বললেন, "না না ঘরই তো ভালো, এখানে জায়গাও বেশী। এসো ভিতরে এসো।"

লোকটি ঘরের মধ্যে ঢুকল। কিন্তু সর্বক্ষণই কিন্তু কিন্তু হয়ে থাকল।

কৈফিয়ৎ দিলে, "যন্ত্রপাতিগুলো আবার সব তৈরি করতে হ'ল কিনা, সবই তো নষ্ট করে দিয়েছিল, তাই আসতে দেরি হ'ল। কি যে খেলা দেখাব আপনাদের ভেবে পাইনে। যন্ত্রপাতিগুলো সব নিজের তৈরী, ফিনিস্ ভাল নয়, হয়ত আটকে যাবে খেলা। যদি ভুলচুক হয়, মাফ করবেন।"

তারপর খেলা সুরু হ'ল। অতি মামুলী ধরণের খেলা। দেখতে দেখতে ক্লান্তি এসে গেল, বিরক্তি ধরল। আমি অধ্যাপক মশাই-এর উপর খাপ্পা হয়ে উঠলুম। লোকটিকে উনি টাকা পয়সা দান করুন, আপত্তি করিনে, কিন্তু অন্যের ধৈর্যকে কেন পীড়ন করবেন ?

যুক্তি দিয়ে বিচার করলে অবশ্য লোকটির প্রতি সহানুভূতি না জেগে পারে না। বৈঠকখানা ঘরখানা এমন প্রশস্ত নয় যে, কেউ স্বচ্ছন্দে এধার ওধার ঘোরাফেরা করবে। অথচ স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা না করলে ম্যাজিক খুলবে কি করে ? ঘরখানার প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে তক্তপোষ। বাঁদিকে আলমারি। ডানদিকটায় জিনিসপত্র নেই, ফাঁকা ছিল, লোকটি সেই দিকে স্থান নিয়েছে। চারদিক ফুটফুট করছে আলোয়, কোথাও কোনও আড়াল নেই। এর মধ্যে কি ম্যাজিক দেখানো যায় ? বুঝি। তবু ক্লান্তিকর খেলাগুলো দেখে মনে বিরক্তি জমা হয়ে ওঠে।

বড়লোক বন্ধুটি প্রথম থেকেই ওকে বিষনজরে দেখেছিলেন। দশ টাকা সদ্য সদ্য হেরে সে রাগ আরও চড়ে গেল। তাঁর কোনও বালাই নেই। এক ধার থেকে এটা 'রাবিস্', ওটা 'বোগাস্', সেটা 'দূর এ একটা খেলা নাকি, শুধু শুধু সময় নষ্ট' এন্তার বলে যাচ্ছেন। ওদিকে অধ্যাপক রায় প্রত্যেকটি খেলায় আহা আহা করে যাচ্ছেন।

লোকটি কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভেল্কি দেখিয়ে ছাড়লে। সমালোচকের মুখও দুম করে বন্ধ করে দিলে। খেলাটা দেখে আমরাও অবাক।

লোকটি বললে, "আপনারা বড় বড় যাদুকরের হাতকড়ার খেলা দেখেছেন, তাদের কত সরঞ্জাম, কত বড় সুন্দর স্টেজ, আলোছায়ার কত কারচুপি, বাজনাবাদ্য দিয়ে পরিবেশটাই এমন তৈরি করা থাকে যে, মন যা দেখে তাই বিশ্বাস করে ফেলবার জন্য তৈরি হয়ে থাকে। আমার সে সব

কিছ্‌ছু নেই। এমন কি হাতকড়ি পর্যন্ত নেই, তবু আমি সে খেলা দেখাব। একটা শক্ত ফিতা দেবেন?”

শক্ত ফিতা আনা হ'ল।

লোকটি দু' হাতের বুড়ো আঙ্গুল একসাথে জুড়ে বললে, “কেউ এসে বাঁধুন। খুশি মত বাঁধুন।”

কে আর বাঁধবেন? বড়লোক বন্ধুটি উঠে এলেন—তারপর ইচ্ছামত বাঁধলেন। গায়ের জোরেই বাঁধলেন।

তারপর লোকটি সত্যিই ভেল্কী দেখালে। সুটকেশের হ্যাণ্ডেলের ভিতর বন্ধ হাত বন্ধ অবস্থাতেই ঢুকিয়ে দিলে। আমি অবাক, সমালোচক বন্ধু অবাক। এমন কি অধ্যাপক রায় পর্যন্ত অবাক। আমাদের অনুরোধে সে দু' তিনবার খেলাটা দেখালে। কিন্তু কৌশলটা ধরতে পারা গেল না। তাতে বন্ধুটি আরো চটে গেলেন।

পরের খেলাটা আরো মারাত্মক। লোকটা এক টুকরো শোলায় আগুন ধরিয়ে জ্বলন্ত টুকরোটা মুখে পুরে দিলে। তারপর ফুঁ দিতে লাগল। আগুনের ফুল্‌কিগুলি এদিকে ওদিকে ঠিকরে পড়তে লাগল। বন্ধু এবং আমিও হাত বাড়ালুম। হাতে ফুলকি পড়তেই ছ্যাঁকা লাগল। নিঃসন্দেহ হলুম, আগুনটা আসল। লোকটা তারপর জ্বলন্ত টুকরোটা এতগুলো চোখের সামনে গিয়ে ফেললে। সবাই একেবারে তাজ্জব বনে গেলাম। বন্ধুটি খেপে উঠলেন।

বললেন, “দেখি আরেকটা শোলা।” শোলাটা দেখলেন ভাল করে, বললেন, “জ্বালাও এটা, তারপর খাও।”

লোকটি বললে, “একবার তো খেলাম।”

বন্ধু বললেন, “এটা খেতে হবে, এই টুকরোটা। চালাকি!”

বন্ধুর নাছোড় ভাব দেখে লোকটা শোলার টুকরোটা হাতে করে তুলে নিলে। তারপর ধরালে। জানিনে মনের ভুল কিনা, মনে হ'ল আগুনটা যেন আগের চেয়ে তেজী। লোকটা ধীরে ধীরে জ্বলন্ত টুকরোটা মুখে পুরে ফেললে। ফুঁ দিয়ে ফুলকি ছড়ালে, ফুলকিগুলোও নিঃসন্দেহে আগের চেয়ে বড় দেখাল। একটা ফুলকি ওর ঠোঁটে পড়ল। যন্ত্রণায় মুখটা বেঁকে গেল। সে অনেকক্ষণ ধরে শোলাটায় ফুঁ দিলে। অনেক ফুলকি ছড়ালে। এবার গিলবার পালা এল। লোকটির চোখে কি ক্ষণিকের জন্য মৃত্যুভয় ফুটে উঠতে দেখলুম? বন্ধুর চোখেও কি হিংস্র উল্লাস ফোটেনি? নাকি দুটোই আমার ভুল দেখা?

আবার আমরা বিমূঢ় হয়ে গেলুম। সত্যিই টুকরোটা ও গিলে

ফেললে। প্রাণপণ চেষ্টায় ও যন্ত্রণা চেপে রাখল। ওর কপালে ফুটল ঘাম। আমরা ধন্য ধন্য করে উঠলুম।

সমালোচক বন্ধুটি মন্তব্য করলেন, "অদ্ভুত, এমন আর আগে কখনো দেখিনি।"

বাজী জেতার দশ টাকা অধ্যাপক রায় ওকেই দিয়েছিলেন। বড়লোক বন্ধুটি বললেন, ওর ম্যাজিকের সরঞ্জাম কিনতে সাহায্য করবেন।

ওর ভাল পোষাক ছিল না, ম্যাজিক দেখাবার পোষাক। আমরা কিনে দেব বললুম। লোকটা চলে গেল। নিশ্চয়ই খুশী হয়েছে। আমার ধারণা, এ ছিল ওর আশাতীত।

প্রায় দিন পনের পরে, লোকটি নিজে এল না, ওর ছেলে এল, ম্যাজিকের সরঞ্জামগুলো কেনা হয়েছে কিনা জানতে।

জিজ্ঞেস করলুম, "তোর বাবা যে এল না।"

ছেলেটি একটুক্ষণ চুপ করে থাকল।

তারপর বললে, "মারা গেছে।"

সে কী! হ্যাঁ। ছেলেটি কাঁদলে না, বিচলিত হ'ল না।

ছেলেটি বললে, "এখান থেকে ম্যাজিক দেখিয়ে গিয়েই অসুখে পড়েন, পেটে খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল। সে যন্ত্রণা আর ভাল হ'ল না। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'ল, তাও না। মরবার সময় বলে গেছেন আপনারা নাকি ম্যাজিকের সরঞ্জাম কিনে দেবেন বলেছেন। যদি দেন তবে একটু তাড়াতাড়ি দেবেনবাবু, আমাকে আবার খেলা দেখাতে হবে তো।"

॥ ষোল ॥

যে যাই বলুক, আমার মতে কার্সিয়াং দার্জিলিং থেকে ভাল জায়গা। দার্জিলিং-এর স্নবারি, বড়লোকিয়ানা এখানে নেই। একটা নম্র এবং মৃদুভাব সব সময় মনকে এখানে স্নিগ্ধ করে রাখে।

তাই, এমন একটা জায়গায় বড়ুয়া মাসিকে বড্ড বেমানান ঠেকেছিল আমার। বড়ুয়া মাসির একটা ছোট্ট স্যানাটোরিয়াম ছিল, কার্সিয়াং শহর থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে। একে সেটা লোক চক্ষুর বাইরে, কোনওরকম প্রচার নেই, বড়ুয়া মাসি প্রচার চাইতেন বলেও মনে হয় না, তায় আমি যখন গেলুম, তখন সিজ্‌ন শেষ হয়ে এসেছে, কাজেই লোক সমাগম ছিল না।

বড়ুয়া মাসির সন্ধান পেয়েছিলুম কার্সিয়াং-এর বাসিন্দা আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে। সে বড়ুয়া মাসি সম্পর্কে খুব উঁচু সার্টিফিকেট দিয়েছিল।

কিন্তু বড়ুয়া মাসিকে দেখে আমার খুব উঁচু ধারণা হয় নি। আমি একটি কুলীর মাথায় মোট চাপিয়ে পাকদণ্ডির পথে যখন বড়ুয়া মাসির স্যানাটোরিয়ামে পৌঁছুলাম, তখন বেলা চারটে। আমায় দেখে সেজেগুজে যে বর্ষিয়সী মহিলাটি বেরিয়ে এলেন, বুঝলুম, তিনিই বড়ুয়া মাসি।

বিগতযৌবনা এক রমণী যদি চোখে কাজল, কপালে টিপ, ঠোঁটে রঙ আর চুলে বিনুনি ঝুলিয়ে কিশোরীর সাজ পরে ঘুরে বেড়ায় তো সে দৃশ্য কার ভাল লাগে? দূর থেকে যাও বা সহ্য করা যায়, কিন্তু তার অবিরাম সাহচর্যের কল্পনাও যে অসহ্য। ভাবলুম, আচ্ছা জায়গার সন্ধান আমাকে দিয়েছে বটে বিশ্বাস।

ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, ময়নার ডাকে ঘুম ভাঙল। খেতে উঠলুম। খাবার টেবিলে আমি একা। বুঝলুম, আর বোর্ডার নেই। আর কারো সাড়াশব্দও নেই।

জিগ্যেস করলুম, "মাইজি আসেন নি?"

ময়না বললে, "না আরো পরে আসবেন।"

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙল। বাইরে গলার আওয়াজ পেয়ে বুঝলুম, ভদ্রমহিলা কাকে কি হুকুম করছেন। গলার স্বরটি কিন্তু খারাপ লাগল না।

আমার উঠতে ইচ্ছে করছিল। নতুন জায়গার দৃশ্য দেখবার কৌতূহলও ছিল। কিন্তু উঠছিলুম না, পাছে ভদ্রমহিলার রঙ করা মুখখানায় চোখ ফেলতে হয়। কিন্তু আমি না উঠলেও উনি এলেন। সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুঁজলুম। ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকে টিপয়ের উপর ঠক করে কি রাখলেন। বুঝলুম, চা। ময়নাকে ডেকে বললেন, পর্দা উঠিয়ে দিতে। ময়না পর্দা ওঠাতেই এক ঝলক আলো এসে চোখে বিঁধল। আর শুয়ে থাকা যায় না। চোখ মেললুম, বিরক্তি চেপে রেখে।

ভদ্রমহিলাকে দেখে অবাক হলুম। চেনাই যায় না। দিব্যি সাদাসিদে চেহারা। একটা সাদা ব্লাউজ গায়ে, চওড়া কালো পেড়ে সাড়ি পরণে। এখন মনে হল, ওঁকে দেখতে ভালই।

স্মিত হেসে বললেন, "তুমিই বলছি বাবা, তোমাকে। কাল তাড়া ছিল, তাই কথাবার্তা বলতে পারি নি। তোমার কথা সব বিশ্বাসই বলেছে। নাও চা-টা খাও। তারপরে আলাপ হবে।"

উনি বেরিয়ে গেলেন। সমস্ত ঘরে চন্দন সাবানের মৃদু সৌরভ ছড়িয়ে পড়ল। অপূর্ব লাগল সকালটা। বাইরে চেয়ে দেখি পাইন পাতায় রোদের রঙ ধরেছে।

খাবার টেবিলে আমি আর উনি। ততক্ষণে উনি আমার মাসি হয়ে বসেছেন। বড়ুয়া মাসি।

বড়ুয়া মাসি বললেন, "আগে অবস্থা ভাল ছিল। বাড়ীটা সখ করে বানিয়েছিলেন আমার স্বামী। দিব্যি নিরিবিলি জায়গা। এখানে কি কেউ বোর্ডিং করে? আমার তো ব্যবসা নয় বাবা, লোকজনের সঙ্গ পাবার জন্যও বটে, আর কিছু খরচপত্র তোলবার জন্যও বটে, পরে এটাকে স্যানাটোরিয়াম মতো করে নিয়েছি। তোমার যতদিন ইচ্ছে থাকো। ভালই লাগবে বলে মনে হয়।"

সত্যি ভাল লেগেছিল। যতদিন ছিলুম, ভালই ছিলুম। সারাদিন হয় ঘুম, নয় বড়ুয়া মাসির সঙ্গে গল্প। বিকেল হলেই বড়ুয়া মাসির চেহারা অন্য। দুঘণ্টা ধরে ঘরে দরজা দিয়ে খুকী সাজতেন। তারপর বেড়াতে বের হতেন। আর গভীর রাত্রে ফিরতেন। একদিন দেখেছিলুম, এক নেপালী চাকর ওঁকে পোঁছে দিয়ে গেল।

বড়ুয়া মাসি বিকালের দিকে কথাবার্তাও বড় বিশেষ বলতেন না। মাসির এই পরিবর্তন আমার কাছে খুবই রহস্যময় বলে মনে হ'ত। কয়েক-বার কৌতূহল প্রবল হয়েছে, ভেবেছি জিগ্যেস করি। কিন্তু সেটা অভদ্রতা।

সকালে আমি ঘুরে বেড়াতুম। পাইন গাছের ছায়ায় কখনো বা বসে

থাকতুম। বেশীরভাগ দিনই একা। কখনো কখনো মাসিও সঙ্গ নিতেন। অনেক রকম গল্প হ'ত। বহু জিনিস দেখেছেন, অনেক বই পড়েছেন, সে বিষয়ে ভুল নেই। কিন্তু ওই ও'র এক দুর্বলতা, বিকাল হলেই কুৎসিত সাজসজ্জা করে বের হওয়া চাই-ই।

বিশ্বাসের কাছে শুনেছিলুম, বড়ুয়া মাসি শান্তিনিকেতনে পড়াশুনো করেছেন। ও'র স্বামী মস্ত পণ্ডিত। কিন্তু এই দোষেই ও'র সব কিছু নষ্ট হয়েছে। বিশ্বাস বলেছিল, ও'র স্বামী নাকি ও'কে ডাইভোর্স করেছেন।

অবিশ্বাস করার কিছু নেই। নিয়তই দেখছি, বড়ুয়া মাসিকে। বিকাল হবার সঙ্গে সঙ্গেই বড়ুয়া মাসির সারা দিনের ব্যবহার কেমন বদলে যায়। সাজসজ্জা করে বড়ুয়া মাসি বেরিয়ে পড়েন কার্সিয়াং-এর রাস্তায়। তখন কি যে এক শক্তি তাঁকে আকর্ষণ করে, না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

একদিন পিছু নিয়েছিলুম। বড়ুয়া মাসি ডাউ হিলের দিকে উঠে গেলেন। আমি আর গেলুম না। ইস্টিশানের সামনে এক পাহাড়ী মেয়ের চায়ের দোকান। জানতুম বিশ্বাসকে এখানে পাব। ঢুকে পড়লুম সেখানে। দেখি, বিশ্বাস কোণের দিকে এক চেয়ার পেতে চা খাচ্ছে।

বললে, "আজ যে বড় শহরে!"

আমি বাসা ছেড়ে বেরুতাম না, বিশ্বাস জানত।

বললুম, "লোকালয়ে একদম না এলে, হাঁপিয়ে উঠতে হয় যে।"

বিশ্বাস বললে, "তা মিসেস বড়ুয়ার লোককে দেখলে?"

আমি চমকে উঠলুম। বিশ্বাস জানল কি করে?

বিশ্বাস চায়ের অর্ডার দিয়ে বললে, "কোনো ভৌতিক কাণ্ড নয়। আমি এই একটু আগেই এখানে এসেছি। তোমাকে যেতে দেখলুম কি না। মিসেস বড়ুয়া যার কাছে প্রত্যহ আসেন, সে ভদ্রলোক ডাউ হিলেই থাকেন। খুব কড়া প্রেমের ব্যাপার ব্রাদার। কতখানি কড়া হলে রাধা রোজ রোজ কৃষ্ণের কাছে ছুটে আসেন। এতো নিয়মিত বোধ হয় ঘড়িও চলে না। ভদ্রমহিলার এই একদোষে সব গেল। স্বামী নামকরা লোক, ছেলেপুলেও আছে শুনেছি। সে সব ছেড়ে এক বুড়ো আর্মি ক্যাপ্টেনকে নিয়ে পড়ে আছেন। এসব ব্যাপার ঠিক বুঝিনে ভাই।"

বিশ্বাস আরো অনেক কথা বললে। তার সব অবশ্য সুরুচিপূর্ণ নয়। মোদ্দা এটা বুঝে নিলুম যে, বড়ুয়া মাসির চরিত্র খুব সুবিধের নয়। সে আমি প্রথম দর্শনেই বুঝে নিয়েছিলুম। তবু রসালো করে বিশ্বাস যখন বললে, তখন মনটা আর একবার বিরূপ হয়ে উঠল।

কোন অজান্তে মনের মধ্যে বড়ুয়া মাসির প্রতি একটা টান জন্মে উঠেছিল, সেটা আবিষ্কার করে লজ্জিত হলুম। ঠিক করলুম, মাখামাখিটা আর করা হবে না। এসব ভাবপ্রবণতার প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। পয়সা দিয়ে থাকি যখন, সম্পর্কটা তখন কেন তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না!

পরদিন থেকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে লাগলুম। ভদ্রতার মাত্রা বজায় রেখে যতটা পারা যায় ওঁকে বুঝিয়ে দিলুম ওসব ফালতু আত্মীয়তায় সুবিধে হবে না। ব্যবহার দেখে বুঝলুম, বড়ুয়া মাসি বড় আহত হয়েছেন।

দুজনের মধ্যে একটা ব্যবধান গড়ে উঠল। কেন যে হঠাৎ আমার মতি পরিবর্তন হল, সেটা বুঝতে না পেরে বড়ুয়া মাসি খুব কষ্ট পাচ্ছেন বোঝা গেল। আমার দিনগুলোও স্নেহরসবঞ্চিত হয়ে কিছু বিস্বাদ হয়ে গেল। যাক, আর কদিনই বা। সময়ও ফুরিয়ে এসেছে আমার। এমনি আরো দিন পাঁচেক কাটল।

সেদিন রাত্রে ময়নার ডাকে আমার ঘুম ভেঙে গেল। বেরিয়ে দেখি, টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। ময়না হাউ-মাউ করে যা বললে, তার অর্থ হচ্ছে, বড়ুয়া মাসি পা পিছলে পড়ে গেছেন। অজ্ঞান হয়ে আছেন। শিগ্‌গির চলুন।

তাড়াতাড়ি করে নিচে নামলুম। বড়ুয়া মাসির বাসাটা রাস্তা থেকে একটু উঁচুতে। খানিকটা পাকদণ্ডি বেয়ে উঠতে হয়। কিছু দূর উঠেই বড়ুয়া মাসির পা পিছলে গেছে। প্রায় ফুট দশেক গড়িয়ে পড়েছেন। কয়েক জায়গা থেঁতলে গেছে। হাঁটুটা জখম হয়েছে বেশী। এখানে ওখানে রক্ত মাখা। আর ওঁর সঙ্গী নেপালী চাকরটা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দুজনে ধরাধরি করে তুলে আনলুম। ওঁকে শুইয়ে দিলুম বিছানায়। বাহাদুর ডাক্তার ডাকতে ছুটল। আমি আর ময়না ওঁর বিছানার পাশে বসে থাকলুম। শুশ্রূষা যা করবার ময়নাই করতে লাগল। আমি বসে বসে ঘরখানা দেখতে লাগলুম। পরিষ্কার ঘর। বেশ প্রশস্ত। সবচেয়ে চোখে পড়ল ড্রেসিং টেবিলটি। আরে বাপ! আমার মনে হল সেটা মনোহারী দোকান। মাসি যে কেমন বিলাসিনী, তার পরিচয় এক ড্রেসিং টেবিলটাতে মেলে। শুধু যে নানারকম কসমেটিক্স তা নয়, কত রকম পুস্তিকা, কত যে বিলাতী ম্যাগাজিন তার ইয়ত্তা নেই। যৌবনকে বন্দী করে রাখবার কি আপ্রাণ চেষ্টা যে এই মহিলাটি করছেন, তার পরিচয় পেয়ে ওঁর উপর করুণা হল।

মাসি উঃ করতেই আমি এগিয়ে গেলুম।

একটু ঝুঁকে পড়ে জিগ্যেস করলুম, "মাসি, যন্ত্রণা হচ্ছে?"

দশদিন পরে বড়ুয়া মাসির সঙ্গে আবার আগের মতো কথা বললুম।

বড়ুয়া মাসি অতিকষ্টে মুখে হাসি ফোটালেন। মিন মিন করে বললেন, "আমার উপর রাগ করেছ?"

বললুম, "না না।"

বড়ুয়া মাসির চোখে জল এসে গেল।

বললে, "আমার উপর রাগ করো না। আমি বড় দুঃখী।"

ডাক্তারবাবু যখন এলেন, ততক্ষণে বড়ুয়া মাসি খুব কাতর হয়ে পড়েছেন। যন্ত্রণার আঁচ লেগে বড়ুয়া মাসির মুখ থেকে প্রসাধনের পালিশ খ'সে পড়েছে যেন। সে কাতর অসহায় মুখখানা কোনোদিন ভুলতে পারব না। একখানা হাত দিয়ে আমার হাতখানা চেপে ধরেছিলেন। আর যন্ত্রণায় উঃ আঃ শব্দ করছিলেন। যত বিরাগ ওঁর প্রতি পুষে রেখেছিলুম, তা সব জল হয়ে গেল।

ডাক্তারবাবুর বেশ বয়স হয়েছে।

ঘরে ঢুকেই বললেন, "কি মনোরমা?"

বড়ুয়া মাসি যেন কিঞ্চিৎ অভয় পেলেন বলে মনে হল।

বললেন, "এসো ডাক্তার। বোধহয় পা'টা ভেঙেই গেছে।"

আমি আমার ঘরে চলে এলুম, ঘুম দিতে চেষ্টা করলুম। কিন্তু ঘুম এল না। বড়ুয়া মাসির ঘরে শব্দ হচ্ছে, ডাক্তারবাবু আপন মনে কাজ করছেন, উঃ আঃ যন্ত্রণার শব্দও পাচ্ছি। তারপর বড়ুয়া মাসির আওয়াজ আর পেলাম না। বুঝলুম ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি বাইরে পায়চারি করতে লাগলুম।

ডাক্তারবাবু বেরিয়ে আসতে মুখোমুখি দেখা।

জিগ্যেস করলুম, "সাংঘাতিক কিছু?"

ডাক্তারবাবু জবাব দিলেন, "না, না সামান্য ফ্র্যাকচার। তবে শক্ পেয়েছে বেশী।"

দেখলুম, ডাক্তারবাবু বেশ গপ্পে লোক।

বললেন, "আজ আর ফিরছি না মশাই, রাত তো কাবার হয়ে এল। আসুন বসে বসে গল্প করি।"

কথায় কথায় বড়ুয়া মাসির কথা উঠল। আমিই তুললুম। ওঁর এই সাজের ঘটার কথা তুলে বললুম, "বলুন তো কি বিসদৃশ।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "বিসদৃশ! তা হবে।"

বলে উঠে গেলেন। ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলে ইস্তক মর্মপীড়া

অনুভব করছিলুম। দিলুম বোধহয় ভদ্রলোকের মনে চোট দিয়ে।

ডাক্তারবাবু ফিরে এলেন, হাতে ক্যাবিনেট্ সাইজ্ একখানা ফটো।

বললেন, "দেখুন, চিনতে পারেন?"

ফটোখানা ড্রেসিং টেবিলের উপর দেখেছি। বড়ুয়া মাসির কুমারী বয়সের ছবি। খুবই সুন্দরী ছিলেন। বড়ুয়া মাসির সে চেহারা বদলে গেছে কবে। কিন্তু সাজসজ্জাটি অবিকল রেখেছেন। সেই কুমারীকালের।

ডাক্তারবাবু তারপর দু' ঘণ্টা ধরে বড়ুয়া মাসির গল্প শুনিয়ে গেলেন, সে এক অদ্ভুত কাহিনী।

সেই স্তব্ধ রাত্রি। সেই নির্জন পরিবেশ। ডাক্তারবাবু, ধীরে ধীরে বড়ুয়া মাসির গল্প শুনিয়ে চলেছেন। বাইরে তখন বৃষ্টি, কাঁচের জানলায় তার ঝর্ ঝর্। বাইরে তখন বাতাস, পাইনের পাতায় তার সরসর। ময়না একটা টিপয়ে আলো রেখে গেল। দু' কাপ গরম কফি দিয়ে গেল। আমার শীত শীত করছিল, একবার উঠে গিয়ে চাদর গায়ে জড়িয়ে এলাম। তারপর নির্বাক হয়ে এই প্রৌঢ় ডাক্তারের মুখে এক আশ্চর্য কাহিনী শুনে গেলাম।

ডাক্তারবাবু বললেন, "আমরা তিনজনেই মনোরমাকে ভালবাসতাম—আমি, ক্যাপ্টেন ঘোষ আর ডক্টর বড়ুয়া। এ আমাদের কলেজী জীবনের কথা। কিন্তু মনোরমা ভালবাসত সুজিত ঘোষকেই। আমি আর নরেশ, ডক্টর এন সি বড়ুয়া, তা জানতাম। বড় কষ্ট পেতাম। কিন্তু তবু মনোরমাকে ভালবাসতাম। সুজিত বরাবরই বড় ডেয়ারডেভিল। যা ওর কাম্য তাকে ছিনিয়ে নিতে জানে। আমরা ছিলাম ওর দুর্বল প্রতিযোগী। নিজেদের দুর্বলতার জন্য আমরা দুজন নিজেদেরকে কতদিন ধিক্কার দিয়েছি। পাল্লাটা যে সুজিতের দিকেই ভারী সে কথা জানতাম। কিন্তু তবু তাকে ঈর্ষা করিনি। আমরা যা পেলাম না, যা না পেয়ে অশেষ দুঃখ ভোগ করছি, সুজিত যদি তা পায়, পেয়ে সুখী হয়, তো হোক সুখী।"

ডাক্তারবাবু নড়েচড়ে বসলেন, সিগারেট বের করে আমার দিকে একটা বাড়িয়ে দিলেন, নিজে একটা ধরালেন।

তারপর বললেন, "মনে পড়ে মনোরমার সেদিনের খুশীতে উজ্জ্বল মুখখানা। সকালে এসে নেমন্তন্ন করে গেল। ওর আর সুজিতের বাগদান হবে। সেই উপলক্ষে মনোরমার বাড়িতে একটা প্রীতি সম্মেলন হবে বিকালে। মনোরমার সেদিনের চেহারাটাও বড় উজ্জ্বল হয়ে আছে। আজ

ওর চেহারা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু সেদিন ছিল অপূর্ব সুন্দরী। এই ছবিটা দেখুন। সেইদিনই তোলা।"

ছবিতে বড়ুয়া মাসির সেই প্রথম যৌবনের চেহারা। সত্যিই খুব সুন্দরী ছিলেন। আর চেহারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে পোষাকটাও পরেছিলেন অপূর্ব। আশ্চর্য হলাম, বড়ুয়া মাসি সেই বাগদান দিনের পোষাকের মায়া ছাড়তে পারেননি দেখে। সেদিন তাঁকে যা মানিয়েছিল, আজও কি তাই মানায়? বড়ুয়া মাসি সেদিনের পোষাকটি আঁকড়ে থাকলে কি হবে, সেদিনের বয়েসটা যে চলে গেছে, তা কি তিনি বোঝেন না?

"কিন্তু মজা দেখুন", ডাক্তারবাবু বললেন, "যে ঘটা করে এই ছবিখানা তোলাল, সেই শেষ পর্যন্ত মনোরমার প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করল। সুজিতের কিছু দোষ ছিল জানতাম, কিন্তু সেটা যে এত বড় স্কাউণ্ড্রেল, তা আমরা কেউ বুঝতে পারিনি। মনোরমার বাবার কাছ থেকে কিছু টাকা বাগিয়ে নিয়ে, বিয়ের আগেই সুজিত ভেগে পড়ল এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ের সঙ্গে।

"মনোরমা আত্মহত্যা করত, এমন ভাবেই ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু বাঁচিয়ে দিল বড়ুয়া। কি করে যে সে অসাধ্য সাধন করল, সেই জানে। কিছুদিন পরে বড়ুয়া মনোরমাকে বিয়ে করল। আর সত্যি, দুজনের ম্যাচও হয়েছিল ভাল। কুড়ি বছর ঘর করল, পরম শান্তিতে।"

ডাক্তারবাবু চুপ করলেন। কি যেন ভাবছেন গভীরভাবে।

একটু পরে বললেন, "কিন্তু ওদের কুড়ি বছরের মিলিত জীবনে আমিই চিড় খাইয়ে দিলাম বোধ হয়। বছর দেড়েক হ'ল, সুজিত এসে আশ্রয় নিল আমার ক্লিনিকে। সে তখন আর্মি ক্যাপ্টেন হয়েছে। আফ্রিকার যুদ্ধে মণ্টগোমারীর বাহিনীতে ছিল। বোমা খেয়ে মরমর। একটি কিডনী নষ্ট হয়ে গিয়েছে ওর। অন্যটা দিয়ে কাজ চালাচ্ছিল, এবার সেটাও যাবে। তদ্বির করে সুজিত মিলিটারী হাসপাতাল থেকে সোজা আমার তত্ত্বাবধানে চলে এল। বলল, মরব জানি, তাই তোর কাছেই মরতে এলাম।"

"সেবার বড়ুয়ারাও এল। ওদের এই বাড়িটা তো ছিলই। বছরে পুজোর সময় আসত। দিনগুলো ওদের সাহচর্যে ভালই কাটত। এবারে সুজিতকে আমার ওখানে দেখে ওরা বিব্রত হল। নরেশ তো মহা বিরক্ত। যত বলি, ও অন্তিমে পৌঁচেছে, ওর উপর রাগ দ্বেষ বৃথা। নরেশ শোনে না। পরদিনই কার্সিয়াং ছেড়ে দার্জিলিং চলে গেল।

"সুজিত এ ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। বুঝল সব। নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্তও হ'ল। ওর স্বাস্থ্যেরও দ্রুত অবনতি ঘটল। আমাকে বলল, এবার বাঁচব না, মরবার আগে মনোরমার কাছে ক্ষমা চাইব। মনোরমাকে লিখলাম, সুজিতের রোগের বিবরণও লিখলাম। চিঠি পেয়ে মনোরমা নিজেই এল, নরেশ এল না। এই ঘটনা উপলক্ষ্য করে, শুনলাম নরেশ আর মনোরমার মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। নরেশের ধারণা মনোরমা সুজিতকে ভুলতে পারেনি। সে কলকাতা চলে গেল।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "যতই দিন শেষ হয়ে আসছে সুজিতের, ততই ওর আবদার বাড়ছে। বাধা দিলে কষ্ট পায়। আর এই শেষ দিন কটা ওকে কষ্ট দেওয়া কেন। তাই মনোরমা মুখ বুজে একটার পর একটা আবদার মিটিয়ে চলেছে। এই বয়েসে ওকে রং মেখে আবার কলেজী মেয়ের সাজ পরতে হচ্ছে। সুজিত ওকে যে সময় বঞ্চনা করেছিল, সেই সময়টা আবার ফিরে চায়, প্রাণভরে ক্ষমা চাইবে। মনোরমাকে তাই বাগদানের পোষাক পরতে হচ্ছে। মনোরমা জানে, সাধারণের চোখে এটা কত দৃষ্টি-কটু। তবুও পরে। ও তো সাধারণের কাছে যায় না, যায় সুজিতের কাছে। আপনার চোখে এটা বিসদৃশ লাগবে তাতে আর আশ্চর্য কি?"

ডাক্তারবাবু থামলেন, তারপর একটু পরে মৃদু হেসে বললেন, "প্রেমের ব্যাপারটাই এই রকম বিসদৃশ মশাই।"

॥ সতের ॥

এককালে রাজনীতি করতাম। নিরুদির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সেই সূত্রেই। সেই পরিচয় খুবই ঘনিষ্ঠতায় দাঁড়িয়েছিল।

নিরুদির দৃঢ় ব্যক্তিত্ব, তাঁর স্নেহ-মমতার অনাবিল প্রকাশ, তাঁর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছিল আমাকে। এমন অতিথিবৎসল আমি কম দেখেছি। কি করে তাঁদের চলত জানি নে, কিন্তু সব সময়েই তাঁদের বাড়িতে লোকের ভিড় লেগেই থাকত। আমিও বহুবার নিরুদির ওখানে খেয়েছি, থেকেছি, তাও আবার অতি দুঃসময়ে।

একদিনের কথা মনে আছে। আমাদের পার্টির সদর দপ্তরের একটা কামরায় শুয়ে জ্বরে ধুঁকছি, খাওয়া জোটে নি, এমন অনেকদিনই জুট্‌ত না, হঠাৎ নিরুদি এসে হাজির। তন্দ্রা এসেছিল, কপালে একখানা শীতল হাতের স্পর্শ পেতেই চোখ মেললাম। বড় ভাল লাগল নিরুদিকে। মৃদু হাসলাম। নিরুদিও হাসলেন।

"কিরে, কবে এসেছিস্, কদিন পড়ে আছিস এখানে?"

"হবে দিন চারেক।"

"চারদিন! এই জ্বর গায়ে! কেন আমার ওখানে যেতে কি হয়েছিল?"

"না না, মিথ্যে আবার কাউকে কষ্ট দেওয়া কেন?"

"হুঁ। ভদ্রতা শিখেছিস্। লোফারী ছাড়লে বিপ্লব কি এগুবে? নে ওঠ্। নিজে নিজে পারবি, না ধরব?"

উঠতেই হল। যেতেও হল। নিরুদি এই ধরণের মানুষ।

নির্মলা সেনকে নিরুদির বাড়িতেই দেখি। ওইখানেই থাকত। বছর সতের মেয়েটির বয়েস, রূপ ছিল না মোটেই, বেঁটে, আঁটসাঁট গড়ন, নিতান্ত গ্রাম্য চেহারা। সমগ্র মুখটিতে একটা মোটাবুদ্ধির ছাপ। প্রথম দর্শনেই বীতরাগ জন্মায়। প্রায় কথাবার্তাই বলত না। তবু ওর নিঃশব্দ উপস্থিতি আমাকে পীড়িত করত।

আমরা যখন গভীর রাত পর্যন্ত রাজনৈতিক আলোচনায় মগ্ন থাকতাম, পার্টির আসন্ন বাৎসরিক সম্মেলনে পেশ করবার জন্য বিভিন্ন প্রস্তাবের খসড়া করতাম, নিজের মতটাকে অভ্রান্ত প্রমাণ করবার জন্য উত্তেজিত-

ভাবে তর্ক করতাম, ঝগড়া করতাম, নির্মলা তখন তার বোকা অস্তিত্বটাকে নিয়ে নিরুদির আড়ালে চুপ করে বসে থাকত। কেউ জল চাইলে এনে দিত, মাঝে মাঝে চা বানিয়ে এনে ঝিমিয়ে পড়া উৎসাহকে চাঙ্গা করে তুলত।

নিরুদি ওকে খুব স্নেহ করতেন, নির্মলাও খুব ভালবাসত তাঁকে। এই নিয়ে আমরা অনেক ঠাট্টা-তামাসা করতাম। নির্মলা সেগুলো বুঝত কিনা সন্দেহ। নিরুদি হেসে তার জবাব দিতেন।

"আসল কথা তোরা ওকে হিংসে করিস্। তা বাপু ওকে না হয় একটু বেশী ভালবাসি, কি হয়েছে তাতে। বিপ্লবীর দলে টিপ-ছাপ দিয়েছি বলে কি স্নেহ-মমতা সব রবার দিয়ে ঘষে তুলে দিয়েছি? তা তোরাই বা সব কেমন বিপ্লবী অ্যাঁ? জলজ্যান্ত একটা মেয়েকে কাজে নামাতে পারিসনে।"

নির্মলা কি কাজে অন্য ঘরে গিয়েছিল। সুযোগটা বৃথা যেতে দিলাম না।

"ওই গবাকান্ত মেয়েটাকে দিয়ে রাজনীতি করাতে চান? বলিহারী পছন্দ আপনার। ও মেয়ে সমাজে আগুন ধরাবে কি, উনুনে ফুঁ দিতেই তো ওর জন্ম।"

নির্মলা ঢুকতেই চুপ করে গেলাম। নিরুদি হাসতে লাগলেন।

"বাচ্চা বিপ্লবী কি না, তেজ একটু বেশী তোর, গোখরোর ড্যাঁসে ছোবল বেশী দেয়। কি রে নিমু, ভিড়বি নাকি এদের দলে? তোর ভবিষ্যৎ ভেবে তো ছোঁড়াদের আহার নিদ্রা বন্ধ হবার জো হয়েছে।"

নিরুদির কথাটা শুনে নির্মলা ঠোঁটের এমন একটা কদর্য ভঙ্গী করল যে, আমার পিত্তি অবধি জ্বলে গেল।

"আমার বয়ে গেছে ধিঙ্গিপনা করতে।"

নিরুদি হেসে ফেললেন।

"তা তুই কি করতে চাস্?"

নির্মলা নিরুদির মুখের উপর বোকা চোখ দুটো তুলে বললে, "কেন, সব মেয়ে যা করে, আমিও তাই করব। বিয়ে-থা করে ঘর সংসার করব। রাস্তা দিয়ে ধেই ধেই করে নেচে বেড়ান আমার দ্বারা হবে না। দেখলেই গা জ্বালা করে আমার।"

ছি ছি এই প্রতিক্রিয়াশীল মেয়েটার উপর নিরুদির এত টান! নিরুদি যেন খুব মজা পেয়েছেন। আরো জোরে হেসে উঠলেন।

"ও মা, মেয়ের পেটে পেটে এত! তা হ্যাঁরে, আমি যে হৈ হৈ করে

ঘুরে বেড়াই। তাহলে আমাকে দেখেও তো গা জ্বালা করে তোর?"

"করেই তো। তোমার ওইটুকুই তো দেখতে পারিনে আমি।"

নিরুদির হাসি এবারে দেয়ালে দেয়ালে কাঁপন ধরাল। বেশ খানিকটা পর সামলাতে পারলেন।

"কাকে বিয়ে করবি, তাও কি ঠিক করে ফেলেছিস্ নাকি? এদের মধ্যে কেউ?"

মেয়েটা ফাজিলও বটে।

মুখ টিপে হেসে জবাব দিল, "বিচিত্র কি, হতেও পারে।"

নির্মলার কাছ থেকে রসিকতা আশা করি নি। যে রকম সেকেলে ধরণের মেয়ে, ও যে নিরুদির সঙ্গে তাল ঠুকে চলবে, ভাবিই নি। নিরুদিও ছাড়বার পাত্রী নন। নির্মলার জবাব পেয়ে প্রথমটা একটু থমকে গেলেন, হয়ত বা গম্ভীরও হলেন কিছুটা। কিন্তু সে ক্ষণিক। পরমুহূর্তেই খিল খিল করে হেসে উঠলেন স্বভাবসিদ্ধভাবে।

"কাকে রে, এই এইটাকে না কি?"

চমকে উঠলাম। নিরুদির গলায় ছিল প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ। আমার মুখে-চোখে রক্ত চল্‌কে উঠল। নির্মলাও লজ্জা পেল বোধ হয়। ধ্যেৎ বলে পাশের ঘরে চলে গেল। আমার বেজায় রাগ হল।

নিরুদির বিদ্রূপটা ফিরিয়ে দেবার জন্য তিক্তভাবে বলে উঠলাম, "আর পাত্রী পেলেন না নিরুদি। শেষ পর্যন্ত একটা নির্বোধ, গেঁয়ো, প্রতিক্রিয়া-পন্থী মেয়ে জোটাতে চাইলেন। বেশ পছন্দ আপনার।"

হঠাৎ থেমে গেলাম। নির্মলা চা নিয়ে ঢুকছে। আমার কথাগুলো শুনতে পেয়েছে সন্দেহ নেই। ওর মুখের তেলতেলে ভাবটিতে কোন রূপান্তর দেখলাম না। হয়ত লজ্জাই পেয়েছিলাম। হঠাৎ উঠে বেরিয়ে পড়লাম। কিসের থেকে কি হয়ে গেল। হঠাৎ রেগে গিয়ে যে অভদ্রতাটা করলাম, সেই লজ্জায় যে-ক'দিন কলকাতায় ছিলাম সেবার, আর নিরুদির বাড়িমুখো হইনি।

প্রায় ন' মাস পরে কলকাতায় ফিরলাম। শ্রমিক আন্দোলন করি। পার্টির নির্দেশে সংগঠনের কাজে বাইরে কাটাতে হল এ কয় মাস। নিরুদি সে ব্যাপারে কিছু মনে করেন নি, তা তাঁর চিঠির মারফতেই জেনেছি। দিব্যি-দিয়ে অনুরোধ করেছেন, কলকাতায় ফিরেই যেন দেখা করি।

তবু বাধ বাধ ঠেকছিল নিরুদির বাড়ীতে ঢুকতে। শেষ পর্যন্ত সব সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে দিলাম। উঠে গেলাম দোতলায়। নিরুদি ছিলেন না, শুধু নিশীথবাবু অর্থনীতির উঠোনে দানা খুঁটে ফিরছিলেন। আমাকে

দেখেই জি ডি এইচ কোলকে ঘুম পাড়িয়ে মোটা চশমাটা খুলে রাখলেন। তারপর গব্‌দা গব্‌দা হাত দুখানা বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন।

"বিপ্লবীপ্রবর যে! এস এস। তারপর কোত্থেকে?"

"আপাতত এখান থেকেই। তা কলেজ যাননি যে? গিন্নী কোথায়?"

"আরে বস বস। কলেজ বন্ধ। আর আমার গিন্নী যেদিন থেকে তোমাদের নিরুদি হয়েছেন, সেদিন থেকেই কপালে চড় মেরে হদিশ রাখা ছেড়েছি।"

হা-হা করে হেসে উঠলেন। খুব জমাটি লোক। এ কথায় সে কথায় ঘণ্টাখানেক কাবার হবার পর সিঁড়িতে নিরুদির সাড়া পেলাম। নিরুদি ঢুকলেন, পেছনে নির্মলা। নির্মলাকে দেখে হাঁ হয়ে গেলাম। এ কী পরিবর্তন! দিব্যি হাল-ফ্যাশানে শাড়ি পরেছে, তার সঙ্গে মানানসই চুল-বাঁধা আর প্রসাধন। সেই গ্রাম্য জড়তা নেই। এসেছে শহুরে ক্ষিপ্রতা। আমার মনে হল, আগেই বরং ছিল ভাল। ওর চেহারায় গ্রাম্যতাটাই মানানসই। এমনিতেই ও কুরূপা। গ্রাম্য লাবণ্য তাতে বরং কিছু শ্রী যোজনা করেছিল। শহরের স্মার্টনেসে সেটুকু নষ্ট হয়েছে। ওকে বড় উগ্র দেখাচ্ছে, একটু যেন চটুল, অশ্লীলও বা। নির্মলা হেসে ভেতরে ঢুকে পড়ল। নিরুদি ধপাস্‌ করে বসে পড়লেন পাশে।

"একটু রোগা হয়ে গেছিস। চুল ছাঁটিসনি কেন?"

নিরুদির এই সস্নেহ জিজ্ঞাসাবাদে ছন্নছাড়া মনে শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিল। কৌতূহল দমন করতে পারলাম না। সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করে বসলাম।

"নির্মলা সেনের ব্যাপারটা কি?"

আমার বিমূঢ় ভাব দেখে নিরুদি হেসে ফেললেন।

"বড় যে সেদিন ঠোঁট উল্টেছিলি। এবার প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দিচ্ছে। আর কত কাজ করে জানিস? টালিগঞ্জ ধানকল মজদুর ইউনিয়নের ও সম্পাদিকা হয়েছে এবার। দ্যাখ না, নারী শ্রমিক আন্দোলনের ফোরফ্রণ্টে ও এল বলে। এমন খাটিয়ে কর্মী আমি আর দুটি দেখিনি।"

বিদ্রূপ করে বললাম, "আবার শ্রমিক আন্দোলন কেন? ঘর-সংসারের ভবিষ্যৎ কি হল?"

নিরুদি হেসে বললেন, "বড় উপর উপর দেখে তোরা বিচার করিস। চামড়ার নীচে কার কি আছে, তা কি বলতে পারিস? হৃষীকেশকে নির্মলার ভার তুলে দিয়েছি। কি করলে দ্যাখ। ঘর-সংসার সব ছুটিয়ে দিয়েছে।

ক্লাশ এইট পর্যন্ত পড়েছিল দেশে থাকতে, হৃষীকেশ এইবারই ওকে পরীক্ষা দেওয়াবে। তাছাড়া পলিটিক্সেও ওর মাথা বেশ।"

নিরুদির কথা শুনে নির্মলার উপর যতটা শ্রদ্ধা বাড়ল, তার দ্বিগুণ বাড়ল হৃষীকেশদার উপর। অক্লান্ত কর্মী হৃষীকেশদাকে বরাবরই শ্রদ্ধা করি। জেলে-জেলেই কেটে গেছে তাঁর যৌবনের অধিকাংশ দিন। কি আত্মত্যাগ! প্রায় চল্লিশ বছর বয়স, কিন্তু এখনো কি তারুণ্য! ওর সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে আমরাও পেরে উঠতাম না। তাই শ্রদ্ধা করতাম, ভয় করতাম ওকে। একদিনের কথা মনে আছে, বলেছিলেন, আর তো কিছুই চাইনে ভাই। টাকাকড়ি, পদ-পজিশন কিছুরই আকাঙ্ক্ষা নেই। পার্টির ইতিহাস যেদিন লেখা হবে, সেখানে যদি লেখা থাকে এই হৃষীকেশ বসু— এই বিশ্বস্ত কমরেড তার কর্তব্য পালন করেছেন যথাযথভাবে। তবেই আমি কৃতার্থ। এই হৃষীকেশদাই আমার আদর্শ। স্বয়ং তিনি ভার নিয়েছেন নির্মলার আগ্রহ, দেখলাম ওর প্রকৃত কর্মী-রূপটি। ওর উপর শ্রদ্ধা হল,

নির্মলা চা করে আনল। আমি খেতে লাগলাম, ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খোঁজখবর নিতে লাগল। রেল-শ্রমিক সংগঠনে কাজ করি। শ্রমিকদের অবস্থা, সংগঠনের শক্তি, সব এক এক করে জেনে নিল নির্মলা। দেখলাম নির্মলার আগ্রহ, দেখলাম ওর প্রকৃত কর্মী রূপটি। ওর উপর শ্রদ্ধা হল, ওকে বড় ভাল লাগল। বিরূপ মনোভাব কোনকালে পোষণ করেছিলাম, এজন্য নিজের উপর আজ লজ্জা হল। তিরস্কার করলাম নিজের বুর্জোয়া মনকে।

সে রাত্রে নিরুদির ওখানে থাকলাম। পরদিন সকালে নিরুদি হৃষীকেশদার সঙ্গে কোথায় বেরিয়ে গেলেন। আমিও বেরুবো, দেখি নির্মলা। সাজ-গোজ সারা করে বাইরের ঘরে হাজির।

"এই যে, কোথায় বেরুচ্ছেন, বা রে! দিদি বলে গেল আমার সংগঠনের অফিসে আপনাকে নিয়ে যেতে, যাবেন না?"

"তাই নাকি, কই আমাকে তো কিছু বলে গেলেন না।"

"কেন আপনার কি তাড়া আছে?"

"না।"

"তবে আর কোন ওজর চলবে না, চলুন। আপনারা হলেন ঝানু কর্মী, আপনাদের কাছ থেকে কত শিখবার আছে। চলুন তো, ভুলচুকগুলো দেখিয়ে দেবেন। জানেন, সামনের ডিসেম্বরে সারা বাঙলা ধানকল মজদুর সম্মেলন ডাকব ভাবছি। পেরে উঠব কি না, সেইটাই কথা। একে তো এরা সংগঠন ফংগঠনের ধার ধারে না। কবে যে এদের মধ্যে চেতনা আসবে।"

নির্মলার সঙ্গে সমস্ত দিন ঘুরলাম ঢাকুরে আর টালিগঞ্জে আর শা'পুরের ধানকলগুলোতে। বিকেল নাগাত গলিতঘর্ম দুজনে ফিরছি। নির্মলা আমার হাতে আবেগভরে একটা চাপ দিল। ওর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল।

"কমরেড, যশ চাইনে, পদ চাইনে, কিছুই চাইনে। যেদিন পার্টির ইতিহাস লেখা হবে, সেই ইতিহাসের কোনখানে যদি একটা লাইনও লেখা থাকে—নির্মলা সেন—এই বিশ্বস্ত কর্মী কর্তব্য করে মরেছে—তবেই আমার সব পাওয়া হয়ে গেল।"

বুঝলাম কোন্ মন্ত্রে হৃষীকেশদা নির্মলার নবকলেবর দান করেছেন।

নির্মলার ম্যাট্রিক পাশের খবরে ওকে টেলিগ্রাম করে অভিনন্দন জানালাম। উত্তরে ও লিখল একখানা সংক্ষিপ্ত চিঠি। ২৭শে ডিসেম্বর আমাদের সারা বাঙলা ধানকল শ্রমিক সম্মেলন। অবশ্য করে আসবেন।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি জেলে গেলাম রেল-ধর্মঘটের ব্যাপারে। ছাড়া পেলাম মার্চে। প্রায় বছর দেড়েক বাদে কলকাতায় ফিরলাম। বিকালে নিরুদির সঙ্গে দেখা। বাড়িতেই ছিলেন। নিরুদি স্বভাবসিদ্ধ হাসিটা হাসলেন।

"কবে ছাড়া পেলি?"

"পরশু সকালে।"

"বাড়ি যাসনি?"

"না, তবে যাবার পথেই।"

"আজ তাহলে থেকে যা।"

আমারো ইচ্ছে তাই। নির্মলার কাছ থেকে ধানকল শ্রমিক সম্মেলনের খবরটা নিতে হবে। কিন্তু তখন নির্মলাকে কোথাও দেখলাম না। রাত্রে খাবার সময়ও এসে পেঁছাল না।

"নিরুদি, নির্মলাকে দেখছিনে?"

নিরুদির সদা-হাসি মুখটা একটু কালো হয়ে গেল। তবে সে ক্ষণিক।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, "নির্মলা আমার এখান থেকে চলে গেছে।"

চমকে উঠলাম।

"সে কি! কেন? কোথায় গেল?"

"ঝগড়া করে চলে গেছে। কোথায় আছে জানিনে। খবর দেয়নি, পাইওনি।"

নিরুদিকে বড় ক্লান্ত মনে হল।

বাড়ি গেলাম। সেখান থেকে কর্মস্থলে। যুদ্ধটা একটা সুযোগ এনে দিয়েছে। পাছে ধর্মঘট বাধে, যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ব্যাঘাত জন্মে, এই আশঙ্কায় শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া মানবার দিকে ঝোঁক দিয়েছেন সরকার। তাই সংগঠনের কাজ বেড়েছে। দিনরাত খাটতে হচ্ছে। কারো খোঁজ-খবর করবার ফুরসৎ নেই। নিরুদির চিঠি অনিয়মিত হতে হতে আসা বন্ধ হয়ে গেল। এমন সময় একদিন হঠাৎ নির্মলার কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলাম। লিখেছে, নিরুদি মরতে মরতে বেঁচে উঠেছেন। ডাক্তারের মতে বায়ু পরিবর্তন দরকার। আপনার ওখানে কি সুবিধে হবে? যাব আমি, নিরুদি আর হৃষীকেশদা।

টেলিগ্রাম করে দিলাম আসতে। কার্সিয়াং-এ দুটো ঘরের বন্দোবস্তও করে ফেললাম।

ওদের আনতে স্টেশনে গিয়েছিলাম। দেখা হতেই নিরুদি হাসলেন। শক্ত একটা অস্ত্র করতে হয়েছে, তাই খুব কাহিল হয়ে পড়েছেন। নির্মলার আরো একটু মাংস লেগেছে। ও-ও হাসল। হৃষীকেশদার কোন পরিবর্তন নেই। তেমনি গম্ভীর, তেমনি ব্যস্ত। দুদিনের বেশি থাকতে পারলেন না, প্রচুর কাজ পড়ে আছে।

একদিন নির্মলাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায় পালিয়েছিলেন ঝগড়া করে?"

নির্মলা জবাব দিল না, শুধু হাসল।

নিরুদি বললেন, "যত পাগল নিয়ে হয়েছে আমার জ্বালা। গেল তো গেলই, কোনো খোঁজখবর নেই। পরে শুনলাম মেয়ে চাকরী করছেন। থাকেন ওয়াই ডবলিউ সি এ'তে। বড় রাগ হলো। গড়ে-পিটে যাকে মানুষ করলাম, তার পাখা গজালো কি অমনি সুড়ুৎ। আমিও আর খোঁজখবর করলাম না। তারপর তো পড়লাম অসুখে। পর পর অজ্ঞান হয়ে যাই। একদিন জ্ঞান হতে চোখ খুললাম। দেখি মূর্তিমতী শিয়রে বসে পাখা করছেন, ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। বলল, ঘাট হয়েছে দিদি আমায় মাপ করো। ওই যে মেয়ে এলো, আর গেল না। চাকরী গেল, জিনিসপত্র কোথায় রেখে এসেছিল তা গেল। দিনরাত নেই, খাওয়া-দাওয়া নেই, আমাকে চাঙ্গা করে তুলল।"

নির্মলার চোখ ছলছল করে উঠল।

"বেঁচে যে উঠেছ এই আমার ভাগ্য।"

নিরুদি হাসলেন। গলাটা তখনো ধরা ধরা।

"বেঁচে গেলাম মেয়েটার সেবার জোরে।"

নির্মলা এবার তাড়া লাগালো।
"থামো তো এবার। সেই থেকে শুধু বকবকানি চলেছে।"

ওরা কলকাতায় যাবার পর পৌঁছা সংবাদটা নির্মলাই দিয়েছিল। তারপর আর কোনো চিঠিপত্র পাইনি। আমার চিঠির জবাব এল দু' মাস পরে। নিরুদি লিখেছেন। শরীর ভাল আছে। তবে মনটা বিশেষ ভাল নেই। নির্মলা এখানে নেই। ওকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে বাধ্য হয়েছি। ওর মতো মেয়েকে কোনো ভদ্রলোকের বাড়িতে রাখা চলে না। শুনেছি নাকি 'ওয়াকাই'তে ভর্তি হয়েছে। এই ওর উপযুক্ত কাজ। পার্টি থেকেও ওকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। হৃষীকেশ নিজেই প্রস্তাব এনেছিল। আর কি?

চিঠিখানা পেয়ে বেশ বিস্মিত হয়েছিলাম। নিরুদি যে কাউকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারে এ আমার কল্পনার অতীত, তাও আবার নির্মলাকে। অপরাধ নিশ্চয়ই গুরুতর নইলে হৃষীকেশদা নিজে ওকে পার্টি থেকে তাড়িয়ে দেন? নির্মলার প্রতি মনটা একটা অহেতুক বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল। তেমনি নিরুদি আর হৃষীকেশদার উপর শ্রদ্ধা বাড়ল গভীর-ভাবে। নির্মলা যে ওদের কতখানি ছিল আমার চেয়ে তা আর কে বেশি জানে। তবু কর্তব্য কর্তব্যই। সবার উপর পার্টিই সত্য।

অনেক দিন কলকাতায় যাইনি। নিরুদিদের খোঁজখবরও পাইনি। ডি টি এস সাহেবের দুর্ব্যবহারে লালমণিরহাটে হঠাৎ ধর্মঘট হয়ে গেল। কলকাতা থেকে এত তাড়াতাড়ি কেউ আসতে পারলে না। আমাকে ছুটতে হল। লালমণিরহাট পৌঁছে দেখি হুলস্থূল কাণ্ড। কোথাও শৃঙ্খলা নেই। সারাদিন ছুটোছুটি করলাম। সংগঠনের অফিসে আর ডি টি এস সাহেবের দপ্তরে। সন্ধ্যে পর্যন্ত কোনো মীমাংসা হল না। কোনো পক্ষই গোঁ ছাড়বে না। কেউ নিজের কোটের বাইরে পা দেবে না। মিটমাট হয় কি করে? এদিকে অবস্থা গুরুতর। দু-দুখানা মিলিটারী স্পেশাল আটকা পড়ে গেছে। শেষে প্রাণপণ চেষ্টায় রাত আটটা নাগাত একটা বোঝাপড়া হল। কর্তৃপক্ষ দোষ কবুল করলেন, ক্ষমা চাইলেন। শ্রমিকেরাও কাজে যোগ দিল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

এতক্ষণে মনে পড়ল সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি। সমস্তটা দিন হৈ হৈ করে কেটেছে। খাওয়ার কথা মনেই পড়েনি। সুযোগ পেয়ে ওৎ-পাতা ক্ষিধেটা প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করল। প্লাটফরমের উপর রেস্তোরাঁ।

রেল-লাইন টপকে যেই প্লাটফরমে উঠেছি অমনি মুখোমুখি নির্মলা সেনের সঙ্গে দেখা। আঁটসাট জঙ্গী কোর্তা আর টুপীতে ভারী কুৎসিত লাগছে দেখতে। চোখের নীচে গভীর দুটো কালো দাগ। সারা গায়ে থসথসে মাংস। এমন কি আমাকে দেখে যে হাসিটা ফুটল ওর ঠোঁটে সেটাও যেন একটু অস্বাভাবিক লাগল। তবু কেন জানিনে খুশীই হলাম। আমাকে মৃদু হাসতে দেখে ও একেবারে কাছ ঘেঁসে দাঁড়াল।

"তাহলে এসব আপনার কীর্তি। খুব আন্দোলন করছেন তো। সারাটা দিন আটকা পড়ে থাকলাম। তা এক পক্ষে ভালই হয়েছে। আপনার সঙ্গে দেখাটা হয়ে গেল।"

"আপনি চলেছেন কোথায়?"

"আপাতত আমাদের বাহিনী তো ইম্ফল যাচ্ছে শুনছি। তারপরে যমালয়েও যেতে পারি কি জাপানীদের হাতে পড়ে গেইসাও হতে পারি।"

খিল খিল করে হাসল নির্মলা। সেই ছেলেমানুষী ভাবটা এখনো আছে ওর। ওকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়লাম। খাবার আনতে হুকুম দিলাম।

"আর কতক্ষণ এখানে আটকা থাকব বলুন তো?"

ওর উষ্মা দেখে হেসে ফেললাম।

"আর এক ঘণ্টার বেশি নয়।"

খুব বিস্মিত হল নির্মলা। তারপরই হতাশ হল বলে মনে হল। কিন্তু সেও ক্ষণিক। তারপরই খিলখিল করে হেসে উঠল।

"কি রকম মজা তাই দেখুন। সারাদিন আটকা রইলাম এই নির্বান্ধব-পুরীতে। একেবারে একা। মন বিরক্তির শেষ সীমায় পোঁছে চলে যাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিল। আর দেখুন এখন যেই একজনের দেখা পেলাম, মন খুশি হয়ে খুঁটো গেড়ে বসবার মতলব করল, অমনি হুকুম এলো যাত্রা করবার।"

খাবার এল। যে প্রশ্নটা এতক্ষণ ঘুরপাক খাচ্ছিল মনে, খেতে খেতে সেটা করেই ফেললাম।

"কি ব্যাপার বলুন তো? নিরুদির ওখানটা ছাড়লেন কেন?"

"কেন আবার, চাকরী নিলাম বলে। আচ্ছা ওসব কথা থাক, আপনার খবর বলুন। বিপ্লব কেমন চলছে?"

"বিপ্লবের খবরে আপনার আর দরকারটা কি?"

বোধ হয় কণ্ঠস্বরটা একটু নীরস ঠেকল, তাই নির্মলা অপ্রতিভ হয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি করে বলে উঠল, "ওসব কথা থাক। আচ্ছা আর কদিন এই বাউণ্ডুলেপনা করে বেড়াবেন। এভাবে তো চিরদিন চলবে না। বরঞ্চ সময় থাকতে বিয়ে-থা করে ঘর-সংসার করুন, বুঝলেন? নইলে তো হবেন আরেকটা হৃষীকেশদা।"

মনে মনে চটে উঠলাম। নির্মলা সেই নির্মলাই আছে। তেমনি প্রতিক্রিয়াশীল, তেমনি বুর্জোয়া ভাবালুতায় টইটুম্বুর। হৃষীকেশদা আর নিরুদির সংশ্রবে এসে যেটুকু পরিবর্তন হয়েছিল তা শুধু চামড়ার উপরকার। এতক্ষণে বুঝলাম কেন হৃষীকেশদা ওকে পার্টি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বহুদিনকার পুষে-রাখা অবজ্ঞাটা আবার চাড়া দিয়ে জেগে উঠল। আমাকে চুপ করে ভাবতে দেখে নির্মলা খিলখিল করে হেসে উঠল।

"কেমন, কথাটা মনে ধরল বুঝি?"

আর চেপে রাখতে পারলাম না। মনভরা বিরাগ, বিতৃষ্ণা, অবজ্ঞা কথা হয়ে ফুটে বের হল।

"নিশ্চয়, খুব ধরেছে! এমন কি বিয়ের দিনক্ষণও ঠিক করে ফেললাম। শুধু ভাবছি পাত্রীটি কে? আপনি নাকি!"

নির্মলার হাসি হাসি মুখ মুহূর্তেই কালো হয়ে উঠল। আচমকা অপমান সহ্য করতে পারল না। চোখের কোণ বেয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়তে যাচ্ছিল। রুমাল বের করে মুছে ফেলল। তারপর অতি শান্ত কণ্ঠে বলল—"প্রগলভতা ক্ষমা করবেন, আচ্ছা নমস্কার।"

নির্মলার সঙ্গে তারপর আর দেখা হয়নি আমার। দিনে দিনে ভুলেই গেলাম ওর অস্তিত্ব। উপায়ও ছিল না মনে রাখবার। আমি তখন অন্য কাজে ব্যাপৃত। চারটে মাস চর্কির মতো ঘুরলাম সমস্ত উত্তরবঙ্গ আর আসামে। বাঙলা-আসাম রেল শ্রমিক সম্মেলন আসন্ন। তারই প্রস্তুতিতে ফুরসৎ ছিল না আর কোনো কিছুর। তাছাড়া নির্মলাকে মনে রাখবার কোনোই সঙ্গত কারণ ছিল না তো। হঠাৎ একটা জরুরী কাজে পাটনা যাবার দরকার পড়ল। কলকাতায় পৌঁছে দেখি আমার গাড়ি ছাড়তে ঘণ্টা-চারেক দেরী। কি করি এ সময়টা। মনে পড়ল নিরুদির কথা। হঠাৎ পৌঁছে চমকে দিলে কেমন হয়।

বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। নিরুদির বাসায় পৌঁছালাম। বাড়ি-ঘর অন্ধকার। পা টিপে টিপে বসবার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। পর্দার ওপিঠে তখন তুমুল বচসা চলছে নিরুদি আর হৃষীকেশদাতে।

"দ্যাখ নিরু, পার্টি ছাড়বার পর তোমার অধঃপতন দ্রুত হচ্ছে।"

নিরুদি পার্টি ছেড়ে দিয়েছে! চমকে উঠলাম। সে কি! কবে? হৃষীকেশদার ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গলা শোনা গেল।

"আর সেই অনুপাতে তোমার টাকার খাঁইও বাড়ছে। এত টাকা কর কি?"

"দেনা শোধ করি। এতদিন ধরে বিপ্লবীগুষ্ঠিকে যা খাইয়ে এসেছি তারই দেনা, বুঝলে?"

"সেই থেকে দেনাই শোধ করছ? এত দেনা জমেছে? নির্মলার টাকাগুলোতেও কি দেনা শোধ করেছ?"

"নির্মলার টাকা নিয়েছি তোমায় কে বলল!"

"যেই বলুক। ব্যাচারার এভাবে সর্বনাশ করা তোমার ঠিক হয়নি।"

নিরুদির আওয়াজ বেশ কিছুক্ষণ শোনা গেল না। চলে আসব ভাবছিলাম।

এমন সময় নিরুদি বলে উঠলেন, "নির্মলার সে টাকা আমি শোধ করে দিয়েছি।"

"শোধ করে দিয়েছ! তাই বুঝি তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে।"

"সেইটেই ভুল করে ফেলেছি হৃষীকেশ। তোমাকেও সেই সঙ্গে তাড়ান উচিত ছিল।"

"কি, কি বললে?"

"ঠিকই বলছি। এই পড় নির্মলার চিঠি। সেই টাকার প্রাপ্তি-সংবাদ জানিয়েছে। আর যা জানিয়েছে তা নিজেই পড়।"

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। আমি বুঝতে পারছিলাম না কি ব্যাপার ঘটছে। হৃষীকেশদা বলতে গেলেন, "এ, এ মিথ্যে কথা।"

নিরুদি ধমকে উঠলেন।

"থামো। আমি নিজেও এর প্রমাণ পেয়েছি। আমার অসুখের সময় প্রতিটি রাত্রে তুমি নির্মলার ঘরে ঢুকেছ। কার্শিয়াং থেকে ফিরে আসবার পরও। একদিন আমি নির্মলাকে ধরে ফেলি। ও কিছুতেই কোনো কথা বলতে চায়নি, বলেওনি। ওর তখন বড় আশা তোমাকে বিয়ে করবে। আমি ভেবেছিলাম অপরাধটা ওর। ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু এখন বুঝছি, অপরাধী নির্মলা নয়, অপরাধী তুমি। তুমি ওর সর্বনাশ করলে, কিন্তু বিয়ে করবার বেলায় নারাজ হলে। উল্টে পার্টি থেকে দিলে তাড়িয়ে।"

হৃষীকেশদা গর্জন করে উঠলেন, "চোপ চোপ, নচ্ছার মাগী।"

আর না। আর থাকা উচিত নয়। বেরিয়ে চলে এলাম। নির্মলা সেনের আর কোনো খবর পাইনি। আর খোঁজখবর পাব কি না, তাও জানিনে। তার খবরে আমার দরকারই বা কি? তবু—

॥ আঠার ॥

মুদিয়ালির কাছে রসা রোডের ফুটপাথে মাঝে মাঝে বেদেরা এসে ভিড় জমায়। কোথা থেকে যে ওরা আসে, কবে আসে, তা কেউ বলতে পারে না। হঠাৎ একদিন ঘুম থেকে উঠেই ও অঞ্চলের বাসিন্দারা ফুটপাথ দিয়ে আর চলতে পারে না, পথে নামতে হয়। ফুটপাথের উপর দেখা যায়, বেদেরা এসে সংসার বিছিয়ে বসেছে। তাদের ছোট ছেলেমেয়েরা, তাদের তৈজসপত্র, পোষা ছাগল, কি পোষা কুকুর রাস্তা জুড়ে থাকে। খুব বুড়ো, খুব বুড়ি যারা, ছেঁড়া ময়লাচিট বিছানার উপর বসে থাকে, শুয়ে থাকে, বক্ বক্ করে, ঝগড়া করে। জোয়ান যারা, শক্তসমর্থ যারা, তারা বেরিয়ে পড়ে মেয়ে-মরদে। বাজি দেখায়, ওষুধ বেচে, কুকুর বেচে, ভিক্ষে করে। এমনি একটা দলের মধ্যে তাকে দেখেছিলুম। সেই লম্বা, বয়স্ক লোকটাকে। অদ্ভুত লোকটি। কিম্ভুত পোশাক, লম্বা লম্বা চুল, কোটরগত চক্ষু। সে বেহালা বাজাত।

আমার এক বন্ধু বড় সঙ্গীতপ্রিয় ছিল। সেই একদিন লোকটাকে আনল। দেখলুম, বন্ধুটি তার সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছে। তারপর থেকে লেকে, পথে, কারো বাড়ির ফটকে তার বাজনা শুনেছি। সে কথা থাক। এ কাহিনীতে তার বাজনার স্থান গৌণ, এমন কি তার নিজের স্থানও মুখ্য নয়।

যার ভূমিকা মুখ্য সে অন্য, সে স্ত্রীলোক, সে ওই বেদের দলের সর্দারের স্ত্রী। ওদের অদ্ভুত ভাষা, অদ্ভুত উচ্চারণ, আমি এক বর্ণও বুঝিনি। মাঝে মাঝে ভাঙা হিন্দীতে কথা বলত। বন্ধুটি সর্দারের স্ত্রীর নাম দিয়েছিল সাবিত্রী। বেহালাঅলাই একদিন সাবিত্রীর সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিলে।

বললে, "বাবুজী, ও খুব ভাল বাজি দেখায়।"

"তাই নাকি? তা বেশ তো, একদিন দেখাও বাজি।"

এ বিষয়ে আমার উৎসাহ খুব। বন্ধুটির খেলাটেলা দেখবার ঝোঁক বড় বিশেষ নেই। তার আগ্রহ বাজনায়। লোকটির কাছ থেকে জংলী একটা প্রেমের গানের সুর তুলে নিতে সে বড় ব্যস্ত, তাই বাজি দেখবার ব্যাপারে সে খুব উৎসাহিত হল না।

মেয়েটি—তা বয়েস প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে, গুটি তিনেক ছেলেমেয়ে হয়েছে, তা সত্ত্বেও বেশ শক্ত-সমর্থ, আঁট-সাঁট চেহারা—বোধ হয় হতাশ হ'ল। লোকটিও বোধ হয় ওকে আশা টাশা দিয়ে এনেছিল, কারণ দেখলুম, বন্ধুটিকে সাবিত্রীর খেলা দেখবার জন্য খুব সুপারিশ করতে লাগল। বন্ধু শেষ পর্যন্ত রাজি হ'ল।

সত্যি, ওরা অদ্ভুত খেলা দেখায়। যেমন কসরত দেখায়, তেমনি ভেল্কি। একেবারে থ বানিয়ে দিলে। সেই দিন বুড়ো সর্দারটাকেও দেখলুম। শুনলুম বটে বয়েস হয়েছে, ষাট বছরের কাছাকাছি, কিন্তু দেখলে বিশ্বাস হয় না, চল্লিশের ওধারে নয়, বরং বয়েসটাকে এধারে বলেই মনে হয়। কি খেলাই যে দেখালে দুজনে, সর্দার আর সাবিত্রী, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। তবু বয়েসের ভারে সর্দার কিছুটা শ্লথগতি, কিন্তু সাবিত্রী একেবারে বিদ্যুৎ। মনে ওরা গভীর দাগ কেটে গেল।

আরেকদিন সাবিত্রীর সঙ্গে দেখা। কার্জন পার্কের গোড়ায়। এক জটলা তাকে ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে। সাবিত্রীর কোলে এক কুকুরের বাচ্চা। হ্যাট-কোটধারী এক ভদ্রলোক ওকে খুব ধমকাচ্ছেন।

"জোচ্চোর কোথাকার। জুচ্চুরির আর জায়গা পাওনি। অনেকদিন ধরে তোমাকে খুঁজছি, পাত্তা পাইনি। এবারে ধরেছি যখন আর ছাড়ছিনে। হয় টাকা ফেরত দাও, নয় ফাটকে যাও।"

কি ব্যাপার? না, এই শয়তানী মাগীটা বছর দুই আগে শ' খানেক টাকা নিয়ে বিলাতী ভাল কুকুর দেবে বলে এক নেড়ী কুকুরের বাচ্চা গছিয়ে দিয়েছিল। আজ এতদিন বাদে যখন ওকে ধরেছেন ভদ্রলোক, তখন আর ছাড়াছাড়ি নেই, সোজা চালান দেবেন।

সাবিত্রী বলছিল, সে ও-রকম কুকুর কক্ষণো কাউকে দেয়নি। বাবুজী খামাকা তাকে গালমন্দ করছেন। যদি বাবুকে সত্যিই কেউ ঠকিয়ে থাকে, তো সে অন্য লোক। সে নয়। তা ছাড়া কুকুর বিক্রী করা তার কাজ নয়, সে খেলা দেখায়। তাছাড়া তাদের ধর্মভয় খুব। কাউকে ঠকালে যে দেবতা, কালীমায়ী খুব রাগ করেন, সে কথা ওরা খুব জানে।

কথা বলতে বলতে সাবিত্রী হঠাৎ আমাকে দেখে ফেললে।

কাছে এগিয়ে এসে বললে, "এই তো, এই বাবু আমাকে চেনেন। এঁরও খুব কুকুর পোষার সখ। কি বাবু, আমাদের ওখান থেকে যে বাচ্চাটা নিয়েছেন, সেটা খারাপ?"

কথাটা এমন জোর দিয়ে বললে, ঘটনাচক্রে এমন আমাকে জড়িয়ে ফেললে যে, আমি আর না বলতে পারলুম না। সাবিত্রী বেঁচে গেল। জানি না এই

ঘটনার জন্যেই কি না, সাবিত্রী নানা কাজে আরো কয়েকবার এল। যতবারই সে আসত, সঙ্গে আনত বেহালাঅলাটাকে। একা কখনো ওকে আসতে দেখিনি, আর কারো সঙ্গেও ওকে ঘুরতে দেখিনি।

টালিগঞ্জ রেশন অফিসের সামনে ওদের আস্তানা। বুড়ো সর্দার ছাড়া আর কাউকে দিনের বেলায় বড় একটা আস্তানা আগলাতে দেখিনে। যে যার কাজে যায়। তেমন তেমন ভালো খেলা দেখাবার বায়না না পেলে বুড়োটা নড়ে না। বসে বসে সেলাই করে, রুটি পাকায়, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দুটোকে খেলা শেখায়। বড় ছেলেটা অন্য দলের সঙ্গে খেলা দেখাতে চলে যায়। বড় ছেলে নামেই বড়, বয়েস আর কত হবে, বছর সাতেক। ছেলেমেয়ে তিনটে বুড়োটার নয়নের মণি। সবাই দলে দলে ঘোরে, কিন্তু আশ্চর্য, এই দলের মধ্যে থেকেও, দলের মালিক হয়েও সর্দার আর সাবিত্রী একা। আর একা এই বেহালাঅলাটি। এদের সঙ্গে কারো যোগ নেই, কারো সঙ্গে এদের যোগ নেই। এই ব্যবধান পথ চলতি লোকের চোখে ধরা পড়ার কথা নয়। আমার চোখেও প্রথম প্রথম পড়েনি। বন্ধুটির আমার সরেশ নজর। শিল্পী লোক। দেহটি মোটা, কিন্তু নজর খুব সূক্ষ্ম। সেই আমায় ব্যাপারটি ধরিয়ে দিলে। আশ্চর্য লেগেছিল খুব।

আরও আশ্চর্য হলুম জেনে, বন্ধুটিই জানালে, সাবিত্রী খুব ভাল গান জানে। বেহালাঅলা তাকে বলেছে, সে নাকি অপূর্ব গান।

তবে সাবিত্রী গায় না, বুড়ো জানতে পারলে আস্ত রাখবে না। গানে আমার তত উৎসাহ নেই, কিন্তু বন্ধুটি গান-পাগল। সে শুনবেই। আর শুনলও। আমি নিজে শুনিনি, তবে বন্ধু বলেছে, সে গানের তুলনা হয় না। সে হচ্ছে আদিম সঙ্গীত। তার আবেদন, তার জোশ্, তার আস্বাদ একেবারে আলাদা।

বন্ধু বললে, "শুনলি নে, বড় ফস্কালি।"

এই গানই শেষ পর্যন্ত কাল হয়ে দাঁড়াল। বুড়ো কি করে জানতে পারলে সাবিত্রী গান করেছে। শুনিয়েছে কাদের। তারপর সেই রাত্রে মুদিয়ালিতে এক তান্ডব কান্ড হয়ে গেল। বহু বাড়ির জানালা পটাপট খুলে গিয়েছিল। অনেকের কানে তর্জন, গর্জন, চিৎকার, মারপিট, কান্নার আওয়াজ ঢুকেছিল। পুলিশের গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স এসেছিল। পুলিশ চার-পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করলে, অ্যাম্বুলেন্স বেহালাঅলাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। সাবিত্রীকেও নিয়ে গিয়েছিল। বেহালাঅলার অবস্থা খুব গুরুতর। তাকে ভর্তি করা হল। সাবিত্রীর মাথায় সামান্য চোট লেগেছিল,

ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হল। বুড়োটাকে হাজতে রাখা হল। দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধানোর অভিযোগে তাকে চালান দেওয়া হল।

থানাতে ওরা যা এজাহার দিয়েছিল, সেগুলো জড় করে ওদের পেছনের ইতিহাস জেনেছি।

প্রায় দশ বছর আগে সাবিত্রীর সঙ্গে বুড়ো সর্দারের দেখা হয় এক মেলায়। সাবিত্রীদের দল সেখানে খেলা দেখাতে এসেছিল। সাবিত্রী দড়ির খেলা দেখাত আর গান গাইত। ওর সঙ্গে বেহালা বাজাত এই মরদটা। একদিন সাবিত্রীদের দলের কয়েকটা মরদ খেলা দেখাচ্ছে, তারা সবাই বাহাদুর খেলোয়াড়, কোত্থেকে এই সর্দার বুড়ো গিয়ে হাজির। বয়সে বুড়ো, কিন্তু তখনো পুরো জোয়ান। অমন পাঁচটা জোয়ানকে ঘায়েল করে দিতে পারে একা। আর করলেও তাই। ওদের দলের যে-ই খেলা দেখায়, যত ভালই খেলা দেখায়, বুড়ো তাদের ঠাট্টা করে, দুধ ছাড়িসনি খেলা কি দেখাবি রে। এই নিয়ে হৈ চৈ গোলমাল, প্রায় মারামারি হয় আর কি। বুড়োর সে সবে ভ্রূক্ষেপ নেই।

হো-হো করে হাসে আর বলে, "এই নাকি তোদের খেলোয়াড়? এই নাকি তোদের বাহাদুর? ছ্যা। এ খেলা তো আমাদের বাচ্চারা দেখায়, দুধের বাচ্চারা, এর চেয়ে ভাল খেলা তো আমাদের আওরতরা দেখায়।"

দলের লোকেরা শুনে বললে, "আর যত সরেশ খেলা দেখাস বুঝি তোরা বুড্ঢারা?"

বুড়ো শুনে তেতে গেল, "হাঁরে, হাঁ, বুড্ঢার হাড্ডিতেই ভেল্কি খেলে।"

শুনে সবাই বললে, "দেখা ভেল্কি। না যদি দেখাবি তো পুঁতে ফেলব এখানে।"

বুড়োও না-ছোড়বান্দা।

বললে, "তবে দেখ।"

কে বলবে ও বুড়ো? সবাই খেলা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। কে জানে কেন সাবিত্রীর কেমন নেশা লেগে গেল লোকটিকে দেখে। ভাবলে, এ যদি বুড়ো হয়, তবে জোয়ানটা কে? সেই নেশাতেই সাবিত্রী সব ভুলে গেল। বেইমানি করল নিজের দলের সঙ্গে। কত জোয়ান জোয়ান ছোকরা সাবিত্রীর দিকে এগিয়ে এসেছিল, বিয়ে করতে চেয়েছিল, ওকে নিয়ে ভাগতে চেয়েছিল, সাবিত্রী হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। কাউকে ওর পছন্দ হয়নি। জোয়ান, সেরা জোয়ান না হলে সাবিত্রীর মন ওঠেনি। এতদিন বাদে সাবিত্রী তার দেখা পেল। যে ছিনিয়ে নিতে পারে, সাবিত্রী তার। তা বুড়ো তাকে ছিনিয়ে এনেছে ছাড়া কি? বুড়োর হাত থেকে রেহাই পেল না বলেই না সে তার

বাঁদী। সাবিত্রী দারোগাবাবুকে বলেছিল, আরো একটা লোকের হাত সে এড়াতে পারেনি। সে জোয়ান তো নয়ই, বরঞ্চ দুর্বল, খুবই দুর্বল। কোনও শক্ত কাজ করতে পারে না। তাকে কেউ মরদ বলেই গ্রাহ্য করে না। জোর করে না, কিছু চায় না, যা বলি নির্বিচারে করে যায়। দশ বছর ধরে করছে। খালি গান গায়, বেহালা বাজায়। আর মাঝে মাঝে বলে, খেলা তুই দেখাস নে। ও তোর কাজ নয়। ভগবান তোকে গলা দিয়েছেন, এত ভাল গানের গলা তোর, তুই গান কর। সেই জন্যেই বেহালাঅলার উপর বুড়োর এত রাগ।

সাবিত্রী বলল, "আজ ওকে মেরেই ফেলত। ও না থাকলে আমাকেও আজ মেরে ফেলত। আমাকে বাঁচাতে গিয়ে ওই সব মারটা খেয়েছে।"

সাবিত্রী বলেছিল, বুড়োটা বেইমান্। ওকে ঠকিয়েছে। মতলব ভেঁজে ওকে ভুলিয়েছে। বুড়ো জানত, ওর বয়েস হয়ে আসছে। আজ যতই ভেল্কি দেখাক শিগ্গিরই এমন সময় আসবে, যখন ওর পক্ষে আর খেলা দেখান সম্ভব হবে না। তাই একটা জোয়ান মেয়ে, খুবসুরৎ মেয়ের সন্ধানে ছিল। ভেল্কি দেখিয়ে তাকে বশ করলে। বিয়ে করে খেলা শেখালে তাকে। দল বানিয়ে সর্দার হল। বাচ্চাও পয়দা করলে।

সাবিত্রী সাপিনীর মত ফোঁস ফোঁস করে বলল, "সব পয়সা রোজগারের ফন্দি। জরুকে খেলা শিখিয়ে তাকে দিয়ে রোজগার করেছে। এখন বেটা-বেটি হয়েছে, তাদের দিয়ে রোজগার করাবে, তাই এখন সব নজর তাদের দিকে। আমাকে আর পোঁছে না। টাকা রোজগার বেশী করি, তাই চোখে চোখে রাখে, কেউ না বিগড়ে দেয়।"

সাবিত্রী বলেছিল, বুড়ো তার জীবন বরবাদ করে দিয়েছে। তার প্রতিশোধ সে নেবে। কদিন পরই জানলুম, সে তা নিয়েছে। খবরটা বন্ধুই দিলে। বন্ধুই সাবিত্রীর জীবনের এই দুর্ঘটনার আপাত কারণ। অন্তত সে তাই মনে করত। আর বোধ হয় তারই প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য রোজ শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে যেত বেহালাঅলাকে দেখতে। কিম্বা দুজনের মধ্যে হয়ত হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠে থাকবে। সাবিত্রীও যেত হাসপাতালে। বন্ধু একদিন হাসপাতালে গিয়ে দেখে বেহালাঅলার বেড খালি। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার আগেই পালিয়েছে।

কাহিনীটি এখানেই শেষ করতে পারতুম। অথবা এখানে সমাপ্ত হলে এ কাহিনী লেখবার দরকারই হত না। সাবিত্রীর কথাও মনে থাকত না। এ ঘটনার প্রায় বছরখানেক পরে খবরের কাগজে এক নৃশংস হত্যা-

কাণ্ডের খবর পড়েছিলুম। এক মেলায় কতকগুলো বেদে খেলা দেখাচ্ছিল। সেইখানেই ওদের দলে একসঙ্গে চারটে খুন হয়। তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আর এক বেদিনী। কিন্তু এ ঘটনার সঙ্গে সাবিত্রীর কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে স্বপ্নে ভাবিনি।

তারপর বছর তিনেক কেটেছে। বন্ধুর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছে অনেকদিন। বেদেদের ঘটনাও ভুলে গিয়েছিলুম। হঠাৎ সেদিন লেকের দিকে গিয়েছিলুম, এক শ্রদ্ধেয়জনের বাসায়। খাওয়া-দাওয়া হতে গল্প-গুজব শেষ হতে বেশ রাত হ'ল। অনেকক্ষণ ধরে উঠব উঠব করছিলুম।

এক সময় উঠেই পড়লুম। এস আর দাস রোড ধরে সাদার্ন অ্যাভেনিউ-এর দিকে হাঁটছি। মুদিয়ালি বরাবর আসতেই কানে গেল বেহালার এক আশ্চর্য করুণ সুর। চমকে উঠলুম। চেয়ে দেখি, হ্যাঁ, একটু দূরে লোকটা বসে বসে বেহালা বাজাচ্ছে। সে-ই লোক। আশ্চর্য লাগল। এগিয়ে গেলুম। চাইল না। ডাকলুম। সে ফিরে দাঁড়াল বটে কিন্তু চিনতে পারল না।

সাবিত্রীর কথা মনে পড়ল। বন্ধু বলেছিল, লোকটা ওর সঙ্গেই পালিয়েছে। দশ বছর ধরে নীরবে ও প্রেমের সাধনা করে এসেছে, এতদিনে তার প্রতিদান পেল। লোকটার অধ্যবসায়ের জন্য ওর উপর শ্রদ্ধা হচ্ছে। সত্যি বলতে কি সেই কথা ভেবেই ওর কাছে এগিয়ে এসেছিলাম। ও চিনতে পারল না। তবে সাবিত্রীর কথা জিজ্ঞেস করতেই ও কেমন যেন অদ্ভুতভাবে তাকাল।

তারপর ঘাড় নিচু করে বললে, "ও খুন হয়েছে।"

খুন হয়েছে! কেন? কবে?

লোকটা হিসেব করে একটা মাস বলল। মেলার নাম করতেই মনে পড়ল নৃশংস হত্যার খবরটার কথা।

বললাম, "হ্যাঁ, আর তিনটে ছেলে মেয়ে—"

বাধা দিয়ে লোকটি বললে, "ওদেরই বাচ্চা। সাবিত্রী নিজেও মরল, বাচ্চাগুলোকেও নিয়ে গেল। বুড়োটাই খুন করেছে সব। ফাঁসীও হয়ে গেছে তার।"

বুড়োটা সাবিত্রীকে মেরেছে, সেটা বুঝি। কিন্তু ছেলেগুলোকে কেন মারল? ওরা তো ছিল তার নয়নের মণি? প্রশ্নটার জবাব সে-ই দিলে। বললে, "বুড়োটা সাবিত্রীকে ঠকিয়েছিল, সাবিত্রী তারই বদলা নিলে। বুড়োটা সাবিত্রীর নাগাল পেলে তার গলা টিপে মারছিল যখন তখন সাবিত্রী বলে যায়, তুমি আমার সঙ্গে বেইমানি করেছ। আমিও

বেইমানি করে তার শোধ নিয়েছি। আমি তো মরলাম। মরে বাঁচলাম। মরবার আগে বলে যাই, শোন্, ওই যে বাচ্চা তিনটেকে নিজের বলে বুকে জড়াস, ওর মধ্যে একটার বাপ তুই না বুড়ো, বুঝলি?"

লোকটা থেমে গেল। কথাটা শুনে চমকে উঠলাম। সাবিত্রীর চেহারা, বুড়োটার চেহারা, ছেলে দুটো আর মেয়েটা সব চোখের উপর ভাসতে লাগল। কতদিন যে বুড়োকে ওদের সঙ্গে খেলা করতে দেখেছি, ঠিক নেই। কোনটা? সঙ্গে সঙ্গে মনে হল কোন্‌টার কথা সাবিত্রী বলেছে?

লোকটি বললে, "একথা শুনে বুড়ো পাগলা হয়ে গিয়েছিল। এক একটা বাচ্চাকে কাছে টেনে নেয়, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, আর পাগলা হয়ে যায়। কোনটা তার বাচ্চা নয়? মেজটা? মেয়েটা? পাগলা হয়ে একটা একটা করে মেরেই ফেলল, তিন বাচ্চাকেই খুন করলে।"

লোকটা আবার চুপ করে গেল।

খানিক বাদে ধীরে ধীরে বললে, "সাবিত্রীর ঘাড়ে শয়তান ছিল বাবু। ওকে তাই শান্তি দিল না। ভগবান ওকে গানের গলা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন গান করতে। ও গেল মর্দানাবাজী করতে।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লোকটা বেহালায় টান দিলে। একটা করুণ ক্রন্দন যেন বেহালার বুক চিরে বের হয়ে এল।

চলে আসছি, লোকটি বললে, "মোটা বাবু ভাল আছেন?"

বুঝলুম চিনেছে।

বললুম, "হ্যাঁ।"

বেহালার তারে ছড় টেনে টেনে রাতের বাতাসে কান্না ছড়িয়ে ছড়িয়ে লোকটি ধীরে ধীরে লেকের দিকে চলে গেল। তারপরও কয়েকবার তাকে দেখেছি মুদিয়ালীর কাছে ঘুরে বেড়াতে।

কিন্তু এখনও সে ওখানে ঘোরে কেন?

॥ উনিশ ॥

ভেটারিনারি কলেজের বাউন্ডারীর মধ্যে নিরিবিলিতে এক জায়গায় ছায়াঘেরা ঘাসের বিছানায় চুপচাপ শুয়েছিলুম। একপাশে এক পুষ্করিণী, জল নেবে গেছে চোদ্দ-পনের হাত নীচে, বাগানের এক মালী ময়লা নীলবর্ণ সেই জলেই চান করছে। অন্য পাশে বিঘেটাক জনারের ক্ষেত। শিশু চারাগুলো মৃদু বাতাসে গান-শেষে বাহবা-পাওয়া বাঈজীদের মত ঝুঁকেঝুঁকে শিষ্টাচার রক্ষায় যেন ব্যস্ত। উপরে এক বলরামচূড়া গাছ পত্রপল্লবে আড়াল রচনা করে রোদ্দুরের হাত থেকে আমাকে বাঁচাতে সচেষ্ট। এই চতুর্বেষ্টনীর মধ্যে আমি চিৎ হয়ে শুয়ে এক ঘাসের ডাঁটা চিবুচ্ছি।

আষাঢ়ের আর বুঝি দেরি নেই। তবু বর্ষণ-সম্ভব আকাশে কোন ইঙ্গিত নেই কেন, তাই ভাবছি। আকাশে ছেঁড়া মেঘের আনাগোনা শুরু হয়েছে। কন্যা বয়স্থা, পাত্রস্থ করতে হবে, তাই কি ঘটকের আনাগোনা? এই তুলো তুলো মেঘগুলো, এরা কি সেই ঘটক? কিন্তু আমরা তাপিত-প্রাণ শহরবাসীরা ঘটা চাই, ঘটক চাইনে।

বেশ দেখতে লাগে, নিস্তব্ধ দুপুরে এই নির্জনে শুয়ে, আকাশের গায়ে এই তুলো তুলো মেঘের রকমারী খেলা। শাদা মেঘের পেটটা কেমন ধোঁয়া-ধোঁয়া, আর তার নীচে উড়ে-বেড়ানো পাখীর ডানা নাড়াবার কেমন সুষম ছন্দ। চিৎপুর ইয়ার্ডে মালগাড়ি শাণ্টিং হচ্ছে। ইঞ্জিনের হুইস্‌ল কানে বাজছে, কিন্তু বিরক্ত করছে না।

মেঘ এসে রোদ্দুরটা কমিয়ে দিয়েছিল। মেঘটা এখন সরে সরে যাচ্ছে, রোদ্দুরও এগিয়ে এগিয়ে আসছে। যেন রোদ্দুরটাই মেঘটাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। হঠাৎ পাশের গাছের একথোকা কৃষ্ণচূড়ার গায়ে রোদ্দুর এসে হাত ঠেকালে। আর কৃষ্ণচূড়া খুশিতে দপ্‌ করে জ্বলে উঠল। দৃশ্যটায় চোখ পড়তেই মনটা ভরে উঠল আনন্দে।

হঠাৎ দারোয়ানের চিৎকার কানে গেল, "হো-ই পাশ্‌ দেখাও।"

দেখি, এক গরু-অলা তার গরুটা বের করে নিয়ে যাচ্ছে। তাই দারোয়ান গেট-পাস্‌ দেখতে চেয়েছে। দারোয়ানের আচমকা চিৎকারে চমকে উঠলুম। এযে অবিকল দীন্দার গলা! সেই সুর, সেই চড়া আওয়াজ!

দরোয়ানের 'হোই-পাশ' আমার কানে অন্যভাবে বাজল। তের বছরের ব্যবধান নিমেষে ঘুচে গেল। চমকে চেয়ে দেখি, না দীন্দা নয়, দারোয়ানই বটে। তবে গলার আওয়াজটা অবিকল দীন্দার মত। আমি যেন স্পষ্ট শুনলুম দীন্দার কড়া হুকুম, 'কমরেডস্ চার্জ।'

এই ভেটারিনারি কলেজের বাউণ্ডারী, এই পুকুর, জনারের ক্ষেত, কৃষ্ণচূড়ার গাছ সব মিলিয়ে গেল। চোখের উপর ভেসে উঠল এক অতীত। ভাল করে চেয়ে দেখি, উপুড় হয়ে শুয়ে আছি রেল লাইনের বাঁকের নীচে কুলগাছের ঝোপে। এ-পাশে ভবান, ও-পাশে লাহিড়ী। আর এখানে-ওখানে বিমল, শঙ্কর, 'দাদা', কল্যাণ, কানু। শেষ জ্যৈষ্ঠের প্রখর রৌদ্রে, ভরদুপুরে, সার সার শুয়ে আছি ক'জন, দীন্দার গোঁড়া ভক্ত। দীন্দা মিলিটারী কায়দায় হুকুম দিচ্ছেন একের পর এক। আর আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে তা তামিল করছি।

গেরিলা যুদ্ধের তালিম নিচ্ছি।

জাপান দেশে ঢুকল বলে। তাই পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে সার্কুলার এসেছে, প্রত্যেক ইউনিটকে তৈরি হতে হবে। গেরিলা যুদ্ধে পোক্ত হতে হবে।

কেন্দ্রীয় দপ্তর ট্রেনিং সেণ্টার খুলেছিল, দীন্দা আমাদের ডিস্ট্রিক্ট পার্টির প্রতিনিধি হিসাবে সে ট্রেনিং পাস করে এসেছেন। এবার আমাদের শেখবার পালা।

প্রত্যেকটি গেরিলার হাতে চোক্তা বাঁশ অর্থাৎ বেয়নেট। আপাতত এইটে আমাদের হাতিয়ার (এই হাতিয়ারটা আমাদের প্রাইভেট, এছাড়া আরেকটি হাতিয়ার আছে, রেভলিউশনারী সংগীত। তাই আমাদের শক্তি দেয়, উৎসাহ দেয়। একদিন লক্ষ্যেও পেঁছে দেবে, সে বিশ্বাস আমার আছে।)

দীন্দা আদেশ দিলেন, "কমরেডস্ চার্জ।" (এখন অবশ্য আদেশটা চেঁচিয়েই দিলেন। কিন্তু এ শুধু ট্রেনিং পিরিয়ডের জন্য। কারণ আমরা "সবাইর"। ইস্কুল থেকে ধরে আনা কতকগুলো দুগ্ধপোষ্য বালকমাত্র। কারোরই রেভলিউশনারী ব্যাকগ্রাউণ্ড নেই। মার্ক্সিস্ট দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি হওয়া তো দূরের কথা, মার্কস্ বানানটা অবধি শুদ্ধ করে কেউ করতে পারিনে। লেনিনের তো আরো দুর্দশা। হাজারবার করে প্রায় পাখী-পড়া করাবার পরও সেই 'লেলিন' আর ছাড়াতে পারা যাচ্ছে না। নেহাৎ দীন্দার মার্কসিস্ট্ ধৈর্য। তাই হাল ছাড়েননি। দীন্দা বলেন, তোমরা এখনো পেটি বুর্জোয়া সংস্কার ছাড়তে পারছ না, ক্যাপিটালিস্ট হেজিমনিতে

তোমাদের জিভ্‌গুলো তৈরি হয়েছে কিনা, তাই বিপ্লবের যারা গুরু তাদের নাম ঠিক ঠিক জিভ্‌ দিয়ে বেরুচ্ছে না। তবে স্টাডি ক্লাস যে রকম নিয়মিত চলেছে তাতে পেটি বুর্জোয়া সংস্কার খুব বেশী দিন টিঁকবে বলে মনে হচ্ছে না।)

"কমরেডস্‌ চার্জ!"

যেই কানে এসে বাজবে, আর তারপর কি করতে হবে, আমরা কজন গেরিলা তা মুখস্থ করে রেখেছি। সামান্য ভুল হলেই বিপদ। জীবন নিয়ে টানাটানি। আর ব্যক্তিগত যে জীবন, আমার, তোমার, ভবানের, বিমলের কি লাহিড়ীর, কি অন্য কারোর, তার জন্য কে পরোয়া করে? ওরকম হাজার দু' হাজার, লক্ষ ইন্ডিভিজুয়াল থাকল আর গেল, তাতে কিছুই আসে যায় না। আমাদের ব্যক্তিসত্তা বলে কিছু নেই। পার্টি হি কেবলম্‌। পার্টি ধর্ম, পার্টি কর্ম, পার্টিই পরম তপস্যা। পার্টির প্রিয়তা অর্জন করার বাড়া আমাদের আর কিছুই নেই।

এসব কথা দীন্দার মুখে দিনের পর দিন শুনেছি। আর মনের শেলেটে পেরেক দিয়ে টুকে নিয়েছি।

দীন্দা বলতেন, "কমরেডস্‌, পার্টির জন্য জীবন দেওয়া, এর চাইতে গৌরবের আর কিছু নেই। আমি তুমি কে? এক একখানা ইঁট। আর পার্টি হচ্ছে ইমারত। ইঁটগুলোকে আলাদা করে রাখলে তারা কিছুই না। সেই রকম একা একা, এককভাবে আমরাও কেউ না।"

শুনতে শুনতে মানতে মানতে আমিও ইমারতের ইঁট হবার চেষ্টা করছিলুম। আমি বলে কেউ যে আছি, কেউ যে থাকতে পারি, সে কথা প্রায় ভুলেই গেলুম। এখন আমরা সব পার্টি। রেভলিউশনারি লেফটিস্ট পার্টি অব্‌ ইন্ডিয়া। কামরূপ থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত অসংখ্য সভ্যের (এক্সাক্ট ফিগারটা জানতুম না, 'র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইলে'র তা জানবার কোনও অধিকার ছিল না, সেটা 'টপ লীডারদের' হুদ্দোয়) এক মন একপ্রাণ এবং একদেহ।

'মন' 'প্রাণ' বোঝবার বয়েস সেটা নয়, কথা দুটো তাই মুখস্থ করে রেখেছিলুম ("যেটা বুঝে উঠতে পারবে না, সেটা নিয়ে তর্ক তুলে সময় নষ্ট করো না, বিপ্লবীদের সময় মহামূল্যবান। যেটা বুঝতে পারবে না, সেটা মুখস্থ করে রেখো।" দীন্দা আমাদের স্টাডি ক্লাসে কথাটা বলতেন।) কিন্তু দেহটা বুঝতুম সেটা নেহাৎ সঙেগর সাথী বলে।

দীন্দা যখন বলতেন, "ভারতে তথা পৃথিবীতে মাত্র দুটো অস্তিত্ব—এক আমাদের পার্টি, রেভলিউশনারি লেফ্‌টিস্ট্‌ পার্টি অব্‌ ইন্ডিয়া, আর

তার শত্রু। কমরেডস্, মনে রেখো, এই দুটো, মাত্র দুটো ছাড়া আমাদের কাছে আর কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই। একদলকে বাঁচতে হলে অপর দলটিকে ধ্বংস করতে হবে। আমাদের শত্রুরা যদি আমাদের খতম্ করতে পারে, তবে ওরা বাঁচবে। আর আমাদের যদি বাঁচতে হয়, তবে ওদের খতম্ করতেই হবে। এই আপোষহীন সংগ্রাম এরই নাম ইতিহাস। তবে আমাদের বাঁচাই ন্যায্য বাঁচা, কারণ ন্যায় আমাদের দিকে। বিপ্লব আমাদের সহায়, ("ইনক্লাব জিন্দাবাদ"—আমরা চেঁচিয়ে উঠতুম। এটাও ট্রেনিং পেয়েছিলুম। কোনো কমরেডের বক্তৃতার মাঝে 'বিপ্লব' কি 'ক্রান্তি' কি 'রেভলিউশন' কথাটা উচ্চারণ করলেই 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' জিগীর তুলতাম। আর শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতন ইত্যাদি শুনলে কি ক্যাপিটালিস্ট, পুঁজি-বাদী নাম শ্রবণে পশিলে 'মুর্দাবাদ' করে উঠতে হত। কোনো কোনো রং-রুট বেভুলে 'মুর্দফরাস' বলে চেঁচিয়ে উঠে মাঝে মাঝে গুবলেট পাকাতো।) বিপ্লব যা তা করে করা যায় না। একটা কম্প্যাক্ট্ পার্টি, একটা বজ্রদৃঢ় পার্টিই বিপ্লব করতে পারে। সে পার্টি হবে ঠাসবুনোন, আঁটসাট। ঢিলেঢালা নয়, টুটাফুটা নয়। 'একমন, একপ্রাণ, একদেহ'—এই আমাদের স্লোগান।

আমি সে স্লোগান বিশ্বাস করতে চেষ্টা করতুম। চেষ্টা করছিলুমও। আমাদের লোকাল পার্টিতে এতাবৎ সব কমরেডই ছিল পুরুষ। কাজেই একদেহ বোধ কষ্ট হলেও, বিশ্বাস করা একেবারে অসম্ভব ছিল না। বিশ্বাস প্রায় করেই এসেছিলুম। এমন কি একবার আমার যখন খুজলি হয়েছিল, তখন সত্যিই ভেবেছিলুম, এ খুজলি পার্টির হয়েছে। খুব কষ্ট পেলেও পার্টির একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যাবার ভয়ে তাই কখনো চুলকাইনি। কিন্তু যেদিন থেকে গার্লস্ ইস্কুলের ফার্স্ট ক্লাসের দুজন ছাত্রী, কমলা দত্ত আর শোভা সরখেল কমরেড হল, সেদিন আমার পেটি বুর্জোয়া সংস্কার পার্টিকে আর একদেহ বলে কিছুতেই স্বীকার করতে চাইলে না।

বয়সটা তখন যদিচ কম, তবু সেই বয়সে এ জ্ঞানটা টনটনে ছিল যে, মেয়ে আর পুরুষের দেহে বেশ মূলগত কিছু পার্থক্য আছে। মনে আছে এই চিন্তাটা, মেয়ে কমরেডদের সঙ্গে বেমালুম একদেহী হয়ে যাবার ভয়াবহ দুশ্চিন্তাটা, আমাকে প্রায় পাগল করে তুলেছিল। শেষে আর থাকতে না পেরে মনের কষ্টটা দীন্দাকে একদিন জানিয়ে দিলুম।

বললুম, "দীন্দা, পার্টির মেম্বার যে কেউ হলেই, তার সঙ্গে এক মন এক প্রাণ হয়ে যাব?"

দীন্দা বললেন, "নিশ্চয়ই।"

বললুম, "দেহও আমাদের এক হয়ে যাবে?"
দীন্দা ঝোঁক দিয়ে বললেন, "আলবৎ।"
বললুম, "কমরেড কমলার সঙ্গেও একদেহ হতে হবে?"
দীন্দা হোঁচট খেলেন।

দীন্দা খানিক চুপ করে থেকে আমাকে জিগ্যেস করলেন, "এ সন্দেহ আর কাউকে জানিয়েছ?"

বললুম, "না।"

দীন্দা বললেন, "বেশ করেছ। আজ থেকে এই কথাটি সব সময় মনে রাখবে, সংশয়, সন্দেহ কিছুমাত্র হলেই, আমার কাছে এসে পড়বে। আমি ছাড়া আর কাউকে বলবে না। তোমরা, 'র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইলরা' হলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আমরা লীডাররা হলুম 'ব্রেনট্রাস্ট'। বুদ্ধি পরামর্শ আদেশ নির্দেশ সব আমিই দেব, আর কমরেড, তোমরা তা তালিম করবে। ডিসিপ্লিন মানা মানেই পার্টির স্বাস্থ্যরক্ষা করা। ডিসিপ্লিন ভেঙেচ কি অপারেশনের ছুরি বসবে ঘ্যাঁচ্! যাক্, এবার তোমার প্রশ্নের জবাব শোন, মেয়েপুরুষের লিঙ্গভেদ তখনই, যখন তারা ইন্ডিভিজুয়াল। সেক্স্ থাকে মানুষের, পার্টি তার ঊর্ধ্বে। সেক্স্ নয়। আমাদের হচ্ছে সেক্ট্। যেমন হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন, আলাদা আলাদা যখন, তখন তারা প্রত্যেকেই গ্যাস্। যেই মিশলো, অমনি এইচ্-টু-ও, হয়ে গেল জল।"

পার্টিকে চট করে জল হতে দেখে আশ্বস্ত হয়েছিলুম। দীন্দার কাছে আরো দু-এক কথা জিজ্ঞাস্য ছিল। কিন্তু হঠাৎ মগজের মধ্যে, মেয়েরা অক্সিজেন না হাইড্রোজেন এ প্রশ্ন বুড়বুড়ি তুলতেই লজ্জা পেয়ে দিলুম ছুট।

তারপর থেকে আর কোনোদিন প্রশ্ন তুলে ধৃষ্টতা করিনি। হুকুম তামিলের দলে নিজেকে নিঃশেষে মিলিয়ে দিয়েছি।

"কমরেডস্ চার্জ।" তারপর থেকে যেই শুনেছি অমনি ঝাঁপিয়ে পড়েছি।

আমাদের পার্টির সেই ঘরখানা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে মোমের মৃদু আলোয় কম্পমান আমার কমরেডদের মুখগুলো। পিছনে ঘোড়ার আস্তাবল। সেখান থেকে দুর্গন্ধ এসে ভেতরের বাতাস ভারী করে রেখেছে। ঘরের ভেতরটা অপরিসর, অপরিষ্কার। বিড়ির টুকরো আর ছাইয়ে মেঝে ভর্তি। পার্টি-বস্‌রা এগুলো, সাফ করার পক্ষপাতী ছিলেন না।

বলতেন, "এর একটা সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট আছে।"

দেয়ালের কোথাও পলেস্তারা আছে, কোথাও নেই। দুপাশে দুখানা বড় বড় ফটো ঝুলছে। একখানা কার্ল মার্কসের, আর অন্যখানা সূঁচলো দাড়ি কমরেড লেনিনের। 'বিপ্লবের জনক লেনিন। সর্বহারার পিতা লেনিন। হে লেনিন, তুমি দীর্ঘজীবী হও।' কথাগুলো অভ্যাসবশে আওড়ে যেতাম। তখন তো আর জানিনে, লেনিন যখন দেহ রেখেছেন, তখনও মাতৃগর্ভে আসবার ভিসা আমি পাইনি। কিন্তু তাতে কি? লেনিনের মৃত্যু হলেই বা কি? লেনিন মারা যেতে পারেন, বিপ্লব তো বেঁচে থাকবে। আর বিপ্লব নিশ্চয়ই বাপের নাম ডোবাবে না।

কমরেড দীন্দা, মদন দত্ত আর শানু চাটুজ্জের মধ্যে ঘোরতর তর্ক বেধে গেছে। মদন দত্তের দোকান আছে বাজারে। আর শানু চাটুজ্জে ইস্কুল মাস্টার। এই তিনজনই আমাদের জেলা পার্টির মাথা।

কমরেড দীন্দা, হোল-টাইমার, পার্টি গড়ে তোলার ভার তাঁরই, শাণু চাটুজ্জে থিয়োরিটিশিয়ান, মার্কস এঙ্গেলস্ লেনিন স্টালিন গুলে খেয়েছেন এবং তারই ছিঁটেফোঁটা নির্যাস আমাদের দিকে ছিটিয়ে দেন। শানু চাটুজ্যে গুচ্ছের বই পড়লে হবে কি, দীন্দা বলেন, ও-বড্ড বেশী ইণ্টেলেকচুয়াল।

দীন্দা বলতেন, "মার্কস পড়া সোজা, হজম করা শক্ত। সকলের ইণ্টেস্টাইনে সব জিনিস সহ্য হয় না। ধর, প্লেখানভ কি কাউটস্কি, ওঁরা কম পড়াশুনা করেছিল কি? কিন্তু কি হল শেষ পর্যন্ত? রেনেগেড্। কমরেড লেনিন ইণ্টেলেকচুয়ালদের তাই দুচক্ষে দেখতে পারতেন না। চান্স পেলেই ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দিয়েছেন। এটা জানবি, ক্লাস-কনশাসনেস যদি ছাড়তে পারিস, যদি একেবারে মনে-প্রাণে সর্বহারা হয়ে যেতে পারিস, তবেই কেল্লা ফতে করবি। সর্বহারা, মজদুর, প্রোলেটেরিয়েট এই আমাদের ডেস্টিনি। নেমে আয়, এখানে নেমে আয়। ওই যেখানে তোরা আছিস, সেই বুর্জোয়া সমাজে পচ ধরেছে, ধস নেমেছে, ভাঙল বলে। কে ভাঙবে? আমরা। দুনিয়ার যত মজদুর, যত সর্বহারা। আমরাই ওদের কবর খুঁড়ব।"

বলতে বলতে দীন্দার চোখে আগুন জ্বলত।

"ভাইরে জগতে দুটো জাত। 'হ্যাভস্' আর 'হ্যাভ-নটস্'। একের ধ্বংসে অন্যের প্রতিষ্ঠা। একেই বলে থিসিস্, আর অ্যাণ্টিথিসিসের লড়াই। ডায়েলেকটিক্স। ইতিহাস কুস্তি করতে করতে ছুটেছে। থিসিস্ আর অ্যাণ্টি-থিসিসের নন্-স্টপ কুস্তি। থিসিস্ আর অ্যাণ্টি-থিসিসের

লড়াইয়ে জন্ম হবে সিন্থিসিসের। আর তখনই ইতিহাস পাশ ফিরে ঘুমুবে। ইণ্টেলেকচুয়ালরা পুঁথি ঘেঁটে পড়তে পারে, কিন্তু বুঝবে না। তারা তর্ক করবে, প্রশ্ন করবে, নানাবিধ সংশয়ের ফ্যাকড়া তুলবে, কিন্তু ইনকিলাব করতে পারবে না। সর্বহারার চেতনা তাদের কিছুতেই হবে না। তাই কমরেডস্, তোমাদেরকে শানু চাটুজ্যে সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি। ওর কথা শুনে যেন মিস্গাইডেড্ না হয়ে যাও। একে আমাদের পার্টিতে রাখতে হচ্ছে, কারণ শহরে ওর প্রেস্টিজ আছে। তাছাড়া স্টাডি ক্লাস পরিচালনা করতেও ওকে দরকার। আর ডিবেটটাও ভাল করে। আর বুর্জোয়া ডেমোক্রেটিক রেভলিউশন পর্যন্ত ওকে আমরা সঙ্গে রাখতে পারি। দোষ নেই। লেনিনও এমন কাজ করেছেন। কেরেনস্কির কথা মনে কর। পাওয়ার যতদিন না লেনিন শক্ত মুঠোয় বাগাতে পেরেছেন, ততদিনই কেরেনস্কির সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। তারপর সুযোগ পেতেই ঘ্যাচাং। একেই বলে 'ট্যাক্টিকস্।' আমরাও 'ট্রানজিশন' পিরিয়ড পর্যন্তই শানু চাটুজ্যের সঙ্গে আছি। তারপর—"

তারপর শানু চাটুজ্জের ভবিষ্যৎ কি, তা আর আমাদের বলতে হ'ত না। দীন্দার ঠোঁটের মৃদু হাসি দেখেই আন্দাজ করে নিয়ে পুলকিত হতুম। অবশ্যি ওসব আলোচনা সাধারণভাবে হ'ত না। হ'ত একেবারে ইনার সার্কেলে। আমাদের পার্টির তিনটে সার্কেল ছিল। আউটার, মিডল আর ইনার। আউটার সার্কেলে আমরা সবাই প্রকাশ্যভাবে মিশতুম। লোকে সেটাকেই পার্টি বলে জানত। তার থেকে বাছাই করে হয়েছিল মিডল সার্কেল। দীন্দা, মদনদা আর শানুদা এই সার্কেলের লোক। এটা পার্টির সেক্রেটারিয়েট। আর ইনার সার্কেল মানে দীন্দার নিজস্ব সার্কেলের কথা বাইরের কেউ জানতই না, মদনদা, শানুদাও নয়। জানতেন দীন্দা আর ভবান, দীন্দারই ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী।

মদন দত্তের টাকায় পার্টি চলত।

দীন্দা বলতেন, "এমনিভাবেই ও একদিন ডিক্লাসড্ হয়ে আসবে। যেমন নাকি এঙ্গেলস্ দেহে মিল-মালিক, অথচ মনে ছিলেন সর্বহারা। তেমনি মদনাও। ও প্রফিট করছে বটে। আর প্রফিটটা যদিও এক্সপ্লয়টেশান, অর্থাৎ শোষণ, তবুও মদনার 'গোল' হচ্ছে শোষণের উচ্ছেদ করা। 'মিনস্' যাই হোক না, লেনিন বলতেন, 'এন্ড'টা ঠিক থাকলেই হ'ল।"

তখন যুদ্ধ বেধেছে। আমাদের কর্মপন্থা কি হবে, তাই নিয়ে আলোচনা চলেছে। কমরেড মদন দত্ত তাঁর প্রস্তাবটা পেশ করতেই দীন্দা গর্জন করে উঠলেন।

মদনদা মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, "তবু কমরেড প্রস্তাবটা বিবেচনা করে দেখুন।"

দীন্দা মেঝেতে থাপড় মারতেই একরাশ ধুলো উড়ে মোমের শিখা প্রায় ঢেকে দিল। দীন্দার পাশে শানুদা বসেছিলেন। ধুলো ঢুকে তাঁর নাকে সুড়সুড়ি দিতেই হাঁচ্চো হাঁচ্চো করে হেঁচে দিলেন।

ধুলো একটু থিতুলে দীন্দা বললেন, "এর আর বিবেচনা করার কি আছে? সোভিয়েট যখন জার্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করেছে, তখন কমরেড আমি দেখতে পাচ্ছি, দুনিয়ার সামনে বিপ্লবের দরজা খুলে গেছে। দুনিয়ার যত শোষিত, নিপীড়িত জনগণের আজ সুযোগ এসেছে সাম্রাজ্য-বাদের মর্চে ধরা জীর্ণ শিকল ছিঁড়ে ফেলবার। আমাদের বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলতে হবে, এই যুদ্ধে এক পাই নয়, এক ভাই নয়। আমাদের এখন প্রথম কাজ জনতা ব্রিগেড তৈরী করা। বার্লিন থেকে দুর্ধর্ষ জার্মান ফৌজ আর সোভিয়েট থেকে বীর লাল ফৌজ যেদিন থেকে সাম্রাজ্যবাদী কুত্তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের লালাসিক্ত দাঁত ভাঙতে সুরু করবে, সেদিন কমরেডস্ আমরাও যেন তাদের ল্যাজে কামড় বসাতে পারি।"

"কিন্তু কমরেড", শানু চাটুজ্জে বললেন, "নাৎসীদের সঙ্গে সোভিয়েটের এই হাত মেলানো আমাকে অত্যন্ত বিস্মিত করেছে। আমি বুঝতেই পারছিনে খবরটা কদ্দুর সত্যি।"

"কদ্দুর সত্যি? আশ্চর্য! আপনি মার্কসিস্ট?" দীন্দা চেঁচিয়ে উঠলেন, "সোভিয়েট আজ যে ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়েছে সে সম্পর্কে যে অচেতন, মার্কসবাদ সে কিছুই বোঝেনি। বুর্জোয়া ভাবালুতায় তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন।"

দীন্দা মাত্র কদিন আগে বলেছিলেন, শানু চাটুজ্জে সম্পর্কে সাবধান থেকো। ওর পক্ষে বুর্জোয়া আইডিয়ালিজম্ ছাড়া অন্য কিছু ভাবা সম্ভবই নয়। দীন্দার দূরদৃষ্টি দেখে বিস্মিত হলুম।

দীন্দা বললেন, "সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদের শত্রু। জার্মানীও সাম্রাজ্য-বাদের শত্রু। দু'য়ে দু'য়ে যোগ করলে চার হয় না কি? সোভিয়েট তবে কেন জার্মানীর সঙ্গে হাত মেলাবে না। সোভিয়েট জার্মানীর এই যুক্ত বিপ্লব প্রচেষ্টা জিন্দাবাদ। বিপ্লব জিন্দাবাদ।"

"জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ"—আমরাও দীন্দার কণ্ঠে সুর মেলালুম।

দীন্দা পথে বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে আমরা। দীন্দা আকাশের দিকে আঙুল তুলে বললেন, "ওই দ্যাখ, লাল তারা ফুটেছে। আর দেরী নেই।

দিন আসছে। তৈরী হয়ে থাকো তওয়ারিশ, বিপ্লবের জোয়ার আসছে। সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক।"

হাক্ থুঃ! দীন্দা একগাদা থুথু ছেটালেন। পাশে পাশে হাঁটছিলুম। দু এক কণা আমার মুখে ঢুকে পড়ল। বুর্জোয়া প্রবৃত্তি গা গুলিয়ে দেবার তাকে ছিল। ধমকে বললুম, মন সর্বহারা বনো, বেয়াড়া হয়ো না।

দিনরাত তালিম নিচ্ছি। আশা আছে সোভিয়েট আর জার্মান বাহিনী সাম্রাজ্যবাদকে আরও ঘায়েল করে আনলে এখানেও একটা অভ্যুত্থান করব। মাস ছয়েক নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিলুম জনতা ব্রিগেড গড়ে তুলতে। মাঠে গিয়ে বনকুল গাছের ঝোপে জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর রোদ্দুরে গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং নিচ্ছিলুম।

একদিন ইস্কুলে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছি। ভবান ছুটতে ছুটতে এল। গা দিয়ে ঘাম ঝরছে দর দর করে, মুখ চোখ লাল।

শুধু বললে, "শিগগির, দীন্দার বাড়ি চল। সাংঘাতিক খবর।"

"কি রে, কি খবর?"

"জার্মানী সোভিয়েটকে আক্রমণ করেছে।"

বললুম, "মিথ্যে কথা। কে বললে?"

"কাগজে লিখেছে।"

"দূর, ওসব বুর্জোয়া খবর।"

ভবান বললে, "দীন্দাও তাই বলছে।"

"অ্যাঁ!"

এবারে দিলুম ছুট। পথে দারুণ উত্তেজনা। নাৎসী সৈন্য ঢুকে পড়েছে সোভিয়েট ভূমিতে। চার্চিল বলেছেন, সোভিয়েট আমাদের মিত্র। দীন্দার বাড়ি গিয়ে দেখি তুমুল তর্ক চলেছে। শানু চাটুজ্জে, মদন দত্ত হাজির। দীন্দা পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। আর বক্তৃতা দিচ্ছেন।

"তবে তো টেস্ট হয়ে গেল। সোভিয়েট ট্যাক্‌টিক্‌স্‌টি কেমন নিয়েছে মশাই। নাৎসীদের তুষ্ট করে, তাদের দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের বেধড়ক ঠেঙিয়ে নিলে। তারপর এখন নাৎসীদেরকে ঠেঙাবে। এই দুটো ফ্রন্ট। কমরেড্‌স্, আমাদের কাজ বেড়ে গেল। জার্মানীর সঙ্গে যেখানে ইংরাজের যুদ্ধ, সেটা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। আমরা এটার বিরোধিতা করব। আর

এই যুদ্ধ যেখানে জার্মানীর সঙ্গে সোভিয়েটের, সেটা জনযুদ্ধ। আমরা সেটা সমর্থন করব।"

দীন্দার কথাগুলো ভাল বুঝলুম না। শানু চাটুজ্জে খচে ব্যোম হয়ে গেলেন।

বললেন, "অদ্ভুত থিসিস্। একটা যুদ্ধের দুটো চেহারা হয় কি করে? একই ফলের একপাশে আম আর অন্য পাশে কাঁঠাল?"

দীন্দা বললেন, "থামুন মশাই। গাছে আম ফলতে দেখেও যদি জিগ্যেস করেন, গাছে আম ফলে কি? তো তার কি জবাব?"

শানু, চাটুজ্জে কথা বলেন নিচু গলায়।

বললেন, "আমাদের উচিত ভুল স্বীকার করা। সেবার বলতে গেলুম, বলতে দিলেন না। আমার মনে দৃঢ় ধারণা ছিল সোভিয়েট এবং জার্মানীর মিলন অসম্ভব। এখন বৃটেন রাশিয়া এক হয়েছে আমাদের উচিত বৃটেনকে উত্যক্ত না করে তাকে সাহায্যই করা। তার মারফতেই সোভিয়েটকে সাহায্য করা হবে।"

দীন্দা লাফিয়ে উঠলেন, "দেয়ার ইউ আর। অনেকদিন থেকে আমার সন্দেহ হয়েছিল, লোকটা স্পাই, সাম্রাজ্যবাদীদের ঘৃণ্য দালাল। আজ কমরেডস তোমাদের সামনেই তা প্রকাশ হয়ে গেল।"

আমরা চেঁচিয়ে উঠলুম, "স্পাই, স্পাই। সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল। বের করে দাও। শেম শেম।"

সেই হট্টগোলের মাঝখানে শানু চাটুজ্জে কয়েকবার কি বলতে উঠলেন। কিন্তু অসম্ভব। আমরা সমানে চেঁচিয়ে চললুম, "ইনকিলাব জিন্দাবাদ। সাম্রাজ্যবাদের দালাল ধ্বংস হোক। সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক।"

কমরেড শানু চাটুজ্জে ইস্কুলের শিক্ষক। ক্ষীণকণ্ঠ। ভদ্রতায় একেবারে বুর্জোয়া। অপমানে কালো হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করলেন কিছু বলবার। কিন্তু বৃথা। আমাদের কণ্ঠে ঝড় বয়ে চলেছে। বজ্রাহত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। স্পষ্ট দেখলুম কোঁচকানো মুখের অজস্র বলি বেয়ে একফোঁটা অশ্রু অতিকষ্টে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। তারপর মাথা নিচু করে চলে গেলেন। দীন্দা দাঁতে দাঁত চিপে বললেন, "রেনেগেড্।"

ছয় মাস পর পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে নির্দেশ এল, যুদ্ধে সাহায্য করো। এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ। বৃটিশ সোভিয়েটের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। ইতিহাস তাকে বাধ্য করেছে। অতএব বৃটিশকে আর বিব্রত করা ঠিক হবে না। তারা আমাদের মিত্র।

দীন্দা কেন্দ্রের নির্দেশ সাধারণ সভায় পেশ করতেই কমরেড্ মদন দত্ত বললেন, "একী কথা! এ-তো শানুদার থিসিস্। ছমাস আগে তিনি একথা বলেছিলেন।"

দীন্দা বললেন, "পার্টি তার ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিয়েছে। তার কথা না তোলাই ভাল। ও লোকটা স্পাই।"

মদন দত্ত বললেন, "কিন্তু তুমিই তো বলেছিলে এটা টু ওয়ার।"

দীন্দা বললেন, "তখন তাই ছিল বটে, এখন এ যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ। জনযুদ্ধ। কমরেড্স্"—দীন্দা ইঙ্গিত দিলেন।

আমরা জানতুম মদন দত্ত ভেসিলেট্ করতে পারে। দীন্দা আগের রাত্রে ইনার সার্কেলের এক মিটিং ডেকেছিলেন। সেই মিটিংয়েই তিনি কেন্দ্রীয় পার্টির নির্দেশের বৈপ্লবিক মর্ম আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। মদনদা এখন যে প্রশ্ন করলেন, সে প্রশ্ন গত রাত্রে করে দীন্দার কাছে আমি ধমক খেয়েছিলুম।

দীন্দা বলেছিলেন, "টাইম ফ্যাক্টর মার্ক্সিস্ট স্ট্র্যাটেজির একটা বড় জিনিস। সেটা মনে রেখ। এটা যদি আগেই জনযুদ্ধ হবে, তবে কেন্দ্রীয় পার্টি এত দেরী করে জানাবে কেন?"

ঠিক কথা। দীন্দার অকাট্য যুক্তি। আমরা চুপ হয়ে গেলাম। সে রাত্রে আমাদের যে মিটিং হ'ল তাতেই ঠিক হয়েছিল এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ। আধ ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়ে দীন্দা আমাদের কেন্দ্রীয় পার্টির নির্দেশের মর্ম বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

আমরা চেঁচিয়ে উঠলুম, "এ যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ। এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ!"

দীন্দা বললেন, "কমরেড্ তোমার আর কিছু বলবার আছে?"

মদন দত্ত সকলের মুখের দিকে একবার একবার চাইলেন। চুপ করে কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, "এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ।"

তারপরই দীন্দা আমাদের নিয়ে প্রোসেসন বের করলেন। মদনদা সবার আগে আগে প্রাণপণে চেঁচালেন, "এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ।" দীন্দা গেরিলা বাহিনী তৈরী করলেন। তারপর থেকে দীন্দা আর কমরেড্ রইলেন না। হলেন তওয়ারিশ।

এখনো যেন দৃশ্যটা চোখে ভেসে ওঠে। এমনি এক রৌদ্রদগ্ধ দুপুরে সেই মাঠের মধ্যে বনকুল ঝোপের মধ্য দিয়ে বাঁশের সঙ্গীণ ঘাড়ে করে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছি রেল বাঁধের দিকে। রেল বাঁধের কাছে এক গাছ। সেই গাছে বালির বস্তা ঝোলান। সেটা কিছুদিন আগেও ছিল সাম্রাজ্য-বাদী বৃটিশ। দীন্দার হুকুমে আমরা জনতা ব্রিগেডের সৈন্যরা মহা উল্লাসে

তার পেটে সঙ্গীণ ঢুকিয়েছি। এখন আর সেটা বৃটিশ নয়, বৃটিশ আমাদের মিত্র, সেটা আপাতত হয়েছে ফ্যাসিস্ট জাপানী। এখন তার পেটই আমাদের লক্ষ্য। সার বেঁধে বুকে হেঁটে আমরা চলেছি তার দিকে। এপাশে ভবান, ওপাশে লাহিড়ী। আর এখানে-ওখানে বিমল, শঙ্কর, দাদা, কল্যাণ, কানু। তওয়ারিশ দীন্দা হুকুম দিচ্ছেন, কমরেডস্ চার্জ। আর আমরা সে হুকুম তামিল করে যাচ্ছি। প্রশ্ন নয়, সংশয় নয়, তর্ক নয়। শুধু আজ্ঞা পালন। বিপ্লবীর মন্ত্র এই।

এখনো আমার বহু বন্ধু সেই মন্ত্র পালন করে চলেছেন পরম নিষ্ঠাভরে। তাদের কথা খুবই মনে পড়ে। আমি শুধু স্বর্গচ্যুত। রেনেগেড্। কি করব? পেটি বুর্জোয়া মনে প্রশ্ন সংশয় জেগেছে, প্রশ্ন তুলেছি তর্ক করেছি।

কিন্তু সে তো আরেক গল্প।

॥ কুড়ি ॥

পালা শেষের দিনে ভাবছিলুম কার কথা বলি। স্মৃতির পিঞ্জর থেকে এক এক করে অনেকগুলি মুখকেই তো মুক্ত করে দিয়েছি। তবে আর কার কথা শোনাব? কয়েকটি মুখ মনে পড়ছে, কিন্তু তারা সঙ্গোপনেই থাক। লোকচক্ষুর সামনে সকলকে টেনে নাই বা আনলুম।

তবে হ্যাঁ, তেরেজা বৌদির কথা বলতে বাধা নেই। সে এক আশ্চর্য মহিলা।

পাশের ঘরটি ভাড়া নিয়ে যখন উঠে আসি, মধ্য কলকাতার এক এঁদো বাড়িতে, তখন কি ঘুণাক্ষরেও টের পেয়েছিলুম, এমন এক মহিলার সাক্ষাৎ পাব। তেরেজা বৌদি একাই বা কেন, গোটা পরিবারটাই অদ্ভুত। সচরাচর যে সব চরিত্র আমরা দেখে থাকি, আমাদের কল্পনা ধারণা যাদের নিয়ে গড়ে ওঠে, তাদের কারো সঙ্গেই এদের মিল নেই, এই বাড়ির কোনও ভাড়াটেরই মিল নেই। সব যেন সৃষ্টিছাড়া, অথবা ভুল বললাম, এই বাড়ির পরিবেশে আমরা দুজন, আমি আর আমার এক বন্ধুই যেন বেমানান।

অনেক খুঁজে ঘরখানা পেয়েছিলাম খুব সস্তায়। অত সস্তায় মধ্য কলকাতায় বাসা বড় একটা পাওয়া যায় না। অসুবিধে ছিল দুটো, সকাল ন'টা থেকে এগারটা বাড়ির মেয়েরা উঠোনে দাঁড়িয়ে গা খুলে চান করত, সেই দু' ঘণ্টা দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকতুম আমরা। না জেনে দৈবাৎ বেরিয়ে পড়লে আর রক্ষা থাকত না, গালাগালির চোটে পিতৃনাম ভুল হয়ে যেত। আর, ভোর চারটে থেকে ছ'টা আর বিকেল তিনটে থেকে পাঁচটা একটু বাইরে বাইরে ঘুরতে হত। তখন উনুনে আঁচ পড়ত ঘরে ঘরে। ধুঁয়ো এত হ'ত যে, প্রথম প্রথম আমাদের শ্বাসকষ্ট হ'ত। কিন্তু কি আশ্চর্য, দু'মাসের মধ্যে তাতেও আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেলুম।

আমি জন্মভবঘুরে, ঢেকুর উঠলে সাত দরিয়ার পানি আমার পেটে তুফান তোলে, আমার কথা ছেড়ে দিন, কিন্তু সুনীল, আমার বন্ধু, সে তো এই প্রথম বাড়ি ছাড়ল, সেও দেখি কদিন বাদে পোক্ত হয়ে উঠল। তার বড় ছবি আঁকার শখ। তার বড় গান শেখার শখ। বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় এসেছিল তারই ধান্ধায়। বাসা করে থাকলে, স্বপাকে খেলে, খরচাটা পড়বে

কম, তাই দুজনে বাসা করলুম। রোজগার পাতি তো নস্যি। সুনীলের ট্যুইশানি আর আমার—থাক সে না বলাই ভাল। মাস প্রথমে বাজেট হ'ত, ট্যুইশানির টাকায় বাসা ভাড়া চুকিয়ে দাও, সুনীলের গানের স্কুলের ফি দাও, তারপরেও দিন চার পাঁচ কুকার জ্বালার সংগতি থাকত। তারপরেও যে তারপর থাকে তার খোঁজ আর কে নিচ্ছে। খাচ্ছি কি না খাচ্ছি কে দেখছে। কিন্তু সে ধারণা আমাদের ভুল। পরিচয় যখন ঘনিষ্ঠ হ'ল, সেই সময় জানতে পারলুম, তেরেজা বৌদি নিজেই বললেন, তিনি সব লক্ষ্য করেছেন। কবে আমরা রেঁধেছি আর কবে হরিমটর চিবিয়েছি সব তাঁর জানা।

অথচ এই মহিলাকে আমরা প্রথম দিকে আমলই দিতে চাইনি। তার কারণ তাঁর চেহারা। ওঃ কি কুৎসিত! আর দ্বিতীয় কারণ তাঁর মুখ। এমন কদর্য ভাষায় গালাগাল করতেও আর কাউকে আমি শুনিনি। যেমন কর্কশ তাঁর কণ্ঠস্বর, তেমনি অশ্লীল তাঁর ভাষা।

বাসা করবার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার কথাই বলি। আমরা একটু রাত করেই বাসায় ঢুকেছিলুম। অন্যান্য ভাড়াটেরা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। আমরা খেয়েই এসেছিলুম। তাই ঘুমিয়ে পড়তে বেশি সময় লাগল না। কিন্তু খুব ভোরেই ঘুমটি ভেঙে গেল। জেগে ওঠবার কারণ তখনই টের পেলাম। পাশের ঘরে তুমুল কাণ্ড শুরু হয়েছে। অকথ্য গালাগালি, চেঁচামেচি, ছোট ছোট বাচ্চাকাচ্চার কোলাহল, মারপিটের আওয়াজ, আমরা তো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম।

তেরেজা বৌদির কাংস্যকণ্ঠের বিকট স্বরে পাড়ার লোকের ঘুম ছুটে গেল। আর সে কি গালাগালি। স্বামীকে গাল পাড়ছেন, আর ছেলেমেয়েদের লেলিয়ে দিচ্ছেন, "মার না, এই শুয়ারগুলা, মার আচ্ছা করে, হারামজাদা ছোটলোক, অভদ্র। বৌয়ের গায়ে হাত তোলে।"

স্বামীটি দেখতে বড় নিরীহ, কিন্তু রাগলে জ্ঞান থাকে না।

তিনিও চেঁচাচ্ছেন, "খুন করে ফেলব নচ্ছার মাগীটাকে। এই আপদগুলো, হটে যা সামনে থেকে, ডাইনীটাকে দেখে নিই। জীবনটা নষ্ট করে দিল আমার। ওঃ !"

অনেকক্ষণ ধরে এমনই তাণ্ডব চলল। তারপর একসময় সব চুপ হয়ে গেল। আমার চেয়েও সুনীলের অবস্থা কাহিল। ব্যাচারা হতভম্ব হয়ে গেছে।

বললে, "এ কোথায় এলাম ভাই। নরকে নাকি?"

জানিনে নরকের চেহারা এইরকম কি না। তাই জবাব দিলাম না।

চায়ের দোকানে চা খাবার সময়ও এই আলোচনা করছিলুম। দোকানী আলোচনাটা শুনলে।

জিজ্ঞাসা করলে, "ছাপ্পান্ন নম্বরে এলেন বুঝি?"

বললুম, "হ্যাঁ।"

একটু হেসে বললে, "তা বেশ। আর জায়গা পেলেন না।"

সুনীল বললে, "কি করে বুঝব মশাই। স্বামী-স্ত্রীতে এমন কাণ্ড ঘটতে পারে, এ কী ধারণা করেছি না কি?"

দোকানী বললে, "স্বামী-স্ত্রী বলছেন কাকে? ওর মধ্যে একটা তো খ্রীষ্টান মাগী, আর পুরুষটা তো বামুন।"

সুনীলের বিস্ময় চরমে উঠল। "সে কী! ওরা স্বামী স্ত্রী নয়!"

দোকানী হেসে ফেললে। বললে, "ওসব বেয়ারিং পোস্টের স্বামী, বুঝলেন। মাগীটার চেহারা দেখুন, আর লোকটাকেও দেখুন। ওর তো ছেলের বয়সী হবে মশাই। আছেন যখন পাশাপাশি বুঝবেন বৈকি, ভালই বুঝবেন।"

সুনীলের মুখ দেখে কষ্ট লাগল। বেশ বুঝতে পারলুম, ও বাসায় ফিরে যেতে ওর আর পা উঠছে না। ওর মনটা বড় নরম। কিন্তু পাছে সে পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ে, তা' নিয়ে পাছে কেউ ঠাট্টা করে, তাই সদা সতর্ক হয়ে থাকে। ক্ষিধে সহ্য করতে পারে না বলেই ও না খেয়ে থাকে। আমার চোখে মুখে কোথাও ঠাট্টা কি বিদ্রূপের আভাস পেয়ে থাকবে, তাই জোর করে হাসল।

বললে, "বেশ মজা। দিনরাত একটা নবেলের মধ্যে কাটান যাবে। কি বল।"

হেসে বললুম, "নবেলের মধ্যে কাটাও ক্ষতি নেই, কিন্তু রোগ বড় ছোঁয়াচে ভাই, সাবধান। জায়গা সুবিধের নয়।"

সুনীল চটে গেল, বললে, "অসভ্যতা তোমার আর গেল না।"

আমরা এদের এড়িয়েই চলতুম। মৌখিক বাক্যালাপের চেষ্টা পর্যন্ত আমরা করিনি। করবার সুযোগও কাউকে দিইনি। তবু অনেক খবর আমরা পেলাম। তেরেজা বৌদির স্বামীর নাম রতন ভাদুড়ী। গান শেল ফ্যাক্টরীর কি একটা ডিপার্টমেণ্টের ভাল চাকরে। তেরেজা বৌদি নার্স। ওর বড় মেয়ে মেরী, বছর সতের বয়েস, আই এস-সি পড়ে, হোস্টেলে থাকে। তাকে আমরা কয়েকবার দেখেছি। এ ছাড়া ছোট ছোট আর দুটো ছেলে আছে।

যে কদিন ওদের দেখা সাক্ষাৎ হয় না, দুজনই ডিউটি করেন, কেউ দিনে

কেউ বা রাত্রে, সে কয়দিন ওদের খুব ভাল কাটে। হয়ত তেরেজা বৌদির দিনে ডিউটি, রতনবাবুর রাত্রে। তেরেজা বৌদি বাজার করলেন, নানারকম রাঁধলেন, ছেলেদের খাওয়ালেন, নিজে খেলেন, রতনবাবুর খাবার পরিপাটি করে তুলে রাখলেন, তারপর ডিউটিতে গেলেন। তেরেজা বৌদির ঘর থেকে সেদিন হাসি শুনি, গল্প শুনি।

তেরেজা বৌদি বেরিয়ে যাবার পরই রতনবাবু আসেন। চান খাওয়া করে ঘুম লাগান। বিকেল নাগাত ঘুম থেকে ওঠেন। হাত মুখ ধুয়ে ছেলেদের ডাকেন, "জন, রবি! কি রে আজ কি খাবি?"

ছেলেরা চেঁচায়, "বাবা, হালুয়া খাব।"

"হালুয়া, আজও হালুয়া। বেশ, আজ তবে নতুন হালুয়া বানাই, গাজরের হালুয়া, কি বলিস।"

ছেলেরা আনন্দে লাফায়।

রতনবাবু বলেন, "আর রাত্রে?"

ছেলেরা বলে, "বাবা, মাংস।"

রতনবাবু বলেন, "কে ভাল রাঁধে, তোদের মা না আমি?"

ছেলেরা বলে, "তুমি।"

"বটে বটে" রতনবাবু বলেন, "তবে চল, বাজারে যাই, মাংস কিনে আনি।"

রতনবাবু রান্না করেন। ছেলেদের সঙ্গে হাসি গল্প করেন। ছেলেদের খাওয়ান, নিজে খান, তেরেজা বৌদির খাবার ঢাকা দিয়ে রাখেন।

যাবার সময় বারবার ছেলেদের বলে যান, "ভুলিস নে, মা এলে, আগে হালুয়া খেতে দিবি, আর খবরদার, বলিস নে যেন, কিসের হালুয়া। খাওয়া হয়ে গেলে পর, তখন মাকে জিজ্ঞেস করবি। এই জন, তোর পেট বড় আলগা, খবরদার। গুড্ নাইট।" রতনবাবু বেরিয়ে যান।

ছেলেরা চেঁচায়, "গুড্ নাইট্ বাবা গুড্ নাইট, ও বাবা গু-উ-ড্ নাইট।"

খানিক পরেই পরিশ্রান্ত তেরেজা বৌদি আসেন। ছেলেরা চুপ করে থাকে। তেরেজা বৌদি মাথা থেকে হুড্ খোলেন, কাপড় ছাড়েন, গা ধোন। তারপর যেই ঘরে ঢোকেন ছেলেরা বলে ওঠে, একসঙ্গেই চেঁচায়।

"মা হালুয়া খাও। ওই যে ঢাকা আছে।"

তেরেজা বৌদি স্নেহের ধমক মারেন, "চেঁচাস কেন, চুপ থাক।"

ছেলেরা খানিক বাদে জিজ্ঞেস করে, "মা বল তো, কিসের হালুয়া?"

তেরেজা বৌদি বলেন, "এই এক যন্ত্রণা, খেয়ে তার কৈফিয়ৎ দাও।"

"বল না মা, আজ গা—" জন বলতে যাচ্ছিল, রবি ধমক দেয়, "এই জন, বাবা বারণ করেনি?"

জন বলে, "চট্ করে বলে ফেল না, না পারলে, আমরা তখন বলে দেব, কি বলিস দাদা।"

রবি বলে, "হ্যাঁ, পরে বললে, দোষ নেই।"

তেরেজা বৌদি ছেলেমানুষের মত হাসতে থাকেন।

"তবে, তোরাই বল। আমি পারলাম না।"

দুটি ছেলে তারপর সমস্বরে বলে, "গাজর, গাজর।" তারপরে তিনজনে মিলে সে কী হাসি।

কিন্তু গোলমাল বাধে, দুজনের ডিউটি একই সময়ে পড়লে। তখন দু'জনের দেখা হয়। আর দেখা হলেই ঝগড়া সুরু হয়। দু'জন তখন একেবারে অন্য মানুষ হয়ে ওঠেন। কি ইতর ভাষা যে ব্যবহার করেন, কি কুৎসিত চীৎকার যে করেন, না শুনলে বিশ্বাস করা কঠিন। কখনো কখনো মারপিটও হয়ে যায় দু'জনে। ছেলে দুটো মুখ চুন করে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

তাই পাশের ঘরে বাস করলেও কোনদিন আলাপ করিনি। আমার ধারণা সুনীলও বুঝি ওদের এড়িয়ে চলে। কিন্তু তা যে নয়, একদিন হঠাৎ টের পেলাম। আমি দুপুরে বেরিয়ে যাই, আর ফিরি গভীর রাত্রে। একদিন হঠাৎ বিকেল তিনটে নাগাত বাসায় ফিরলাম। দেখি সুনীল ও-ঘরে বসে গান গাইছে। আর সবাই মশগুল হয়ে শুনছে। ছেলে দুটো সুনীলের ঘাড়ে পিঠে চড়ছে।

আমাকে দেখে সুনীল হাসল। তারপর আরো দু'একখানা গান শুনিয়ে উঠে এল। বোধহয় একটু লজ্জা পেয়েছে মনে হ'ল। হয়ত সেইজন্যই, জোর করে তেরেজা বৌদিকে আমাদের ঘরে ডেকে আনল। আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। তেরেজা বৌদি খুব কুণ্ঠিত হয়ে বসলেন। তারপর দু'চারটে কথা বলে সেদিন চলে গেলেন। তারপর থেকেই তেরেজা বৌদির সঙ্গে, ওর ছেলে দুটোর সঙ্গে খুবই খাতির জমে উঠল আমাদের।

তেরেজা বৌদির জন্য, সত্যি বলতে কি শেষ পর্যন্ত আমরা বিব্রত হয়ে উঠলুম। আমরা এতদিন নিজেরাই নিজেদের কাজগুলো করে এসেছি। রেঁধেছি, বাসন মেজেছি, ঘরদোর পরিষ্কার করেছি। অবশ্য বেশির ভাগ কাজ সুনীলই করত। আমি নিমিত্তমাত্র ছিলুম। সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমাদের কাজ ছিল, বাসনগুলো ধুয়ে ফেলা। তারপর কুকারে রান্নাটি চাপিয়ে দুজনে চা খেয়ে আসতুম।

সেদিনও সকালে সুনীল যথারীতি বাসনগুলো ধুতে যাবে, দেখে একটা বাসনও নেই। আমরা দরজা খুলে শুতাম। কারণ হাওয়া চলাচলের ঐটেই একমাত্র পথ। বুঝলুম, বাসনগুলোও ঐ পথে হাওয়া হয়েছে। সুনীলের হতভম্ব মুখ দেখে হাসি পেল।

বললুম, "বাঁচা গেল হে, রোজ রোজ গৃহকর্ম করার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল। চল চা খেয়ে আসি।"

সুনীল হাসল। বললে, "আজকের আইটেমে চা নেই, শুধু জলপান কর। কাল টাকা পাইনি।"

বললুম, "খাসা। তা এক কাজ করলে হয় না। কুকারের বাটিগুলো তো গেছেই, এবার চল খোলটা বেচে দিইগে, যা পাওয়া যায়।"

সুনীল বললে, "মন্দ পরামর্শ নয়। তাই চল।"

কুকারটা নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। বৌবাজারে পুরান লোহার দোকানে সেটিকে নাম মাত্র দামে গস্ত করে, চা টোস্ট খেয়ে বাসায় ফিরলুম।

ঘরে ঢুকেই সুনীল চেঁচিয়ে উঠল, "আরে একী!"

ওর বিস্ময়ের কারণটা উঁকি মেরে দেখে আমিও অবাক। দেখি আমাদের বাসনপত্রগুলো সশরীরে বিদ্যমান। পরিষ্কার ঝকঝক করছে। ঘরটারও বেশ শ্রী ফিরেছে বলে মনে হল। আধ ঘণ্টা নেই তার মধ্যেই এই সব। পরীর আমদানী হ'ল নাকি!

জন ডাকলে, "সুনীলকাকু, মা ডাকছে।"

সুনীল চলে গেল। তারপরে পাশের ঘর থেকে সুনীলকে বলতে শুনলুম, "তাই বলুন, এসব আপনার কাণ্ড। ছি ছি ছি। কেন এসব মাজতে গেলেন আপনি।"

তেরেজাবৌদি বললেন, "আপনাদের চেয়ে ভালই মেজেছি তো। তাছাড়া বাসন মাজায় তো দোষ নেই কিছু।"

সুনীল বললে, "দোষ নেই, বাঃ। খামাখা আপনি কেন আমাদের বাসন মাজবেন।"

তেরেজাবৌদি বললেন, "কেন, খ্রীস্টান বলে কি আপনাদের বাসনটাও আমার ছোঁয়া বারণ।"

সুনীল বিব্রত হয়ে পড়ল, "ছিঃ বৌদি, ওসব কি বলছেন।"

বেচারা বড় অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। ওর মুখ দিয়ে আর কথা সরে না। অবস্থাটা হাল্কা করবার জন্যে এবার আমাকেই এগোতে হল। সটান তেরেজাবৌদির ঘরে ঢুকে পড়লুম।

বললুম, "বাসন মেজে উপকার করলেন তো খুব। রান্নাই বন্ধ করে দিলেন আমাদের। এখন আর কি, রেঁধে খাওয়ান।"

তেরেজাবৌদি ঘাবড়ে গেলেন। বললেন, "রান্না বন্ধ করলাম মানে?"

বললুম, "মানে মোটেই শক্ত নয়। সকালে উঠেই দেখলুম, বাসনগুলো নেই। ভাবলুম, চোরটার বুদ্ধি তো খুব। আজ কুকারের বাটিগুলো নিল, কাল খোলটা নিয়ে যাবে। তাই চোর ব্যাটাকে জব্দ করবার জন্য খোলটা বেচে দিয়ে সেই পয়সায় দিব্যি ব্রেক ফাষ্ট সেঁটে এলাম।"

আমার কথা শুনতে শুনতে তেরেজাবৌদির ভারী মুখখানার উপর হাসির আভা ফুটে উঠতে লাগল। সত্যি বলছি, সেই কর্কশ মুখখানা দেখতে দেখতে কেমন কোমল হয়ে উঠল আমার চোখের সামনে। শেষ পর্যন্ত আর মুখ টিপে নয়, একেবারে খিল খিল করে হেসে উঠলেন তিনি।

বললেন, "ওমা, কি কান্ড! আচ্ছা মানুষ তো আপনারা। এখন যান, ফেরত আনুন সেটা।"

সুনীল বললে, "আর ফেরত এনে কি হবে, রোজ রোজ আর রান্না করতে কাঁহাতক ভাল লাগে। আপনার দোষেই তো কান্ডটা ঘটল, এখন কষ্ট করুন, দুবেলা রেঁধে খাওয়ান।"

তেরেজাবৌদির হাসি-হাসি মুখ নিমেষে গম্ভীর হয়ে গেল।

বললেন, "এ-বাড়ি তো আমার একার নয়। আরেকটা হিংসুটে দুষমনও অংশীদার কি না। না হলে চোখের সামনে আপনারা রেঁধে খান, এ দেখেও কি মানুষ চুপ করে থাকতে পারে। অনেকদিন তো আবার খানও না কিছু। দেখি তো সব, বুঝি তো সব। করতেও তো মন চায়। কিন্তু অশান্তির ভয়েই পারি না। জীবনটা জ্বালিয়ে দিলে বদমাইসটা।"

হঠাৎ অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটা উঠে পড়ল দেখে আমরা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। ধীরে ধীরে নিজেদের ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম।

তেরেজাবৌদি সেদিন আমাদের খুব খাওয়ালেন। সিদ্ধ খেয়ে খেয়ে মুখে অরুচি হয়ে পড়েছিল। মুখ বদলে বাঁচলুম। সন্ধ্যের মুখে রতনবাবু এলেন। রান্নাবান্নার জোগাড় করছেন, আর ছেলেদের সঙ্গে গল্প করছেন। আমরা দুজন চুপচাপ শুয়ে আছি। রতনবাবু হুড়মুড় করে আমাদের ঘরে ঢুকে পড়লেন।

আমরা শশব্যস্তে উঠে বসলাম।

তিনি গাঁক গাঁক করে উঠলেন, "আরে মশাই, মাগীটার বুদ্ধি নেই মোটে। ছি ছি, কি কেলেঙ্কারী মশাই। যাক, তবু যে ওবেলা উপোস করিয়ে রাখেনি আপনাদের, এই আমার বাবার ভাগ্যি। একেবারে চাষার

মেয়ে তো, হাড় নচ্ছার। তা এবেলাও বুঝলেন, এখানেই আহারাদি করবেন। মাগীর কাণ্ডের কথা শুনে লজ্জায় মাথা কাটা গেছে আমার।"

রতনবাবু, সেদিন রেঁধেই খাওয়ালেন না, জোর করে নিয়ে গেলেন, যে দোকানে কুকারটা বেচেছিলুম, সেখানে। ধমক ধামক দিয়ে সেটি আবার উদ্ধার করা গেল। দামটিও উনিই দিলেন। সুনীল, আমি কত তাঁকে বোঝালুম। কিন্তু দাম দেওয়ানো থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারলুম না।

কেবল বললেন, "দোষ তো আমাদেরই। মাগী যদি ভদ্রলোকের মেয়ে হত, সকালেই এটা ফেরত আনত। আরে মশাই, চোখের সামনে দেখছি তো আপনাদের, নিজেরা রাঁধছেন, খাচ্ছেন। বহুদিন তো উইদাউট ফুডই কাটাচ্ছেন।"

সুনীল লজ্জা পেল। তাড়াতাড়ি বললে, "এসব আবার কে বললে?"

রতনবাবু বললেন, "কাউকে বলতে হবে কেন? রতন ভাদুড়ীর চোখ নেই? কিন্তু হলে হবে কি, কিছু করব তার কি উপায় আছে। আমার ঘরের মালিক তো আর আমি নিজে নই। ঐ নচ্ছারটা আছে না। কি করব, ধর্মসাক্ষী করে বিয়ে করেছি, বিয়ে করা তো নয়, বিষবৃক্ষ পুঁতেছি, তার ফলও পাচ্ছি এখন। পাছে অশান্তি হয়, তাই কিছু করিনে। এই তো, এসে শুনলুম, আপনাদের খাইয়েছে, তাই ভরসা পেলাম। বলা যায় না, হয়ত এই নিয়ে কেলেঙ্কারী করে বসবে। পাশের ঘরে থাকেন, সবই তো শুনছেন। কি ভুল যে করেছি মশাই।"

তেরেজাবৌদির সেদিন রাত্রে ডিউটি। রতনবাবু খাওয়া দাওয়া সেরে এঘরে এসে বসলেন। মনে হল, বহুদিন যেন বন্ধুসঙ্গ পাননি। একথা সেকথা নানাকথা বললেন। বললেন ওঁর জীবন কাহিনী। কি আশ্চর্য ঘটনা। গুছিয়ে লিখলে ভাল একখানা উপন্যাস হয়।

রতনবাবু বামুন। বাড়িতে মা আছেন, ভায়েরা আছেন। ষোলবছর আগে এক আশ্চর্য ঘটনা বা দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে তেরজার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তখন ওর বয়স কুড়ি। তেরেজা ওর চেয়ে ছ-বছরের বড়। রতনবাবু তখন বি এস-সি পড়েন। এক বৃষ্টির দিনে আমহার্ষ্ট স্ট্রীট দিয়ে আসছিলেন। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। পথে জনমানব কম। হঠাৎ এক বাসার দরজা দড়াম করে খুলে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল আলুথালু তেরেজা। শুধু সায়া আর ব্লাউজ পরা। রতনবাবুকে দেখেই হাত চেপে ধরে কেঁদে ফেললে, "ও মশাই, যীশুর দোহাই, দয়া করে একবারটি আসুন আমার সর্বনাশ হয়ে গেল।"

রতনবাবু বললেন, "গ্যাসের আলো তেরেজার মুখে পড়েছিল।

চোখের কোণায় গালে চোখের জল লেগেছিল। তার উপর আলো পড়ে চিকচিক করে উঠল। দৃশ্যটা এখনও চোখের উপর ভাসছে।"

রতনবাবু তৎক্ষণাৎ তেরেজার সঙ্গে সেই বাসার ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন। এঁদো একখানা ঘরের ভিতর তেরেজা তাঁকে নিয়ে গেল। ভক্ করে এক দুর্গন্ধ রতনবাবুর নাকে ঢুকে ওঁর পেট গুলিয়ে দিলে। রতনবাবু দেখলেন ঘরখানা বমি আর পায়খানায় ভেসে গেছে। একপাশে একটা লোক নিশ্চল হয়ে শুয়ে আছে। বোধহয় মরেই গেছে। একটা বছর পাঁচেকের মেয়ের ঘন ঘন বাহ্যিবমি হচ্ছে। সে যন্ত্রণায় চীৎকার করছে আর ছটফট করছে। আরেকপাশে আরও একটা ছোট্ট সুন্দর মেয়ে বসে বসে কাঁদছে।

রতনবাবু বললেন, "সেই নরককুণ্ডের মধ্যে মেয়েটাকে মনে হল স্বর্গের আলো।"

রতনবাবু বুঝলেন, এ কলেরা। বোঝামাত্রই তাঁর প্রাণে এমন ভয় ঢুকল যে আর কোন কিছু চিন্তা না করেই দিলেন দৌড়। একদৌড়ে একেবারে শ্রদ্ধানন্দ পার্ক। সেখানে একটা বেঞ্চির উপর বসে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন। কিন্তু কেন জানিনে, মনের মধ্যে বারবার সেই ছোট্ট মেয়েটার মুখখানা ভেসে উঠতে লাগল। আর মন বলতে লাগল, পালিয়ে এসে ভাল করনি। একটু সাহায্য করলে মেয়েটা হয়ত বাঁচতে পারত। আর তুমি তাকে মৃত্যুর মধ্যে রেখে এলে।

রতনবাবু বললেন, "মশাই এই চিন্তা আমায় পাগল করে তুললে। পারলাম না, ঘণ্টা দেড়েক দুয়েক বাদে ফিরে চললাম সেখানে। কিন্তু বাসাটা যে ভুলে গেছি। ভাল করে লক্ষ্যও করিনি তখন। তার উপর বৃষ্টি চেপে এল।"

কিন্তু রতনবাবু তখন মরিয়া হয়ে উঠেছেন। পাগলের মত খুঁজে বেড়াচ্ছেন বাসাটা। হঠাৎ দেখলেন একটা বাসার সামনে অ্যাম্বুলেন্স এসে থামল। রতনবাবুর বুকটা ছ্যাঁক করে উঠল। বাসার সামনে একটা জটলা। ভীড় ঠেলে ভেতরে ঢুকতে পা আর সরে না। তবু কোনমতে ঢুকলেন। দেখলেন অ্যাম্বুলেন্সের লোকেরা তখন তেরেজাকে স্ট্রেচারে তুলছে। যে মেয়েটা ছটফট করছিল সেও মরেছে। শুধু ছোট মেয়েটা তখনও ভাল আছে।

রতনবাবু বললেন, "ঐ মেয়ের মায়ায় পড়ে মশাই, আজ আমার এই দুর্দশা। মেয়েটাকে আমিই নিয়ে এলাম। যতদিন না তেরেজা সেরে উঠল, ওকে রাখলাম। তেরেজা সেরে উঠল। ওর স্বামী ছিল ছুতোর। ওদের

তিনকুলে আত্মীয়-স্বজনও কেউ নেই। বন্ধুবান্ধবও নেই। তেরেজাকে নার্সিং পড়ার বন্দোবস্ত করে দিলাম। টিউশনি করেই মশাই ওর খরচ চালিয়েছি। শেষ পর্যন্ত বিয়েই করে ফেললাম। জাত ধর্ম পর্যন্ত বিসর্জন দিলাম। আর এখন কিনা মেয়েটার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে দেয় না। আমি বাপ, আর আমাকে অপবাদ দেয়, আমি নাকি মেয়েটার দিকে কুদৃষ্টি দিই। কি ছোট মন, বলুন দিকি। এক একদিন ইচ্ছে করে মাগীটাকে মেরে নিজে ফাঁসি যাই।"

আর সেইদিন যে অমন কাণ্ড ঘটবে, তা কে জানত। তবে খুন নয় প্রায় খুন, এই যা রক্ষে।

সারারাত ধরে গল্প করে, রতনবাবু সেদিন আর অফিসে যাননি। রান্নাবান্না করছেন। সুনীলও কুকারে রান্না চাপাচ্ছে। এমন সময় তেরেজা-বৌদি এলেন।

সুনীলকে বললেন, "আরে, আবার কিনলেন নাকি ওটা?"

সুনীল বলল, "না কিনব কেন? রতনবাবুই ওটা জবরদস্তি করে ফিরিয়ে আনলেন।"

তেরেজাবৌদি বললেন, "উঃ কি রকম সয়তান! শুনেছে, আমি রেঁধে খাইয়েছি, আর সহ্য হয়নি, পাছে আবার খাওয়াই, তাই তাড়াতাড়ি করে ওটা ফেরৎ এনে দিয়েছে। খচ্চর মিনসে।"

রতনবাবু বেরিয়ে এলেন, "নচ্ছারটার কথা শুনলেন। চাষার বেটির যেমন চেহারা কুচ্ছিৎ, তেমনি ওর মন।"

আর যাবে কোথায়, অকথ্য গালাগালি। যেমন তেরেজাবৌদি তেমন রতনবাবু। মেয়েটেয়ে টেনে এনে তেরেজাবৌদি যা অশ্লীলতা আরম্ভ করলেন, রতনবাবু সামলাতে পারলেন না, হাতে ছিল খুন্তি, দিলেন তেরেজা বৌদির মাথায় বসিয়ে। 'বাপ রে' বলে উঠোনে লুটিয়ে পড়লেন তেরেজা বৌদি। রক্তে মুখ ভেসে যেতে লাগল। পাড়ার লোক, বাড়ীর লোক জুটে সে এক বিতিকিচ্ছি কাণ্ড।

সেইদিনই আমরা ও বাসা ছেড়ে দিলুম।

তারপর, বছরতিনেক বাদে এক রবিবারে ব্যাণ্ডেল ইষ্টিশানে ওদের সঙ্গে দেখা। রতনবাবু, তেরেজাবৌদি, মেরী, জন আর রবি। দল বেঁধে সব ব্যাণ্ডেল চার্চ দেখতে যাচ্ছেন। আমাকে পেয়ে ওরা সব খুব খুশি।

ধরে নিয়ে চললেন চার্চে। খুব হৈ হৈ করা গেল। ওরা সুনীলের কথা জিজ্ঞেস করলেন। বললুম, ও এখন ত্রিবেণীতে থাকে। চাকরী করছে।

বললুম, "এখন ও আর নিজে রাঁধে না, চাকর রাখার পয়সা জুটেছে।"

সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন।

রতনবাবু সিগারেট কিনতে উঠে গেলেন। উনি একটু এগিয়ে যেতেই তেরেজাবৌদি বললেন, "দাঁড়ান, আপনাদের নামে দুটো মোমবাতি জেবলে দিয়ে আসি। ও থাকলে তো আর হবে না, কি রকম লোক সে তো জানেনই।"

তেরেজাবৌদি চলে গেলেন।

রতনবাবুও ফিরে এসে ফিসফিস করে বললেন, "দুটো বাতি দিয়ে এলাম মশাই, আপনাদের নামে। সিগারেট কেনবার নাম করেই যেতে হল। ধর্মস্থানে এসেও মিথ্যাচরণ করলুম। মাগীটার জন্য ইহকাল পরকাল দুই-ই গেল, মশাই।"
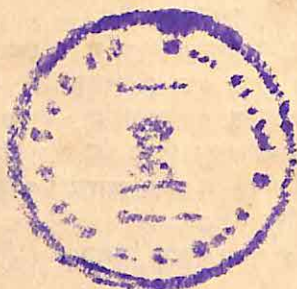
● রূপদর্শী বাংলা সাহিত্যে এলেন, লিখলেন আর পাঠকদের জয় করলেন। আর পাঠক বলে পাঠক, কোথায় শ্রীরাজশেখর বসু আর কোথায় সেই সার্কাস-দলের কোন রকমে অক্ষর-চেনা সাধারণ এক খেলোয়াড়, তারিফ দিলেন রূপদর্শীকে। আর এই দুই বিপরীত মেরুর মধ্যবর্তী সর্বশ্রেণীর রসিকজনেরা সেই তারিফে সুর মেলালেন।

● পরশুরাম রূপদর্শীকে লিখলেন, "পড়তে পড়তে মনে হল আমার বয়স পঞ্চাশ বছর কমে গেছে, আমি একটি আড্ডায় বসে সমবয়সীদের অদ্ভুত আলাপ শুনছি।......আপনি বাহাদুর লেখক। যে নতুন সাহিত্যের সৃষ্টি করেছেন তাতে যত রস, তত তথ্য আছে।"...আর সেই সার্কাস খেলোয়াড়টি বললে, "আপনি নিশ্চয়ই সার্কাস পার্টিতে রিং-বয় কি ক্লাউন ছিলেন। না হলে আমাদের কথা, আমাদের ব্যথা এত জানলেন কি করে?"

● না, রূপদর্শী সার্কাস-খেলোয়াড় ছিলেন না, তবে কাজ করেছেন, ঢের রকমের। কলকাতায় তাঁর প্রথম পেশা, ইলেকট্রিক মিস্ত্রির সাগরেদি। বর্তমানে সাংবাদিকতা। এই দুই পেশার মাঝখানে রকমারি কাজ করেছেন। বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার অধিকারী তিনি।

● তাঁর এযাবৎ-কালের রচনার থেকে 'কথা কথায়'-এর মেজাজ আলাদা। এখানে তাঁর আঙ্গিকে রূপ বদলেছে, স্টাইলের ধার কমেছে, ভার বেড়েছে গভীরতার।